এক

হৈমন্তী এখন নগ্ন। পুরো নগ্ন নয়, তার গায়ে লেগে রয়েছে জলের গুঁড়ো। তাতে নরম আলো চিক্‌চিক্ করছে। তাকে দেখাচ্ছে রহস্যময়ী।

কিছু সৌন্দর্য আছে ধোঁয়ার মতো। সরে গেলেও মনে হয়, রয়ে গেছে। এই সৌন্দর্যকে বলে 'স্মোকড্ বিউটি'। হৈমন্তীর সৌন্দর্য হল সেই 'স্মোকড্ বিউটি'। সামনে থেকে চলে যাওয়ার পরেও মনের ভিতর খানিকক্ষণ ঘোর থেকে যায়। ছোটোবেলা থেকেই সে সুন্দর। যত বয়স বেড়েছে এই 'সুন্দর'-কে সে যত্ন করেছে। ঘসে মেজে ঝকঝকে রেখেছে।

হৈমন্তীর বয়স খুব কম নয়। চৌত্রিশ বছর দু'মাস। দেখলে বোঝা যায় না। দু'মাস আগে সে কলিগদের নিয়ে জন্মদিনে পার্টি করেছে। পার্টিতে নানা ধরনের মজা ছিল। যেমন আর পাঁচটা পার্টিতে থাকে। ডংকি ডান্স, মিমিক্রি, হাউ টু প্রোপোজ। এইসব খেলা খুব জমেছিল। হৈমন্তী আরও একটা খেলা যোগ করে দিল। 'গেস দ্য এজ'। বয়স আন্দাজ করতে হবে। যে হৈমন্তী সেনের বয়স ঠিক বলতে পারবে সে পাবে প্রাইজ। প্রাইজ হল একটা রেড ওয়াইনের বোতল আর সঙ্গে একটা চুমু। কেউ পারল না। হৈমন্তী মজা এখানে শেষ করতে দেয়নি।

'"ওকে বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, আমি আমার বয়স দু'বছর কমিয়ে নিলাম। এবার বলো।" তখনও হলো না। হৈমন্তী মিটিমিটি হাসল।

"আচ্ছা, আরও দুই কমাচ্ছি।"

তারপরেও কেউ আটাশের বেশি উঠতে পারল না।

হৈমন্তী বলল, "আরও দুই কমাব? নাকি এক বাড়াব?"

মনানি নামের একটা মেয়ে কদিন হল অফিসে জয়েন করছে। মহারাষ্ট্রের মেয়ে। সে খানিকটা ভাবনাচিন্তা করে বলল, "ম্যাডাম, আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে আরও সিক্স মান্থস বাড়াতে হবে। নো, সিক্স মান্থস্ অ্যান্ড টু উইকস্।"

ছ'মাস শুনে সবাই 'হো হো' করে হেসে উঠল। এতো নির্দিষ্ট করে কেউ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেনি। একেবারে মাস, সপ্তাহের হিসেব।

"উত্তর ঠিক হয় নি, কিন্তু ইওর এফর্ট ইজ ভেরি অনেস্ট। তাই মনানি, তোমাকেই প্রাইজ দেওয়া হবে।" শ্যাম্পেনের বোতল হাতে দিয়ে, মনানির গালে চুমুও খেয়েছিল হৈমন্তী। মনানি বসের চুমুতে আপ্লুত। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, পার্টির খেলায় চুমুর ব্যবস্থা ছিল বলে হৈমন্তীকে হালকা ধরনের মেয়ে ভাববার কোনও কারণ নেই। বাইরে সে একরকম, আবার কাজের জায়গায় খুব কড়া বস। তার ব্যক্তিত্বের কারণে ডিপার্টমেন্টে সবাই তাকে সমঝে চলে। এমনকি তার ওপরে যারা আছে, তারাও সমীহ করে। বুঝে শুনে কথা বলে। আগের অফিসে সে তার জেনারেল ম্যানেজারকে জোর শায়েস্তা করেছিল। সেই গল্প কারও জানার কথা নয়। তারপরেও কীভাবে যেন নতুন অফিসের অনেকে জেনে ফেলেছে। কপোর্রেটে খবর চাপা থাকে না।

ঘটনা খুবই মজার। একই সঙ্গে দুটো হৈমন্তীকে পাওয়া যাবে। একজন ঠান্ডা মাথার, অন্যজন খুব তেজি। বছর পঁয়তাল্লিশের সেই জেনারেল ম্যানেজার একদিন হৈমন্তীকে ঘরে ডেকে একথা সেকথা বলবার পর নিচু গলায় বলেছিল, "আজ তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে হৈমন্তী। শুধু সুন্দর নয়, ভেরি অ্যাট্রাকটিভ। খানিক আগে তোমাকে করিডোরে দেখেই আই ফেল্ট লিটল বিট্ এক্সাইটেড।'

হৈমন্তীর এই কথা একেবারেই পছন্দ হল না। তারপরেও নিজেকে সামলে হাতের মোবাইলটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "থ্যাঙ্কু স্যার। আমাকে কী জন্য ডেকেছেন যদি দয়া করে বলেন।"

জেনারেল ম্যানেজার এই কথায় কান দেয় না। উঁচু পিঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে বলে, "যদি চাও তুমি আজ আমার সঙ্গে বাইরে লাঞ্চ করতে যেতে পারো। শর্ত একটাই, মুখোমুখি নয়, বসতে হবে পাশাপাশি। উইথ সাম টাচেস। তোমার মতো সুন্দরীর স্পর্শ পাওয়া ভাগ্যের।"

হৈমন্তীর মাথায় রক্ত ওঠে। সে মোবাইল ফোন হাত বদল করে বলে, "স্যার, সরি।"

জেনারেল ম্যানেজার এবারও সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলে, "তারপর যদি মনে করো, আমরা লং

ড্রাইভে যেতে পারি। বারুইপুরের কাছে একটা বাগান কিনেছি। যাবে নাকি? তোমার মতো একজন সুন্দরী আমার বাগান অ্যাপ্রিশিয়েট করলে খুব খুশি হব। ওখানে একটা গেস্ট হাউস করেছি। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালা। তবে ভিতরের এভরি অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ ভেরি মর্ডান। ইচ্ছে করলে সেখানে খানিকটা বিশ্রাম নিতে পারবে।"

হৈমন্তী বলল, "থ্যাঙ্কু স্যার। কিন্তু...।"

জেনারেল ম্যানেজার স্বর গাঢ় করে বলল, "কোনও কিন্তু নয়। প্লিজ হৈমন্তী। তোমার প্রোমোশন প্রোপোজাল আমার হাতে। কালই ছেড়ে দেব।"

হৈমন্তী ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হতাশ গলায় বলল, "সবই ঠিক আছে, লাঞ্চ, বাগান, গেস্টহাউস, আমার প্রোমোশন, তারপরেও সরি স্যার। আমি সুন্দরী, কিন্তু আপনি যে খুবই বিশ্রী। এত আগলি যে আমার পক্ষে আপনার পাশে বসে লাঞ্চ করা অসম্ভব। আপনার বাগানে বেড়াতে যাওয়া বা গেস্ট হাউসে বিশ্রাম নেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

জেনারেল ম্যানেজার চোখ মুখ লাল করে বলে, "এটা কি একটু বেশি হয়ে গেল না হৈমন্তী?"

হৈমন্তী শান্তভাবে বলেছিল, "না স্যার, বেশি হয় নি। এই ধরনের ইনডিসেন্ট প্রোপোজাল কীভাবে ট্যাকল্ করতে হয় আমার জানা আছে। আপনি যদি এখনই আমাকে সরি না বলেন, আমি ব্যবস্থা নেব এবং তখন আপনি বুঝতে পারবেন বেশি হওয়া কাকে বলে।"

জেনারেল ম্যানেজার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, "কী ব্যবস্থা নেবে?"

হৈমন্তী আরও শান্তভাবে বলল, "প্রপার ফোরামে কমপ্লেন করব।"

জেনারেল ম্যানেজার চেয়ার ছেড়ে উঠে হুংকার দিয়ে বলে ওঠে, "যেখানে খুশি কমপ্লেন করো। আমিও বলব, ব্ল্যাকমেইল করছ। তোমার মতো মেয়েদের আমার জানা আছে। শরীর দেখিয়ে অফিসে সুযোগ নাও। আমিও বলব বিছানায় যেতে রাজি হই নি তাই...আমি তোমাকে...তোমাকে সাসপেন্ড করব।"

হৈমন্তী বলল, "শান্ত হোন স্যার। প্রেসার বাড়বে।"

জেনারেল ম্যানেজার দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "ইউ স্কাউন্ড্রেল...।"

হৈমন্তী বড় করে নিঃশ্বাস টেনে বলল, "স্যার, ভেবেছিলাম সরি বললে ভুলে যাব। কিন্তু এখন তো আর পারব না। শাস্তি একটু বাড়াতে হচ্ছে। আপনি হাত জোড় করে আমাকে সরি বলবেন। নইলে ছাড় পাবেন না। ছোটো বিষয়টাকে আপনি বড় করলেন। ছোট্ট একটা সরি'তে মিটে যেত। আপনি মিটতে দিলেন না। নিন এবার হাত জোড় করে ক্ষমা চান।"

জেনারেল ম্যানেজার হিসহিসিয়ে বলল, "ইউ ডটার অফ আ বিচ্, গেট আউট ফ্রম মাই রুম।"

হৈমন্তী বলল, "আপনি আননেসেসারি ইস্যুটাকে বড় করে ফেললেন। আপনি ভাল করেই জানেন, আমি যদি কমপ্লেন করতে শুরু করি আপনার কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে। আমি কোনও ভীতু, নরম ধরনের মেয়ে নই। আমি যেমন সুন্দরী তেমন সাহসী ও কঠিন। তারপরেও আপনি আমার থেকে বয়সে বড়, পজিশনে বড়, সোশ্যাল প্রেস্টিজ রয়েছে, তাই আপনাকে লাস্ট সুযোগ দিচ্ছি। শাস্তিটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি মাত্র। আপনি টেবিল থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসুন। তারপর হাত জোড় করে সরি বলুন। আমি ঘটনা ভুলে যাব, আপনিও ভুলে যাবেন। আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। আমি নিজের রুমে যাচ্ছি। মাথা ঠান্ডা করে ভাবুন স্যার। ভাবনা শেষ হলে আমাকে ডেকে পাঠাবেন। কেউ জানবে না। দরজার বাইরে বিজি আলো জ্বালিয়ে দেবেন। লাল আলো জ্বালিয়ে যদি কলিগকে শোবার প্রস্তাব দেওয়া যায়, হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমাও চাওয়া যায়।"

জেনারেল ম্যানেজার, "তুমি কি আমাকে স্কুলের ছেলে পেয়েছ?"

হৈমন্তী একটু হেসে বলল, "না স্যার পাইনি। স্কুলের ছেলে হলে কান ধরে পঁচিশবার ওঠবোস করতে বলতাম। লজ্জার কিছু নেই। কোনও মেয়েকে গেস্ট হাউসে নিয়ে যাব বলতে লজ্জা না করলে তার সামনে কান ধরে ওঠবোস করতে লজ্জা কী? আরও গালাগালি করলে কিন্তু তাই করতে হবে স্যার। যাক্, আপনি ভাবনা চিন্তা করুন, আমি ততক্ষণে কমপ্লেন রেডি করছি। ঠিক এক ঘন্টা অপেক্ষা করব।"

"প্রমাণ কী?"

হৈমন্তী হেসে বলল, "আপনি কথা শুরু করবার সময়েই, মোবাইলের রেকর্ডার অন করেছি। শুনবেন?"

পনেরো মিনিটের মধ্যে সেই জেনারেল ম্যানেজার হৈমন্তীকে আবার ঘরে ডেকে পাঠায়। বাইরের লাল

আলো জ্বালিয়ে দেয়। একমাসের মধ্যে লোকটি কাজ ছেড়ে দেয়। ঘরের পিওনের মাধ্যমে খবর চাউরও হয়। সত্যি মিথ্যে মেশানো খবর। তারও এক বছর পর হৈমন্তী নতুন চাকরিতে চলে আসে।

একটি বিদেশি প্রসাধন কোম্পানি। বিভিন্ন দেশে তাদের অফিস এবং ল্যাবরেটরি। এদেশে হৈমন্তী চিফ্ কেমিস্ট। পুনেতে প্রসাধনের মতোই ঝকঝকে চকচকে তার অফিস। সঙ্গে ল্যাবরেটরি। সব মিলিয়ে তার ডিপার্টমেন্টে বারোজন কাজ করে।

আজ শনিবার। অফিস নেই। হৈমন্তী সময় নিয়ে স্নান করছে। জামা কাপড় খোলায় তাকে বেশি সুন্দর লাগছে। মেদহীন শরীর। যেখানে যতটুকু রূপ থাকা উচিত, তাই রয়েছে। কোথাও রয়েছে প্রকাশ্যে, কোথাও একটু আড়ালে। জলের গুঁড়ো মাখা হৈমন্তীকে যেমন রহস্যময়ী লাগছে তেমন মায়াময়ও লাগছে। সে একজন বাথরুমবিলাসী নারী। এই বাথরুমটাও সাজানো গোছানো। সব ধরনের আধুনিক আয়োজন আছে। বাথটব, শাওয়ার কিউবিকল্ তো আছেই, আছে বসে বই পড়া বা গান শোনবার ব্যবস্থা। আলোটাও সুন্দর। নীল ও নরম।

শাওয়ারের কিউবিকলে দাঁড়িয়ে স্নান করছে নগ্ন হৈমন্তী। চারপাশ থেকে জলধারা এসে তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কিউবিকলগুলোর এটাই মজা। সবদিকে শাওয়ার লাগানো। জলের কণায় কিউবিকেলের কাঁচ ঝাপসা। হৈমন্তীকে দেখাচ্ছে জল দিয়ে আঁকা ছবির মতো। একটা শরীর যা আছে, আবার নেইও।

(ক্রমশ)

২

স্নান করতে করতে হৈমন্তী গুনগুন করে গান করছে-

‘ফর দ্য আদার হাফ অফ দ্য স্কাই

উওম্যান আই ক্যান হার্ডলি এক্সপ্রেস...।’

জন লেননের বিখ্যাত গান। গানের নাম ‘উওম্যান’। এ গান হৈমন্তীর প্রিয়। প্রিয় হবার কারণ গানের চমৎকার কথা বা মেলোডি নয়। এমনকী লেননের দুর্দান্ত কণ্ঠস্বরও নয়। প্রিয় হবার কারণ, ছোটো একটা

স্মৃতি। হৈমন্তীর কলেজ জীবনের ঘটনা। তখন থার্ড ইয়ার চলছে। কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে। বিশেষ করে ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক। র‍্যাডিকাল ডিটেকশন, গ্রুপ অ্যানালিসিস করতে খাটুনির চোটে হাড়ে কার্বন জমে যাচ্ছে। কোন এক কবি বলেছিলেন, সুন্দর মেয়েদের বার্নারে হাত পুড়িয়ে কেমিস্ট্রি পড়বার কোনো মানে হয় না। তারা পড়বে সাহিত্য। জীবনানন্দ বা শেলির কবিতা নিয়ে থাকবে। ভাসা ভাসা চোখে তাকাবে। কলেজে ফাংশন থাকলে চওড়া পাড়ের শাড়ি পরে, খোঁপায় ফুল লাগিয়ে আসবে। সেই ফুল পড়ে গেলে, আঁচল সামলে ফুল কুড়িয়ে নেবে। মজার বিষয়, সেবার হৈমন্তীদের কেমিস্ট্রি ব্যাচে এগারো জন মেয়ে ছিল। এগারোজনই ছিল কমবেশি সুন্দরী। কবির কথাকে 'ফুঃ' মেরে উড়িয়ে অতি উৎসাহে তারা কেমিস্ট্রি পড়ত। ল্যাবরেটরির দিন হাত পোড়ানো বা ছ্যাঁকা খাওয়ার ঘটনা তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। কলেজে এদের বলা হত 'কেমিকাল বিউটি গ্রুপ'। সব ডিপার্টমেন্টের ছেলেরাই কম বেশি ছুঁক ছুঁক করত। যদি প্রেম করা যায়। এই নিয়ে কেমিকাল বিউটি গ্রুপে হাসাহাসি হত। বহ্নিশিখা হয়তো বলল, "প্রেম নিবেদন করলেই হাতে টেস্ট টিউব ধরিয়ে দেব। বলব, যতক্ষণ না হাইড্রোজেনের সঙ্গে সোডিয়াম ক্লোরাইড মিশছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক সোনা। আজ তোমার প্রেমের পরীক্ষা। তুমি হবে আমার হাইড্রোক্লোরিক ভালোবাসা।"

অত্রিনা তাই শুনে যোগ করল, "আমি তো স্মেলিং সল্ট দিয়ে নিয়ে যাব। গোলাপ দিলে, আমি দেব স্মেলিং সল্ট।"

আফরিন বলত, "আমার প্রেমপত্রে শুধু নাইট্রোজেন বন্ডিং-এর টেবিল থাকবে। প্রেম করতে আসবার আগে টেবল্ মুখস্থ করে আসতে হবে।"

তারপর সবাই মিলে হাসত।

একদিন ল্যাবরেটরি সন্ধে গড়িয়ে শেষ হল। ফাইনাল পরীক্ষা এসে যাচ্ছে, চাপ তো থাকবে। তাড়াহুড়ো করে বেরোল হৈমন্তী। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গেট থেকে বেরোতেই একটা ছেলে কলেজের অন্ধকারে থেকে বেরিয়ে এল ভুস্ করে। ভেসে উঠল যেন। নিশ্চয় আড়ালে আবডালে কোথাও অপেক্ষা করছিল। হাতে ভাঁজ করা একটা কাগজ। সেই কাগজ ধরিয়ে একরকম ছুটই দিল ছেলেটা। মুখটাও দেখা গেল না।

প্রথমে ভেবেছিল, ছেঁদো প্রেমপত্র। আর পাঁচটা যেমন হয় – 'তোমার রূপে আমি পাগল হয়েছি।' তখন তো এভাবে মোবাইল ছিল না, হাতে লেখা চিঠিই ভরসা। গাড়িতে উঠে ভেবেছিলে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দেবে। তারপরেও একবার আলো জ্বেলে খুলে পড়তে যায়। পড়তে নয়, দেখতে যায় বলাই ভাল। প্রেমের প্রস্তাব হেলাফেলা করলে, কোনো মেয়ের পক্ষে প্রেমপত্রকে অবজ্ঞা করা অসম্ভব। সে যতই সুন্দরী, বড়লোক বা ডাঁটিয়াল হোক না কেন।

হৈমন্তী অচেনা চিঠির এক লাইন, দু'লাইন, তিন লাইন করে যত এগোতে থাকে তত অবাক হতে থাকে। মুগ্ধ হয়। চিঠিটা বেশ বড়। নোটসের মতো। হাতের লেখা খারাপ। বানানেও গোলমাল রয়েছে।
'আমি তোমাদের কলেজেই পড়ি। ফার্স্ট ইয়ারে। কোন সাবজেক্ট বলব না। তবে সায়েন্স সাবজেক্টে আমি খুব কাঁচা। কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথের কথা শুনলে আমার পেটের মধ্যে হাত পা ঢুকে যায়। যারা এসব নিয়ে লেখাপড়া করে তাদের মুখের দিকে তাকতেও ভয় করে। মেয়ে হলে তো কথাই নেই। মেয়েদের যখন খুব বুদ্ধি হয় তখন তারা এই সব কঠিন সাবজেক্ট পড়ে। তাদের দিকে আমি ফিরেও তাকাই না। হঠাৎই একদিন ক্যান্টিনে তোমাকে দেখে মাথা ঘুরে গেল। কী দেখতে রে বাবা! আমি বসেছিলাম তোমার ঠিক উলটো দিকে। একবার মুখ তুলে তাকালে। একটু হাসলে যেন। নাকি হাসো নি? তাই হবে। আমি কে? একটা এলেবেলে। আমার দিকে তোমার মতো রূপবতী, বুদ্ধিমতী একজন তাকিয়ে হাসবে। কে জানে, সুন্দরীদের মুখ বোধহয় সবসময়েই হাসি হাসি হয়। যাই হোক, তোমার চোখ দেখে আমার বুক ধড়াস্ করে উঠল। এত সুন্দর কিছু আমি দেখিনি কখনও। যারা বলে, তোমাদের ব্যাচে হৈমন্তীদি সবথেকে সুন্দর, তারা ভুল বলে। ওরকম সুন্দর অনেক রয়েছে। সে হল আর পাঁচজনের মতো সুন্দরী। তুমি কারও মতো নও, সব থেকে সুন্দর। গানের মতো সুন্দর। খুব কম মানুষই গানের মতো সুন্দর হতে পারে। সেদিন তোমাকে দেখে জন লেননের গানটা খুব মনে পড়ে গেল। উওম্যান গানটা। ফর দ্য আদার হাফ অফ দ্য স্কাই, উওম্যান আই ক্যান হার্ডলি এক্সপ্রেস...। জীবনে তুমি আমার ইনস্পিরেশন হয়ে রইলে। যখনই কোনও দুঃখ হবে, আনন্দ হবে, চোখ বুজে...না, তোমার কথা ভাবব না। গানটার কথা ভাবব। একটাই

রিকোয়েস্ট, হৈমন্তীদিকে এসব কথা বলবে না। দুঃখ পাবে। ভাল থেকো। চিঠি দিয়ে তোমাকে আর কখনও বিরক্ত করব না।'

এই ছেলেকে হৈমন্তী খুঁজে পায়নি। পাওয়ার কথাও নয়। 'দিদি' সম্বোধন করছে যখন, নিচের ক্লাসের কেউ হবে। এত বড় কলেজে ফার্স্ট বা সেকেন্ড ইয়ারে তো কম ছেলে পড়ে না। সেই আশা ত্যাগ করে হৈমন্তী। ছেলেটিকে তাও যেমন জানা যায়নি, চিঠিটা কাকে লিখেছিল জানা যায়নি সেকথাও। কিন্তু গানটা রয়ে গেছে। এটাই অদ্ভুত। হৈমন্তী মাঝেমধ্যে বাজিয়ে শোনে। নিজেও গুনগুন করে। মনে পড়ে যায় অনেক কিছু। আজও পড়ছে।

ইন্দ্রকে যখন গল্পটা বলেছিল সে খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে শুনেছিল।

হৈমন্তী বলেছিল, "তুমি গানটা শুনেছ?"

ইন্দ্র কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "যা ব্বাবা, শুনব না? আমি একজন ফিল্মমেকার, আমি লেনন শুনব না? তুমি কী যে বল হিমি। আমি একসময়ে এলভিস, মারিয়া কারের গান না শুনে রাতে ঘুমোতে যেতাম না।"

ইন্দ্র হৈমন্তীকে 'হিমি' ডাকত। হৈমন্তীর প্রথম প্রেম। তখন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে মাস্টারস্ করছে হৈমন্তী। ইন্দ্রর সঙ্গে আলাপ কফি হাউসে। সাতাশ আঠাশ বছর বয়েস। টিপিক্যাল কফিহাউস মার্কা জিনস্ আর পাঞ্জাবি। এক মুখ দাড়ি গোঁফ। কিন্তু চোখদুটো একেবারে বালকের মতো সরল। এই সরল চোখের প্রেমে পড়ে গেল হৈমন্তী। আসলে হৈমন্তী প্রেম বিষয়টাকে অপছন্দ করত খুব। কিশোরীবেলা থেকে প্রেমের প্রস্তাব শুনে শুনে পাগল হয়ে গিয়েছিল। লেখাপড়ায় অতিরিক্ত ভাল হওয়ায় নাক উঁচু ছিল। সে মনে করত, সুন্দর হওয়া একটা গুণ অবশ্যই, তবে বুদ্ধি বা মেধা কম কিছু নয়। পুরুষমানুষ সুন্দর নারীতে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে বুদ্ধি বা মেধার কথা ভুলে যায়। ইন্দ্রর সঙ্গে প্রথম আলাপে ঠিক উলটো অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ঘটনা মজার ছিল।

সেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়েছিল হৈমন্তী। প্রফেসর ভৌমিকের সঙ্গে দেখা করবে। অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে ভদ্রলোকের খুব নামডাক ছিল। ওঁর কাছে যদি একটু পড়া যায়। বেশি নয়, সপ্তাহে একদিন

রাজি হলেই চলবে। সঙ্গে রাখীও ছিল। রাখী ব্যাচমেট। যদিও সে কেমিস্ট্রির স্টুডেন্ট ছিল না, তার সাবজেক্ট ফিজিক্স। প্রফেসর ভৌমিককে কলেজে পাওয়া গেল না। তিনি অসুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

রাখী বলল, "চল, কফিহাউসে চিকেন কাটলেট খেয়ে যাই।"

সেই সময় কফিহাউসের চিকেন কাটলেটের খুব সুনাম ছিল। এখনও রয়েছে। হৈমন্তী তারপরেও বলেছিল, "না রে, ভাজাভুজি খাব না।"

রাখী বলল, "চল তো। এ বয়সে এতো হেলথ কনশাস্ হোস না। সময় তো রয়েছে। তাছাড়া তুই এমনিতেই খুব সুন্দরী। স্কিন টোন দেখলে হিংসে হয়।"

হৈমন্তী বান্ধবীর কাঁধে চড় মেরে বলল, "আচ্ছা অনেক রূপের প্রশংসা হয়েছে। এবার থাম। চল কটা চিকেন কাটলেট খেতে হবে?"

কফি হাউসের তিনতলাটা একটু নিরিবিলি। যারা মূলত খেতে আসে, তারা তিনতলাতেই বসে। অনেকদিন ধরেই এই নিয়ম। হৈমন্তীরাও বসেছিল। খাবার বলার পর হঠাৎই এক যুবককে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে রাখী হইহই করে উঠেছিল।

"ইন্দ্রদা, ও ইন্দ্রদা।"

ছেলেটি এদিক ওদিক তাকিয়ে ফাঁকা টেবিল খুজছিল। ডাক শুনে এগিয়ে এল।

"রাখী, তুই!"

রাখী হেসে বলল, "কেন, আমি আসতে পারি না? কফিহাউস কি শুধু তোমার মতো ইনটেলেকচ্যুয়ালদের জন্য?"

যুবকটি বলে, "তা কেন হবে? বোকারাও এখানে অ্যালাউড। নইলে তোকে ঢুকতে দিত!"

রাখী বলল, "বেশ ভালো, বোকা তো বোকা। দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো না।"

হৈমন্তীর রাখীর ওপর রাগ হল। যতই 'দাদা' বলে ডাকুক, তার কাছে তো অপরিচিত। একজন অপরিচিতকে দুম করে টেবিলে বসতে বলছে কেন রাখী? তাছাড়া ছেলেগুলো বড্ড হ্যাংলা হয়। রূপবতী

মেয়ে দেখলে আদিখ্যেতার চরম করে। জিব দিয়ে লালা গড়ায়। এই ছেলেও নিশ্চয় তাই হবে, একবার বসলে উঠতে চাইবে না।

যুবক না বসেই হৈমন্তীর দিকে খেয়াল করল। রাখী হৈমন্তীকে বলল, 'আমার মামাতো দাদা ঐন্দ্রিল রায়। এসআরএফটিআই থেকে পাস করেছে। ডকুমেন্টরি বানায়। অলরেডি দুটো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়ে বসে আছে। দূর সম্পর্কের রিলেশন বলে, নাম হওয়ার পর আমাকে পাত্তা দেয় না।" তারপর যুবকের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "মিট মাই ফ্রেন্ড হৈমন্তী। শুধু দেখতেই মারাকাটারি নয়, লেখাপড়াতেও মারকাটারি। নাও বসো।"

যুবকটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "সরি রাখী, ডবল মারকাটারির মধ্যে বসতে পারব না। তাছাড়া সুন্দরীদের আমি আজকাল অ্যাভয়েড করে চলি। দুটো কথার পরই বলে, ফিল্মে চান্স দিন। তারা বুঝতে চায় না, আমি কোনো ফিল্ম ডিরেক্টর নই।"

কানমাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল হৈমন্তীর। সে দাঁত চেপে বলল, "আপনি কি সুন্দরীদের ওপর ডকুমেন্টরি বানান? তাদের স্বভাব সম্পর্কে এতো জানলেন কী করে?"

ঐন্দ্রিল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "রাগ করলেন বলে দুঃখিত, বাট এটাই রিয়েলিটি। সুন্দরীরা ফিল্ম লাইনে পা রাখবার জন্য ছটফট করে।"

হৈমন্তী বলল, "একেবারেই নয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম, যারা ফিচার ফিল্ম বানাতে না পেরে ডকু নিয়ে পড়ে থাকে তাদের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বেশি হয়। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স কী জানেন নিশ্চয়। হীনমন্যতা। হীনমন্যতার কারণ এদের জ্ঞানও বেশি হয়। গাধা, গরুর ওপর ডকুমেন্টারি তৈরি করতে হয় তো তাই তাদের ওপর জ্ঞান। আপনার বিষয় কী?"

ঐন্দ্রিল হেসে বলল, "ঠিকই বলেছেন। চার্লস ফার্গুসন, অ্যালেক্স গিডনে, জেনা ব্রিসকের মতো দুনিয়া কাঁপানো সব ডকু মেকার গাধা গরু ছিলেন।"

রাখী হাত বাড়িয়ে বান্ধবীকে শান্ত হতে বলল। "আলাপ না করেই ঝগড়া শুরু করলি?"

হৈমন্তী সেই হাত সরিয়ে বলল, "সরি, এঁদের সঙ্গে নিজের তুলনা করাটাও একধরনের হীনমন্যতা। যাক, আপনার ডকুমেন্টারির বিষয়টা বললেন না তো।"

ঐন্দ্রিল একটু চুপ করে থেকে হাসল। বলল, "পুরোনোগুলো নিয়ে আর বলছি না। আগামী বিষয় বরং বলি, বোকা সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী রাগ। যাই, ওদিকের টেবিল খালি হয়েছে।"

এই ছেলের সঙ্গে যখন হৈমন্তীর প্রেম গভীর হলো, তখন সবথেকে বেশি অবাক হয়েছিল হৈমন্তী নিজে। রাখী চোখ নাচিয়ে বলেছিল, "সেদিনই বুঝেছিলাম একটা কিছু হবে। আমার ঠাকুমার কাছে প্রবাদ শুনেছিলাম, যে যায় বিবাদে/ তার মন আগে কাঁদে।"

হৈমন্তী বলেছিল, "ধ্যুস। কোনো কাঁদে টাঁদে না। বাট আই কুড নট রেজিস্ট।"

রাখী ঘাড় দুলিয়ে বলল, "বাপু হে, প্রেম এমনই। তাকে রেজিস্ট করা যায় না। আরও আসবে, তাকেও রেজিস্ট করা যাবে না।"

হৈমন্তী বলেছিল, "কী আসবে?"

রাখী হৈমন্তীকে ইশারায় শরীর দেখিয়ে চোখ টেপে।

হৈমন্তী যেদিন প্রথম ঐন্দ্রিলের সঙ্গে শরীরের ভালবাসায় গেল, সেদিন ছিল একটা ভরা বর্ষার দুপুর। ঐন্দ্রিলই হৈমন্তীকে নিয়ে গিয়েছিল। সল্টলেকে তিনতলার ওপর ফ্ল্যাট। খাট টাট কিছু ছিল না। মাটিতে মাদুর পাততে পাততে ঐন্দ্রিল বলেছিল, "ভাবছি ফ্ল্যাটটা এরকমই রাখব। নো ফার্নিচার। কেমন হবে?"

হৈমন্তী বলল, "খুব খারাপ।"

ঐন্দ্রিল হৈমন্তীকে কাছে টেনে বলল, "কেন?"

"আমি মেঝেতে শুয়ে আদর করতে পারব না।"

ঐন্দ্রিল হৈমন্তী জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলল, "খুব পারবে। মাটিতে আদর অনেক বেশি রাস্টিক, ন্যাচারাল।"

রাস্টিক, ন্যাচারাল আদরের জন্য ঐন্দ্রিল এই ফ্ল্যাটে বহু মেয়েকে আনে, সেটা জানতে জানতে আরও একটা বছর লেগে গিয়েছিল। ততক্ষণে রেজিস্ট্রি করে তাদের বিয়ে হয়ে হয়ে গেছে। ঐন্দ্রিলের ফিচার

ফিল্মের জন্য দুটো গলার হার, একটা বালা বিক্রি করা হয়ে গেছে। ওই প্রথম পুরুষ মানুষের কাছে ধাক্কা খেল হৈমন্তী। বড় ধাক্কা।

হৈমন্তী শাওয়ার কিউবিকেল ডোর খুলে তোয়ালে টেনে নিল। চুল এবং শরীরের জল ঝরিয়ে তোয়ালেটা গায়ে জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। তার ফ্ল্যাট সতেরো তলায়। ঘরগুলো ভারি পর্দা দিয়ে ঢাকা। ভোরবেলা ছাড়া জানলা খোলা হয় না। ফলে দেখবার কেউ নেই। তোয়ালেটা গা থেকে খুলে চেয়ারের ওপর ছুড়ে দিল। আলমারির সামনে এসে দাঁড়াল। এখন দুজন হৈমন্তী। দুজনেই নগ্ন। দুজনেই দুজনের গলা, স্তন, নাভি, উরু স্পট দেখতে পাচ্ছে। কোনো আড়াল আবডাল নেই।

বাইরের হৈমন্তী ফিসফিস করে বলল, "কেমন আছ হৈমন্তী?"

আয়নার হৈমন্তী বলল, "ভালো নয়।"

বাইরের হৈমন্তী বলল, "কেন ভালো নেই? কী সুন্দর দেখতে তুমি! কত ভাল কেরিয়ার তোমার! পুরুষেরা তোমাকে দেখে মুগ্ধ। তুমি কেন ক্লান্ত হবে?"

আয়নার হৈমন্তী বলল, "এসব অসহ্য লাগে। বারবার ঠকতে ঠকতে আমি ক্লান্ত, হৈমন্তী।"

বাইরের হৈমন্তী বলল, "চিন্তা কোরো না, তুমি যাতে ভালো থাকো তার ব্যবস্থা করেছি।"

আয়নার হৈমন্তী বলল, "কী ব্যবস্থা?"

বাইরের হৈমন্তী সামান্য হেসে বলল, "বলব না।"

আয়নার হৈমন্তী বলল, "প্লিজ বলো।"

বাইরের হৈমন্তী বলল, "আচ্ছা, শোনো।"

খাটের ওপর পড়ে থাকা মোবাইল বেজে উঠল। হৈমন্তী এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরল।

"বলো।"

চাপা গলায় পুরুষকণ্ঠ বলল, "সব ঠিক আছে?"

হৈমন্তী একটু চুপ করে থেকে বলল, "আছে।"

পুরুষকন্ঠ বলল, "এই কদিন আমি তোমাকে ফোন করব না।"

হৈমন্তী আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, “ভয়?”

পুরুষকন্ঠ বলল, “না, সাবধান হতে। সাবধান না হলে, শুধু আমার একার নয়, তোমারও অসুবিধে। আমি ছাড়ছি।”

হৈমন্তী ফোন রাখতে না রাখতে ডোরবেল বেজে উঠল।

৩

হৈমন্তী একটা রোব পরেছে। একটা জাপানি কিমানো। লম্বা ঢোলা হাতা, গোড়ালি পর্যন্ত ঝুল। কোমরে চওড়া বেল্ট।

নীল সাদা রঙের এই রোব সে কিনেছিল জাপানের কোবে শহর থেকে। দোকানি মেয়েটি পুতুলের মতো। দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। ছোটো ছোটো চোখ আর একটুখানি নাক নিয়ে মানুষ যে এতো সুন্দর হতে পারে সে ধারণা জাপান না গেলে হৈমন্তীর হত না। শো কেসে রোবটা ঝুলতে দেখে খুব পছন্দ হয় হৈমন্তীর। ঠিক যেন এক ঢাল মেঘ। সে দোকানে ঢুকে পড়ে। পুতুল দোকানি তাকে রোব হাতে দিয়ে মিষ্টি হেসে বলেছিল, ‘ডোন্ট টেক স্ত্যাগি’।

জাপানি উচ্চারণে ইংরেজি শুনে মজা পেয়েছিল হৈমন্তী। কিন্তু ‘স্ত্যাগি’ কী? এই মেয়ে ‘স্ত্যাগি’ নিতে বারণ করছে কেন? পুতুল মেয়ে ‘ত’ আর ‘দ’ দিয়ে জড়ানো ইংরেজিতে বুঝিয়ে বলেছিল।

‘আমাদের ভাষায় ‘স্ত্যাগি’ হল অন্তর্বাস। আন্ডারগার্মেন্টস্।’

হৈমন্তী চোখ কপালে তুলে বলেছিল, ‘এই রোবের সঙ্গে ইনার পরা বারণ!’

পুতুল মেয়ে বলে,‘অবশ্যই বারণ। তাহলে এর বিউটি কমে যায়। সুন্দরী তুমি কি বিবাহিত?’

হৈমন্তী মজা পায়। একটু ভেবে বলে,‘আপাতত নয়।’

‘তাহলে তো ভালই হল, বয়ফ্রেণ্ড তোমার বাড়িতে এলে তুমি অবশ্যই কোনোরকম অন্তর্বাস ছাড়া এই রোব পরে তাকে আপ্যায়ন করবে। তোমাকে আরও সুন্দর লাগবে। সে তোমাকে অন্য দিনের থেকে বেশি

আদর করবে। তোমরা দুজনেই খুব আনন্দ পাবে।'

মেয়েটির বলার ঢঙে সেদিন খুব হেসেছিল হৈমন্তী। কত সহজ ভাবে শরীরের আনন্দ নিয়ে কথা বলতে পারে। পরে অবশ্য হৈমন্তী নিজেও বুঝেছিল, সত্যি এই রোব পরবার সময় ভিতরে কিছু না রাখাই ভাল। এতে শরীরের ভাঁজগুলো স্বচ্ছন্দ হয়ে ফুটে উঠতে পারে। মনে হয় গায়ে সত্যি খানিকটা মেঘ জড়িয়ে রয়েছে।

হৈমন্তী গতবছর জাপান গিয়েছিল। একুশ দিনের ট্যুর। অফিসের কাজ। সেখানকার তিনটে শহরে ঘুরেছে। তার মধ্যে একটা ছিল কোবে। কোবেতে তাদের কোম্পানির অফিস রয়েছে। জাপান যদিও ইউরোপের কোনো কোম্পানিকে সাধারণভাবে নিজের দেশে ব্যবসা করতে দিতে রাজি নয়, তারপরেও এই ফরাসি প্রসাধন কোম্পানিকে দিয়েছে। হৈমন্তীর কোম্পানির নাম 'বন্ উইদা'। ফরাসি শব্দ 'bonne odeure' –কে নাকি এই ভাবে উচ্চারণ করতে হয়। শব্দের শেষের 'আর' থাকে নীরব। যাকে বলে 'সাইলেন্ট'। 'বন্ উইদা' শব্দের মানে 'ভাল গন্ধ'। হৈমন্তী বাংলা করে বলে, 'আমি সুগন্ধী কোম্পানিতে কাজ করি'।

বুড়ি পিসিমা বলেছিল, 'ধূপকাঠি বেচিস নাকি? কোথায় বেচিস? ট্রেনে?'

হৈমন্তী বলেছিল, 'ট্রেনেও বেচি আবার বাড়িতে বাড়িতেও বেচি।'

'বন উইদা' কোম্পানির সব প্রোডাক্ট অবশ্য সুগন্ধের নয়। বরং সেন্ট সে কমই বানায়। তার থেকে অনেক বেশি শ্যাম্পু, ডিওডোরেন্ট, নানা ধরনের লোশন তৈরিতে তারা ব্যস্ত। ফরাসিরা ত্বকের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ একটি জাতি। 'বন্ উইদা'র এই ব্যাপারেও খ্যাতি রয়েছে। তারা নানা ধরনের 'স্কিন কেয়ার' প্রডাক্ট তৈরি করে। হৈমন্তী যখন এই বিখ্যাত কোম্পানিতে যোগ দিতে যায়, তখন অনেকে ভেবেছিল, সে বাইরে চলে যাচ্ছে। ঘটনা তা হয়নি। তাকে পুনের লেবরেটরির 'চিফ্ কেমিস্ট' হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে মূলত গবেষণার কাজ হয়। ভারতীয় গাছপালা, ফুল ফলকে ব্যবহার করে প্রসাধন সামগ্রী তৈরি করতে চায় 'বন্ উইদা'। হারবাল কসমেটিকস্। তাই নিয়ে গবেষণা। কোম্পানি মনে করে, ভারতের ঔষধি গাছপালা ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারলে, গোটা পৃথিবীতে বড় ব্যবসা পাওয়া যাবে। যেমন

চোখকে ভেজা ও মায়াময় করবার জন্য ফুলের জল থেকে তৈরি করতে হবে 'প্যাচ', মধু দিয়ে বানাতে হবে ক্রিম। এখনও অনেকে মনে করে, কসমেটিকস্ মানে রাসায়নিক। আসলে বিষ। এদেশের ঔষধি গাছপালাকে সামনে আনতে পারলে, মানুষের এই ভয় কাটানো যাবে। এখানে কারখানা তৈরির ইচ্ছেও রয়েছে কোম্পানির। কেরলের কাছে জমি খোঁজা শুরু হয়েছে। পুনের লেবরেটরির সঙ্গে অবশ্য কোম্পানির একটি বড়সড় অফিস রয়েছে। তারা এদেশের মার্কেটিং, সেলস দেখে।

পরশুদিন রিজিওনাল হেড সুরেশ ভাট হৈমন্তীকে ডেকে পাঠান।

'কেমন আছো হৈমন্তী?'

'ভাল। স্যার আপনি?'

সুরেশ ভাট বললেন, 'চলেছে। তোমার ল্যাবরেটরির সমস্যা মিটেছে?'

হৈমন্তী বলল, 'পুরো মেটে নি। নতুন দুটো মেশিনের একটা এখনও ইনস্টল হয়নি। সফটওয়্যারে সমস্যা হচ্ছে। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।'

সুরেশ বললেন, 'দুটোই তো জার্মান মেশিন?'

হৈমন্তী বলল, 'না স্যার একটা ইউ কে মেড। ওরা কেমিক্যাল স্পটিং এর ওপর খুব ভাল কাজ করছে। কোথাও কোনো রকম পয়জন এলিমেন্ট থাকলে দ্রুত ধরে ফেলছে। ওদের চিপ অ্যানালাইজিং সিস্টেম খুবই ভাল।'

সুরেশ ভাট একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হৈমন্তী, কোম্পানি তোমাকে আর একটু দায়িত্ব দিতে চাইছে।'

হৈমন্তী নড়েচেড়ে বসে বলল, 'ওকে স্যার।'

'ওরা বলছে, তুমি এবার একটু মার্কেটিং পার্টেও ইনভলভড্ হও।'

হৈমন্তীর পিসিমার কথা মনে পড়ে যায়। ট্রেনে ধূপকাঠি বেচবার কথা। সে আঁতকে উঠে বলল, 'এই রে! আমাকে কি এবার থেকে জিনিস বেচতেও হবে? স্যার সেটা কি পারব? সামান্য একজন কেমিস্ট আমি।'

হৈমন্তীর বলার ভঙ্গী দেখে সুরেশ হেসে ফেললেন। বললেন, 'না না, সেলস তোমাকে দেখতে হবে না। ইস্টার্ন জোনে কোনও কোনও প্রডাক্টে আমরা মার খাচ্ছি। বিশেষ করে মেল কসমেটিক্স। পুরুষদের বডি

লোশন, ডিওডরেন্ট। সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে তুমি শুধু তোমার মতো করে দেখবে। প্রোডাক্টের কোনো সমস্যা? নাকি আমাদের পাবলিসিটি ঠিক মতো হচ্ছে না? আবার এমনও তো হতে পারে ইস্টার্ন জোনে আমাদের অর্গানাইজেশনে কোনো ফাঁক রয়েছে?'

হৈমন্তী বলল, 'তাহলে ঠিক আছে স্যার, এটা মনে হয় পারব।'

সুরেশ ভাট বললেন, 'ধন্যবাদ। কোম্পানি তোমাকে একটু বেশি রিলাই করছে হৈমন্তী। এই প্রস্তাব ওরাই পাঠিয়েছে।'

হৈমন্তী কৃতজ্ঞ গলায় বলল, 'ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য। আপনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন।'

সুরেশ ভাট ভুরু কুঁচকে বললেন, 'চিন্তা একটাই। তোমার মতো এফিসিয়েন্ট একজন কর্মীকে ওরা নিয়ে না যায়।'

হৈমন্তী অবাক হয়ে বলে, 'কোথায় নিয়ে না যায়!'

'কেন? প্যারিস বা লন্ডন। যে দুটো জায়গা থেকে ওরা বিজনেস অপারেট করে।'

হৈমন্তী হেসে বলল, 'কী যে বলেন, এতো বড় ব্র্যাণ্ড। সারা পৃথিবী জুড়ে যোগ্য কর্মী। আমাকে কেন নেবে? আমাকে নেবে না।'

সুরেশ ভাট উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমিও সেরকম চাইব। তোমাকে যেন না নেয়। আমার এখানে অফিসটা ঠিক থাকুক। তোমার রিসার্চ ঠিক থাকুক। সেলফিস চাওয়া, তবু আমাকে তো আমার দিকটাই দেখতে হবে। হবে কিনা?'

কথা শেষ করে সুরেশ হাসলেন।

হৈমন্তী খানিকটা লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, 'কী যে বলেন স্যার।'

সুরেশ বলল,'তুমি তাহলে প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেল। ও ভাল কথা, কোম্পানি জানিয়েছে, এই প্রজেক্টের জন্য ওরা তোমাকে আলাদা প্যাকেজ দেবে।'

হৈমন্তী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ওকে স্যার। কিন্তু আমাকে যে একটু সময় দিতে হবে। আমি এদিকটা একটি গুছিয়ে নিই। তাছাড়া আমি কয়েকদিন জন্য কলকাতা যাচ্ছি। ছুটির অ্যাপ্লিকেশন মেল

করে দিয়েছি।'

সুরেশ ভাট ভুরু কুঁচকে বললেন,'কলকাতায় যাচ্ছো মানে? বাড়িতে?'

হৈমন্তী সামান্য হেসে বলল, 'বাড়ির পাট অনেকদিন চুকে গেছে স্যার। বাবা–মা মারা যাবার পরেই বাড়ি বিক্রি হয়ে করে দিয়েছি। এক মেয়ে আমি, বাড়ি রেখে কী করব? বাইরে বাইরে ঘুরে চাকরি করি। কলকাতায় গেলে আমি হোটেলে উঠি। নয়তো চেনাজানা কারও বাড়ি।'

সুরেশ বললেন, 'আচ্ছা হৈমন্তী, এবার কলকাতায় গিয়ে প্রাইমারি কিছু কাজ শুরু করে দিয়ে আসতে পারো না?'

হৈমন্তী মাথা নামিয়ে নিচু গলায় বলল, 'সরি স্যর, এবার সময় পাব না। আমার অন্য কাজ রয়েছে।'

দরজা খুলে হৈমন্তী বলল, 'এসো রায়না।'

এক তরুণী ঘরে ঢুকল। শালোয়ার কামিজ পরা এই তরুণীর বয়স খুব বেশি হলে সাতাশ আঠাশ হবে। সাজগোজের বাহুল্য নেই। চুল টেনে বেঁধে, একটা টিপ পরেছে। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। ব্যাগ থেকে গোল করে পাকানো একটা কাগজ বেরিয়ে রয়েছে। তরুণীর গায়ের রঙ চাপা, তবে দুটো চোখই ঝক ঝক করছে।

হৈমন্তী সরে এসে বলল, 'তুমি স্টাডিতে গিয়ে রেডি হও। পাখা আলো জ্বালিয়ে নাও।'

হৈমন্তী কাজের লোক আসে সকালে। কাজ সেরে চলেও যায় খুব তাড়াতাড়ি। রান্না হৈমন্তী নিজেই করে। ছুটির দিন ছাড়া রান্না নেই। হেভি ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে যায়। অফিসে লাঞ্চ। ডিনার হয় বাইরে, নয় সামান্য কিছু কিনে নিয়ে ফেরে। কোনো কোনোদিন দুধ কর্নফ্লেক্স ধরনের কিছু খেয়ে নেয়। অতিথি এলে সুইগি, জোমাটোরা তো আছেই। দু'বার সংসার শুরু করেও থমকে যেতে হয়েছে হৈমন্তী। থমকে নাকি প্রতারিত হয়ে? প্রথমবারের ধাক্কাটা খুব বড় ছিল। অ্যাবরশন পর্যন্ত যেতে হয়। দ্বিতীয়বার নিজেই সরে এসেছে। তাই কি আর সংসারে মন নেই? নাকি আছে? মনের ভিতরে কোথাও চাপা পড়ে আছে? তাই ক্লান্ত লাগে!

রায়না স্টাডিরুমে এসে আলো জ্বালালো। সে পুনের এক বিখ্যাত আর্ট কলেজের ছাত্রী ছিল। খুব ভাল নম্বর

পেয়ে পাশ করেছে। এখনও স্থায়ী কোনো কাজ পায়নি। ফ্রিলান্স করে বেড়ায়। রায়না ফাইনাল পরীক্ষায় বহু বিষয়েই খুব ভাল নম্বর পেয়েছে। খোঁজ খবর নিয়েই তার সঙ্গে হৈমন্তী যোগাযোগ করে। গত তিনমাসে মোট সতেরো দিন সে এখানে এসেছে। আজ আঠেরোতম দিন।

খুব অদ্ভুত একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে সে এখানে আসে।

হৈমন্তী রোবের বেল্ট খুলতে খুলতে বলল, "আজই তো তোমার কাজ শেষ রায়না।"

রায়না ইতিমধ্যে ইজেল, রঙ ,তুলি সাজিয়ে ফেলেছে। ইজেলে রাখা ক্যানভাসের ওপর ঢাকা কাপড় সরিয়ে নিয়েছে। দুটো স্পট ছাড়া ঘরের আলো সব নিভিয়ে দিল। ওই স্পট থেকেই যেটুকু আলো পাওয়া যাবে। রায়না ভাল করে দেখে নিল, আলো আগের দিনের মতো। তার কাজে আলো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নইলে কনটিনিউটির সমস্যা হবে। কনটিউনিটি ছবির বেলায় দরকার হয়। পোশাক, প্রপস্, আলো যেন অবিকল আগের মতো হয়। সিনেমায় তো কনটিনিউটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটু এদিক ওদিক হয়েছে কী গেছে। চরিত্রের সঙ্গে এবং আশপাশের জিনিসকে প্রপস্ বলে। লাঠি, ছাতা, জলের গ্লাস। ধরা যাক, নায়কের বসবার জায়গার পাশে একটা অ্যাশট্রে ছিল। পরের দিনের শুটিংয়ের সময়ে সেটা রাখতে ভুল হয়ে গেল, অথচ দৃশ্য এক। শুটিংয়ের পর মনিটরে ছবি দেখে খেয়াল হলো। আরে! এখানে একটা অ্যাশট্রে ছিল না? সেটা গেল কোথায়? ব্যস, গোটাটা ফেলে দিতে হবে।

এটা কোনো শুটিং নয়, তারপরেও রায়নার রোজই মনে হয়, সবথেকে সুবিধে হত, মোবাইলে আগের দিনের ফটো তুলে রাখলে। ফটো দেখে সবটা সাজিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্টে ফটো তোলবার প্রশ্ন ওঠে না। স্পট দুটো রয়েছে ডিভানের দু'পাশে, স্ট্যান্ডে। বেঁকিয়ে চুরিয়ে, উঁচু নিচু করে ফেলা যায়। দুদিক থেকে আলো পড়ে। এটা দিয়ে যেমন আলো তৈরি করা যায়, তেমন ছায়াও তৈরি করা যায়। রায়না ঠিক করে নিল। গোটা ঘর অন্ধকার, শুধু ডিভানে আলো পড়ছে। এঘরে কিছু নড়ানড়ি হওয়ার কথা নয়। তারপরেও ঘর ঝাড়পোঁছ করবার সময়ে এদিক ওদিক তো কিছু হয়েই যায়। এবার রায়না এসেছে বারোদিন পরে। ম্যাডাম যেমন সময় দিয়েছেন।

“ম্যাডাম, আরও একটা দিন পেলে ভাল হতো।”

হৈমন্তী রোব খুলতে গিয়ে থমকে গেল।

“এরকম তো কথা ছিল না রায়না। বরং আমি একটা দিন তোমাকে এক্সট্রা দিয়েছি। টুডে ইজ দ্য এইট্টিনথ্ ডে।”

রায়না চুপ করে গেল। এই মহিলাকে সে ভয় পায়। কেন ভয় পায় সে জানে না। ম্যাডাম তাকে কোনোদিন কড়া কথা বলা তো দূরের, খারাপ ব্যবহারও করেন নি। কোনোদিন দেরি করে ফেললে হেসে বলেছেন, “আর্টিস্ট পাংচুয়াল হলে সন্দেহ হয়, সত্যি আর্টিস্ট তো?”

রায়না বলেছে, “সরি।”

ম্যাডাম বলছেন, “সরির কী আছে? তবে আমাদেরও মুশকিল। অফিস পৌঁছতে দেরি হলে, তখন ভাববে সত্যি কর্পোরেট তো? আর্টিস্ট নয় তো?”

কথা শেষ করে আওয়াজ করে হেসেছেন ম্যাডাম। রায়নাও যোগ দিয়েছে হাসিতে। এমন সুন্দর মহিলা রায়না তার স্বল্প জীবনে খুব কমই দেখেছে। মনে হয়, দেখেনি। শুধু নিখুঁত শরীর হলেই হয় না, সেই শরীরের সঙ্গে শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীন মন মিশে নারীর সৌন্দর্য তৈরি হয়। রায়নার মনে হয়, সে একজন ভাগ্যবান শিল্পী, তাই এরকম একটা ‘বিউটি’ নিয়ে কাজ করতে পারছে। তবে একটাই দুঃখ, তার কাজ কেউ দেখতে পাবে না। কারণ কাজটি ভীষণ ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। অথচ সে ভাল করেই বুঝতে পারে, কাজটা সবাইকে দেখানোর মতোই সে করতে পেরেছে। এক্সিবিশনে দিলে হইচই পড়ে যেত।

“ম্যাডাম, ছবি শেষ হলেও কিছু টাচ্ আপ করবার থাকে।”

“না রায়না, আমার হাতে আর সময় নেই। যা করবার আজই করতে হবে। আমি কলকাতায় যাচ্ছি। এসে আবার অফিসের কাজে বেরিয়ে যেতে হবে।”

রায়না বাধ্য মেয়ের মতো বলে, “আচ্ছা ম্যাডাম।”

হৈমন্তী রোবের বেল্ট খুলে ফেলল। আবরণহীন হৈমন্তী প্রায় অন্ধকার ঘর আলো করে দিল! রায়না রোজই মুগ্ধ হয়, আজও হলো। শরীরে পোশাক না থাকলেও গলায় একটা সরু চেন রয়েছে হৈমন্তীর। চেনটা

কালো দড়ির। ‘কার’ বলাই ভাল। সামনে একটু সোনা। সেটাও শেষ হয়েছে দ্রুত। হৈমন্তীর দীর্ঘ গ্রীবায় তা যেমন অকিঞ্চিৎকর, তেমনই ভীষণভাবে উপস্থিত। বাঁ পায়ের গোড়ালিতে একটা রূপোর সরু মল। খেয়াল করে দেখতে হয়। এই দুটোর পরিকল্পনাই রায়নার। নগ্ন শরীরে সামান্য কিছু থাকলে নগ্নতা অনেক বেশি ফুটে ওঠে।

রায়নাকে হৈমন্তী বেশ খাটাখাটনি করেই খুঁজে পেয়েছে। ইচ্ছে করলে সে পাকা, অভিজ্ঞ, নামকরা কোনো আর্টিস্ট জোগাড় করতে পারত। পুনে, মুম্বইতে প্রাইভেট কাজ করেন এমন অনেক নামী আর্টিস্ট রয়েছেন। হৈমন্তী চায়নি। নামধাম থাকলে অনেকরকম ফ্যাকড়াও থাকে। তাছাড়া, এই কাজের জন্য ঝুঁকিও আছে। রেমুনারেশন তো অনেক বেশি হাঁকবে, বাইরে পাঁচ কান করবেও। তাছাড়া, কোনো পুরুষমানুষকে দিয়ে এই কাজ করাতে অস্বস্তি হবে। এটা তো একদিনের বিষয় নয়। বেশ কয়েকটা দিন লাগবে। আর্টিস্টদের চোখ অবশ্যই আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো হওয়ার কথা নয়, তারপরেও গোলমালের গল্প শোনা যায়। কিছুদিন আগে এক পত্রিকায় খবর হয়েছে, অতি নামকরা এক বৃদ্ধ শিল্পী নাকি ইজেলের বদলে মডেলের শরীরে তুলি রঙ লাগাতে শুরু করেছিলেন। মডেল বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে যায়। কোনো লাভ হয় নি।

তাই, বয়স কম, অথচ এই কাজে ট্যালেন্ট রয়েছে, এমন কাউকে খুঁজছিল হৈমন্তী। আর্ট কলেজগুলোতে খবর নিচ্ছিল। তিনজন ব্রাইট স্টুডেন্টের খবর পেল। দু’জন ছেলে, একজন মেয়ে। কথা বলে এবং কাজ দেখে মেয়েটিকেই পছন্দ হয়েছে। কোনোরকম বাড়তি ইনবিহিশন না থাকলেও একজন মেয়ের সঙ্গে এই কাজ করাটাই স্বচ্ছন্দের হবে বলে হৈমন্তীর মনে হয়। সে রায়নাকে ডেকে পাঠিয়ে কথা বলে।

ছোটোখাটো, শান্ত ধরনের মেয়েটি পছন্দ করবার মতো। কথাবার্তা, হাবভাবে এক ধরনের আর্টিস্টসুলভ ভাব রয়েছে। মারাঠি মেয়ে, বাংলা জানে না। কথা হয় ইংরেজিতে।

“আমি শুনলাম, তুমি ফাইনাল পরীক্ষায় ন্যুড স্টাডিতে খুবই ভাল নম্বর পেয়েছ।”

“ইয়েস ম্যাডাম। আমি হায়েস্ট পেয়েছিলাম।”

“কন্‌গ্রাচুলেশনস।”

“পেইনটিংসের এই দিকটায় আমার প্যাশন।”

“কেন?”

“আমার মনে হয়, মানুষের শরীর তার মনের গোপন কথা বলে। তার রাগ, দুঃখ, ভালবাসা, কষ্ট, খুশি সে বাইরে গোপন করতে পারে, কিন্তু শরীরে পারে না। আর্টিস্ট সেটা দেখতে পায়। সেইসব অভিব্যক্তি ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে পারলে সেটা একজন শিল্পীর জন্য খুবই তৃপ্তির।”

হৈমন্তী বলল, “তোমার এই ব্যাখ্যাটা শুনতে আমার ভাল লাগল, কিন্ত আমি পুরোটা একমত হলাম না রায়না। শুধুমাত্র সৌন্দর্যই কি এই ধরনের পেইনটিংসের পক্ষে যথেষ্ট নয়? ধর, তুমি যদি কোনো ফুলের ছবি আঁকো, সেখানে তার সোন্দর্যটুকুই কি যথেষ্ট নয়?”

“কথাটা এক অর্থে ঠিক, তবে কোনো কোনো আর্টিস্ট সৌন্দর্যের সঙ্গে আর একটু কিছু যোগ করে নেন। নইলে সেটা তাঁর চোখে ছবি হয়ে ওঠে না। একটা ফুলের সৌন্দর্যে যতক্ষণ না আমি নিষ্পাপ, পবিত্রতার কোনো সেন্স আনতে পারছি, ততক্ষণ আমি স্যাটিসফাইড হতে পারব না ম্যাডাম। আবার এমনও হতে পারে, ফুলটাকে আমি ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুললে হয়তো মনে হবে, এই ধ্বংসের পৃথিবীতে সে বড় অসহায়।”

হৈমন্তী খুশি হয়ে বলল, “এটাও ভাল বলেছ। কোন আর্টিস্টের ন্যুড পেইনটিংস তোমার ভাল লাগে?”

রায়না বলল, “পৃথিবীর সব বড় বড় আর্টিস্টরা এই কাজ করেছেন। বত্তিচেলি, মানে, রুবেনস, এমনকি পিকাসোর কাজও মারাত্মক। মাড্যাম, মানের অলিম্পিয়া ছবিটি তো আপনি জানেন।”

হৈমন্তী বলে, “হ্যাঁ জানি। ছবিটা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?”

রায়না লজ্জা পেয়ে বলে, “অত বড় কাজ নিয়ে আমি কী বলব? তবে অনেক ক্রিটিকের মতো আমারও মনে হয়, ন্যুড পেইনটিংসের অতীত ধারা মানে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বসূরী শিল্পীরা মূলত ভেনাসকে মাথায় রেখেই কাজ করতেন। তাঁর সৌন্দর্য অপার্থিব, শুধুই শিল্পীর কল্পনা। সে থাকবে দেবদূতেদের মাঝে। মানে এই ধারণাকে ভেঙে দিলেন। তিনি অলিম্পিয়া নামের এক সাধারণ রমণীকে সামনে এনে যেন বললেন, এই সৌন্দর্যও কল্পনার থেকে কিছু কম নয়...।”

হৈমন্তী খুব খুশি হয়ে বলল, "ভেরি গুড রায়না। তুমি কি জানো, তোমাকে আমি কোন কাজের জন্য ডেকেছি?"

"সম্ভবত আপনি আমার কাছ থেকে এই ধরনের কোনো পেইনটিং কিনতে চান।"

হৈমন্তী বলল, "ঠিক তাই। তবে ছবিটা হবে আমার নিজের। আমার শখ হয়েছে, নিজের একটা ন্যুড পেইনটিং আমি আমার কাছে রাখব। যে ছবিটা আমার থেকেও দেখতে ভাল হবে। এবার বলো, কাজ কবে থেকে শুরু করবে এবং তোমার পারিশ্রমিক কত। শুধু একটাই কথা, কাজটা হবে গোপনে।"

সেই ছবি আজ শেষ হতে চলেছে। হৈমন্তী রোজকার মতোই ভিজে চুল কাঁধের ওপর ফেলেছে। ডিভানের ওপর আধশোয়া হয়েছে সে। গত সতেরো দিন সে এই ভাবেই থেকেছে। বসবার পর বাঁ হাতটা এমন ভাবে রাখে যাতে শরীরের খুব গোপনীয়তাটুকু আড়াল হয়। সামনে একটা বই খোলা। বই বাছাইয়ের সময়ে রায়না খুবই অবাক হয়েছিল। এক সুন্দরী নারী নিজের নগ্ন ছবি আঁকানোর সময় এ কোন বই পড়ছে! বইটি ভয়ংকর।

উফ্, কী মারাত্মক সুন্দর!"

নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল হৈমন্তী।

কথাটা বলে একটু লজ্জাই পেল হৈমন্তী। রায়না শুনতে পায়নি তো? মেয়েটা যদি ভাবে নিজেকে 'সুন্দর' বলেছে সেটা বিশ্রী হবে। আসলে ছবিটা দেখে সে এতটাই আপ্লুত হয়ে পড়েছে যে কী বলবে, কী করবে বুঝতে পারছে না। ইচ্ছে করছে রায়নাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খায়। মেয়েটা এতদিন একজন গম্ভীর, অতিরিক্ত পার্সোনালিটি সম্পন্ন মহিলাকে হঠাৎ এরকম একটা হালকা আচরণ করতে দেখলে কি খুব অবাক হবে? হোক অবাক। যে অন্যকে এমন চমকে দিতে পারে, তার নিজেরও অবাক হওয়া উচিত। হৈমন্তী ছবি থেকে চোখ সরাতে পারছে না। পিছনেই রায়না দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয় সে খুবই টেনশনে আছে। সেটাই স্বাভাবিক। সে এতদিন মডেল নিয়ে কাজ করেছে। তারা কেউ ছবি কেমন হবে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ডিউটি শেষ হয়ে গেলে, উঠে পড়ে কাপড় জামা পরে নেয়, পেমেন্ট গুনে নিয়ে চলে

যায়। ছবির দিকে ফিরেও তাকায় না। এই ছবির বেলায় ঘটনা অন্য। রায়নাকে, এমন একটা ছবি সে দেখতে চায়, যে ছবি তার নিজের থেকে সুন্দর হবে। কথার কথা ছিল সেটা। রায়না কী করে সেই কাজটা করে ফেলল! সে যতই সুন্দর হোক, এত সুন্দর কিছুতেই নয়। মেয়েটা ছবিতে কিছু একটা ম্যাজিক করেছে। সেই কারণেই এমন লাগছে। ম্যাজিকটা কী?

হৈমন্তী আবার ছবিতে মন দিল।

ছবিতে ডিভানের ওপর আধশোয়া হয়ে রয়েছে যে নগ্ন মেয়েটি, সে মায়াময়। তারপরেও ভঙ্গিতে একধরনের 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব। গোটা দুনিয়াকে যেন তাচ্ছিল্য করছে। বলতে চাইছে, 'দেখো, আমি তোমাদের ভানভনিতা, মিথ্যাচারকে পোশাকের মতো ছুড়ে ফেলতে পারি। আমার নগ্নতা তোমাদের সব সভ্যতার চেয়ে খাঁটি ও পবিত্র। তোমার আমার এই ঠোঁট, গলা, বুক, পিঠ, জঙ্ঘা, যোনিকে তো ঠেকাতে পার, আমাকে পারবে না।

এই কি ছবিটা বলছে? রায়না বলতে পারবে?

সে যে সুন্দর, ছোটোবেলা থেকেই জানা আছে হৈমন্তীর। তাকে যেমন গ্রাহ্য করেনি, আবার করেওছে। তাকে যেমন যত্ন করেনি, আবার করেওছে। পুরুষমানুষের কাছে ক্রমাগত প্রশংসা শুনতে শুনতে একসময় বিরক্ত লাগত। মনে হতো, পুরুষমানুষ শুধু তার বাইরের রূপ নিয়ে ব্যস্ত। ভিতরের মানুষটাকে দেখবার ধৈর্য্য তার নেই। হয়তো তার জন্য তার রূপই দায়ী। আসল মানুষটাকে ঢেকে দিয়েছে। একমাত্র ঐন্দ্রিল এসে সেই ধারণা পালটে দিয়েছিল। সেটা যে কত বড় মিথ্যে ছিল, বুঝতে সময় লেগেছে। কথার জালে জড়িয়ে ফেলেছিল সেই মায়া চোখের যুবক।

"হিমি, তুমি তোমার সৌন্দর্যের থেকেও বেশি সুন্দর।"

"একথার মানে কী? আমি আমার থেকে বেশি সুন্দর হব কী করে?"

ঐন্দ্রিল হৈমন্তীর দুটো গালে দুটো হাত রেখে বলল, "মানে সহজ। নারীর থেকে তুমি মানুষই বেশি।"

হৈমন্তী হেসে বলেছিল, "নারী কি মানুষ নয়!"

ঐন্দ্রিল হৈমন্তীর মুখটা নিজের মুখের কাছে এগিয়ে নিতে নিতে বলল, "অবশ্যই মানুষ। তবে আমরা সেটা বুঝতে চাই না। পৃথিবী এত আধুনিক হয়েছে, নারী শিক্ষা, নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা এত বিস্তৃত হয়েছে, তারপরেও আমরা একথা বুঝতে চাই না হিমি। এটা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কথা, সোসাইটির কথা নয়, পুরুষতন্ত্র বা মেল শভিনিজমের কথাও নয়, এটা সভ্যতার নানা সংকটের একটা। আমার একে খাটো করে দেখি। আজও একজন নারী একজন নারীই।"

হৈমন্তী মুখটা ঐন্দ্রিলের মুখের কাছে ঘন করে নিয়ে বলেছিল, "এটাই তো ভাল। আমি যদি নারী না হতাম, তোমার কি ভাল লাগত?"

"অবশ্যই লাগত না। তবে তার থেকে বেশি ভাল লাগে যখন অনুভব করি, তোমার মধ্যে একজন সহনশীল, অনুভূতিপ্রবণ, বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ রয়েছে। সেই মানুষ নারীবেশে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।"

হৈমন্তী ঐন্দ্রিলের গালে গাল ছুঁয়ে বলেছিল, "আমি যদি এমন না হয়ে অন্যরকম হতাম?"

ঐন্দ্রিল ফিসফিস করে বলেছিল, "তোমায় আমি দেখছিলাম বলে/ তুমি আমার পদ্মপাতা হলে / শিশিরকণার মতো শূন্যে ঘুরে/ শুনেছিলাম পদ্মপত্র আছে অনেক দূরে/ খুঁজে খুঁজে পেলাম তাকে শেষে।' কার কবিতা বলতে পারো হিমি?"

হৈমন্তী চোখ বুজে বলেছিল, "না। শুকনো কেমিস্ট্রি পড়া মেয়ে। হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেনের খবর রাখি। কবিতার কথা জানব কী করে?"

ঐন্দ্রিল ঝুঁকে পড়ে হৈমন্তীর চোখের পাতায় চুমু খেয়ে বলল, "এই কবিতার কবির নাম জীবনানন্দ দাশ। একদিন তোমাকে আমি সারারাত ধরে কবিতা শোনাব হিমি।"

"এখন শোনাও।"

"রাত জেগে না শুনলে কবিতাকে ছোঁয়া যায় না। রাতের নিস্তব্ধতায় কবিতা স্বচ্ছন্দ বোধ করে।"

এই পুরুষমানুষকে কী করে অস্বীকার করবে হৈমন্তী? দ্রুত কাছে চলে গেল সে। এত কাছে যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। লেখাপড়ার জীবন শেষ হওয়ার আগেই ঐন্দ্রিলকে বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল।

ঐন্দ্রিল ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "বিয়ে! আমার মতো একজন ভ্যাগাবণ্ডকে বিয়ে করবে? তোমার মতো মেয়ে কতো ভাল বর পাবে। আমাকে বিয়ে করতে চাইছো কেন? হোয়াই?"

হৈমন্তী হেসে বলেছিল, "বিয়ে না করলে রাত জেগে কবিতা শুনব কী করে? ভাল বর বাড়ি গাড়ি দেবে। সুন্দরী বউকে পাশে নিয়ে চলবে। মানুষ খুঁজবে কই? আর টাকা বাড়ি গাড়ি, সে তো আমি নিজেই পারব। বাবা মায়ের এক মেয়ে। যেটুকু যা প্রপার্টি রয়েছে, সবই তো আমার। না হলেও কোনো সমস্যা ছিল না। যা লেখাপড়া শিখেছি, ওটুকু আমি নিজেই করে নেব।"

ঐন্দ্রিল চিন্তিত মুখে বলল, "বিয়েতে আপত্তি নেই, কিন্তু এখন তো একসঙ্গে থাকতে পারব না হিমি। আমাকে সময় দিতে হবে।"

হৈমন্তী বলেছিল, "আমিও পারব না। আমাকে লেখাপড়া কমপ্লিট করতে হবে না? চাকরি করতে হবে। তবু বিয়েটা সেরে রাখতে চাই। তোমার মতো পাত্র হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।"

কথা শেষ করে হৈমন্তী জোরে হেসেছিল। ঐন্দ্রিল অন্যমনস্ক হয়ে বলেছিল, "নো জোকস্। আমি একটা ফিচার ফিল্ম করব বলে অনেকটা এগিয়ে পড়েছি হিমি। দুজন প্রোডিউসারের সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে। একজনকে ফাইনাল করব।"

হৈমন্তী বলেছিল, "এ তো দারুণ খবর।"

তিনমাসের মধ্যে রেজিস্ট্রি করে বসল হৈমন্তী। গোপনে করল। বাবা-মা তো দূরের কথা, এমনকি রাখীও জানল না। হৈমন্তী জানত, সবাই তাকে আটকাবে। প্রেমে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়া ছেলে কারও কারও পরামর্শ শোনে এবং ঝগড়া করে, কিন্তু প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া কোনো মেয়ে বাধার মুখে পড়তে চায় না। তবে সমস্যা হলো অন্য। আলাদা থাকবার পরও, একমাসের মধ্যে, হৈমন্তী পিরিয়ডের গোলমালে পড়ল, জানতে পারল, সে কনসিভ করেছে। ভয় পাওয়ার বদলে সে অবাক হলো। এমনটা হওয়ার কথা নয়।

সবরকম প্রোটেকশন নিয়েই সে ঐন্দ্রিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে। ঐন্দ্রিলকে বলতে সে তো আকাশ থেকে পড়ল। রেগেও গেল।

"কী করে ঘটল?"

"অ্যাক্সিডেন্ট।"

"তোমার অ্যালার্ট থাকা উচিত ছিল হিমি।"

"এতো এক্সাইটেড হচ্ছ কেন? অ্যাক্সিডেন্ট তো হতেই পারে।"

"কী বলছ হিমি! এক্সাইটেড হব না? আমার সামনে ফিচারের কাজ।"

হৈমন্তী গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "তুমি তোমার কাজ করবে ঐন্দ্রিল। আমি আমার প্রবলেম সামলাব। এখন এটা ভেরি ইজি। সবে কটা দিন হয়েছে।"

সমস্যা সামলানোর কয়েকদিনের মধ্যে ঐন্দ্রিল টেলিফোন করে বলল, "এখনই কিছু টাকার ব্যবস্থা করো। প্রোডিউসার প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছি। দুটো দৃশ্য তুলে দেখাতে হবে। এটুকু নিজের খরচেই করতে হবে। ফিল্ম লাইনে নিউ কামারদের অনেক ঝামেলা।"

হৈমন্তী বলল, "কত টাকা চাই?"

ঐন্দ্রিল বলল, "তিন লাখ।"

হৈমন্তী বলল, "ইমপসিবল্। অত টাকা কোথায় পাব?"

"বাড়িতে চাও। জামাইকে এইটুকু হেল্প করবে না? সে তো খাট পালঙ্ক কিছু চায়নি।"

হৈমন্তী বলল, "তুমি খেপেছ? বাড়িতে কিছুই জানে না। আমাদের বিয়ের কথাও নয়।"

"তোমার নিজের ব্যাঙ্কে কিছু নেই? ফিক্সড্?"

হৈমন্তী বলল, "পাগলের মতো কথা বলছ ইন্দ্র।"

ঐন্দ্রিল রাগের সঙ্গে বলল, "একজন ক্রিয়েটিভ মানুষ পাগলই হয়। বিয়ের আগে তোমার জানা উচিত ছিল।"

হৈমন্তী অবাক হয়ে বলল, "তুমি রাগছ কেন? আমার দিকটা বোঝো। আমার কোনো স্যাকরিফাইস নেই?
"

"এসব আলোচনার সময় এটা নয়। আমি এই চান্স মিস করতে পারব না। বিয়ে নয়, ফেস্টিভালে আমার ছবি দেখানো হচ্ছে, এটাই আমার স্বপ্ন।"

কয়েকদিনের মধ্যে গয়না বেচে খানিকটা টাকা ঐন্দ্রিলের হাতে তুলে দিল হৈমন্তী। কাজ শুরু হওয়ার আগেই ঐন্দ্রিলের ছবির খবর কাগজে বেরলো। অভিনয়ের জন্য সে নতুন মুখ খুঁজছে। এর কিছুদিনের মধ্যেই নানা ধরনের খবর কানে পৌঁছতে লাগল হৈমন্তীর। সল্টলেকের ফ্ল্যাটে নতুন মুখের সন্ধানে নিয়মিত মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে ঐন্দ্রিল। শুধু তাই নয়, ঐন্দ্রিল এস আর এফটি আই বা সে ধরনের কোনো বড় প্রতিষ্ঠানে কখনও কাজ শেখে নি। ডকুমেন্টরি করে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার ঘটনাটাও নাকি ঠিক নয়।

"এই সব খবর কি সত্যি?"

ঐন্দ্রিল নির্বিকার গলায় বলল, "আমাদের লাইনে গসিপ প্রয়োজন হিমি। আর সেই গসিপের জন্য কিছু সত্যি ঘটনাও তৈরি করতে হয়।"

হৈমন্তী বিস্ফারিত চোখে বলল, "তার মানে, তুমি নোংরামি করো আর মিথ্যে বলে বেড়াও!"

ঐন্দ্রিল হাই তুলে বলেছিল, "মিথ্যে না বললে তুমি আমাকে পাত্তা দিতে? যাক, এখন ওসব বলে লাভ নেই। আমার টাকা লাগবে হিমি, অনেক টাকা। তুমি একা সে টাকা দিতে পারবে না। তবে কি আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব?"

একটু চুপ করে থেকে হৈমন্তী থমথমে গলায় বলেছিল, "কত টাকা লাগবে? আমি দেব। তার বদলে তুমি আমাকে ডিভোর্স দেবে।"

ডিভোর্স নিয়ে ঝামেলা করেনি ঐন্দ্রিল। হৈমন্তী সেই প্রথম জানল, পুরুষমানুষের বেইমানি কত সহজ অথচ কঠিন।

নগ্ন হৈমন্তীর বই পড়ার ভঙ্গিটিও বড় চমৎকার এনেছে রায়না। বইয়ের মলাটও দেখা যাচ্ছে। আর এখানেই যে কেউ ঘাবড়ে যেতে পারে।

৬

দুদিন সময় বেশি চেয়েছিল রায়না। আশ্চর্যের বিষয় হল, তারপরেও সে আজ বেশি সময় নেয়নি। বরং অন্যদিনের থেকে কমই নিয়েছে। তবে আজ যেন কাজে বেশি ডুব দিয়েছিল। এমনিতেই মেয়েটি চুপচাপ। হৈমন্তীও বাড়তি কথা পছন্দ করে না। বাইরের কারও সঙ্গে তো একবারেই নয়। ফলে দু–একটা হুঁ হাঁ ছাড়া কোনোদিনই তেমন কথা হয় না। আজ যেন আরও তাও হল না। হৈমন্তীও বইতে মন দিয়েছিল। রোজই সে বই নিয়ে বসে। আজকের বইটা ভয়ংকর, তাই খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল।

বইয়ের বিষয় ছুরি। নাম নাইভস্ টু থাউজেন্ড নাইনটিন। লেখকের নাম জো কারজম্যান। তিনি একজন ছুরি বিশেষজ্ঞ। ছুরি নিয়ে বিস্তারিত চর্চা রয়েছে। সেই কারণেই বই লেখেন। বইটি গোটা বিশ্বে তুমুল জনপ্রিয়। কয়েক লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। নতুন ছুরির ফলার মতোই ঝকঝকে। নানা ধরনের ছুরির বর্ণনায় ভরা। ছুরির ইতিহাস, ছুরির গুণাগুণ, বিশ্ববিখ্যাত ছুরি প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী সংস্থার নাম, ঠিকানা রয়েছে। সঙ্গে পাতায় পাতায় ছবি। ছুরি শুধু ভয়ংকর নয়, সে যে সুন্দরও এই বইটি না দেখলে হৈমন্তীর জানা হত না। যত পড়ছে, দেখেছে অবাক হচ্ছে। প্রাচীন থেকে একেবারে আধুনিকতম ছুরির ছবি দেখে হৈমন্তী মুগ্ধ। কত নতুন ধরনের ছুরিই না এখন তৈরি হয়! এটা একটাও শিল্প। গুণী শিল্পীরা কাজ করছেন। কোথাও ছুরিতে ব্লেডের অংশ চওড়া, কোথাও সামান্য। ফ্লিপার, ড্যাগার, সুসি, ফাইটার, টানটোজ, ফোল্ডিং স, পকেট নাইফ। হাতলে বিভিন্ন কারুকাজ। ভাঁজ করবার নানা কায়দা। গত তিনদিন ধরে এই বইটি নিয়ে হৈমন্তী পড়ে রয়েছে।

এই বইয়ের খোঁজ হৈমন্তী পায় ওয়েবসাইটে। অনলাইনে বইটা অর্ডার করে। তবে মুম্বাইতে নিজের ঠিকানায় নয়। অর্ডার করে কলকাতার এক ঠিকানায়। ঠিকানাটি যার তাকে ফোন করে।

‘তোমার অফিসের ঠিকানায় একটা প্যাকেট যাবে। ওটা আমার। তুমি যখন মুম্বাইতে আসবে নিয়ে

আসবে।'

'আমার অফিসে কেন পাঠালে?'

হৈমন্তী বলল, 'বাড়িতে পাঠালে ঠিক হত?'

'তা বলিনি, প্যাকেটে কী আছে?'

হৈমন্তী সামান্য চুপ করে থেকে বলে, 'বোমা।'

'ঠাট্টা কোর না হৈমন্তী।'

হৈমন্তী নিচু গলায় বলল, 'ঘাবড়াবার মতো কিছু হয়নি, একটা বই রয়েছে।'

'ও। কী বই?'

হৈমন্তী বলল, 'তোমার জানার দরকার নেই। প্যাকেট খুলবে না। তুমি কবে আসছো? অনেকদিন আসোনি।'

'কোথায় আসোনি ? প্রতি মাসেই তো যাই। এই মাসে যাচ্ছি না। নেকস্ট মান্থে যাব।'

'বইটা নিয়ে আসবে।'

'কীসের বই বললে না তো।'

হৈমন্তী আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, 'খুনের। হাউ টু মার্ডার। হয়েছে?'

'পাগলের মতো কী বলছো হৈমন্তী!'

হৈমন্তী বলল, 'পাগলের মতো বলার কী হয়েছে? কীভাবে খুন করতে হয় জানতে পারি না?'

এরপর হৈমন্তী ফোন কেটে দিয়ে নিজের মনেই হেসেছিল।

খানিক আগে রায়না যখন বলল, 'ম্যাডাম, আমার কাজ শেষ আপনি উঠতে পারেন।' হৈমন্তী অবাক হয়েছিল। চাপা উত্তেজনায় তার শরীর শিরশির্ করে ওঠে। সে ডিভান থেকে নেমে এগিয়ে যায়। চেয়ারে রাখা রোবটা পরে ধীরে ধীরে। আসলে সে সময় নেয়। ছবিটা দেখার জন্য মনের মধ্যে যে ব্যাকুল কৌতূহল ধরে রেখেছে, আজ তার অবসান হবে। এতগুলো সিটিং দিয়েছে, তারপরেও সে জানে না ছবিটা কেমন হচ্ছে। আজ প্রথম দেখবে। কাজ শেষ হওয়ার পর। প্রতিবার কাজ করে ইজেল যেমন ভাবে ঢাকা দিয়ে

রায়না চলে গেছে, তেমনই থেকেছে। যে মেয়েটি ফ্ল্যাট ঝাড়পোঁছ করে, হৈমন্তী তাকে কখনও একা এঘরে ঢুকতে দেয়নি। গেস্টদেরও এ ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেই। স্টাডি লক করা থাকে। নামে স্টাডি হলেও এই ছোটো ঘরটাকে হৈমন্তী বলে, 'একার ঘর।' এখানে লেখাপড়া, অফিসের কাজ করে, গান শোনে। কখনও মন খারাপ হলে একা বসে থাকে চুপ করে।

রায়না প্রথমদিন কাজ হয়ে গেলে বলেছিল, 'ম্যাডাম, আপনি কি ছবিটা দেখবেন? যদিও আজ কিছুই হয়নি। শুধু পেনসিলে ড্রইং করেছি। শরীরের এক আদল। আপনাকে চেনা যাবে না।'

হৈমন্তী বলল, 'তুমি কী চাও?'

রায়না দ্বিধা নিয়ে বলেছিল, 'কাজ কমপ্লিট হওয়ার আগে আমি ছাড়া কেউ কাজটা দেখুক আমি চাই না।'

হৈমন্তী বলেছিল, 'যদি কাজ পছন্দ না হয়?'

রায়না বলল, 'এইটুকু রিস্ক তো থাকবে। সব কিছু সবাইকে পছন্দ হতে হবে তার কোনো মানে নেই। যে কোনো আর্টই একজন আর্টিস্টের হয়। তার কেমন লাগছে সেটাই আসল। তবে আপনার বিষয়ে আলাদা। আপনি পেমেন্ট করে নিজের ছবি করাচ্ছেন।'

হৈমন্তী বলল, 'শেষে ভাল না লাগলে তো শুধরোনোর উপায় থাকবে না।'

'না, থাকবে না।'

হৈমন্তী হেসে বলেছিল, 'তখন কি আমি সারাজীবন একটা ভুল আমিকে বয়ে বেড়াব?'

রায়না একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ম্যাডাম, কিছু কিছু সময় তো তাই করতে হয়। নিজের ভুলকে বয়ে বেড়াতে হয়। হয় না? আর তা না চাইলে স্টোররুমে ফেলে রাখবেন। সেও একরকম ক্যারি করা।'

হৈমন্তী ছোটো একটা মেয়ের মুখে এমন কথা শুনে অবাক হল।

'আচ্ছা, ছবি পছন্দ না হলে কি পেমেন্ট ফেরত ?'

রায়না সামান্য হেসে বলল, 'না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আপনি আমাকে ডেকেছেন। সুতরাং পরীক্ষা দেওয়া আমার হয়ে গেছে। এবার আপনার পরীক্ষা, আমি আপনার কারেক্ট চয়েস কিনা সেই পরীক্ষা দেবেন। তাই আমার পারিশ্রমিক ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।'

হৈমন্তী খুব খুশি হল। বলল, 'ঠিক আছে তুমি কাজ করো। আমি ছবি দেখব একেবারে ফিনিশ হওয়ার পর।'

এখন সেই ছবি দেখা হল। রায়নাকে কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে তো এতো সুন্দর নয়। মেয়েটা ছবিতে কিছু একটা ম্যাজিক করেছে। সেই কারণে তাকে এমন মারাত্মক লাগছে। রায়না কি ম্যাজিক করেছে?

হৈমন্তী মুখে তুলে অস্ফুটে বলল, 'রায়না এসো, কাছে এসো। তোমাকে একটু আদর করি। ইউ আর গ্রেট।'

রায়না লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, 'থ্যাঙ্কিউ। ম্যাডাম, আমি কি একটা অনুরোধ করতে পারি?'

'বল।'

রায়না দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল, 'আমি কি একজন আমার এই কাজটা দেখাতে পারি। সে আমার ভীষণ বন্ধু। একই সঙ্গে কাজ শিখেছি। হি ইজ আ স্কালপটার। আর কাউকে নয়, শুধু একজনকে।'

হৈমন্তী হালকা হেসে বলল, 'নাম কী?'

'সোহন।'

'তোমার বয়ফ্রেন্ড?'

রায়না মাথা নেড়ে বলল, 'আমরা একসঙ্গে থাকি।'

হৈমন্তী বলল, 'ঠিক আছে। ওকে নিয়ে আসবে। তবে কিছুদিনের জন্য আমি কলকাতায় যাচ্ছি। ফিরে আসি, তারপর।'

৭

'কেমিক্যালগুলো আলামরিতে রাখা হয়েছে?'

'ইয়েস ম্যাডাম। আমি নিজে দেখে নিয়েছি।'

'ডি. স্ট্র্যামোনিয়াম?'

'ঠিক মতো আছে ম্যাডাম। লক করে রেখেছি।'

‘ওপিয়াম?’

‘ঠিক আছে।’

‘সাবধানে রাখবে। আগেরবারের মতো ঘটনা যেন না ঘটে। তুমি তো জানো ওগুলো কী ভংয়কর। সেই ঘটনার যেন রিপিট না হয়।’

‘হবে না ম্যাডাম।’

হৈমন্তী ব্যাগ গোছাতে গোছাতে মোবাইলে কথা বলছে। কথা বলছে পূরবী রাউতের সঙ্গে। পূরবী তার ল্যাবরেটরির প্রধান দুই অ্যাসিসট্যান্টের একজন। হৈমন্তী এই মেয়েটিকে যেমন পছন্দ করে, তেমন বিশ্বাস করে। কাজও জানে। ইউনিভার্সিটি থেকে ভাল রেজাল্ট করে এসেছে। যে কোনো সময় টিচিং প্রফেশনে চলে যাবে। ভাল সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে।

হৈমন্তীরও এক সময়ে ইচ্ছে ছিল বাইরে গিয়ে গবেষণা করবে, শিক্ষক হবে। সেই ভাবে তৈরিও হচ্ছিল। জিআরই, টয়েফেল দিয়ে আমেরিকার কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবে। প্রস্তুতি চলবার মাঝখানে বাবা–মা পর পর মারা গেলেন। একটা বিপর্যয় নেমে এলো। মানসিক বিপর্যয়। দ্রুত কিছু একটার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নিতে চাইল হৈমন্তী। কাজ খুঁজে নিল। সেই যে একবার প্রফেশনাল জীবনে ঢুকে পড়ল তারপর আর বেরোনো হয়নি। এসবের মাঝখানে জোর ধাক্কা দিয়ে গেল ঐন্দ্রিল। সেই ক্ষত সামলাতে সামলাতে আবার প্রেমে পড়ল। মাঝেমধ্যে হৈমন্তীর মনে হয় সে আসলেই প্রেমের কাঙাল। তার রূপ এবং গুণে মুগ্ধ হওয়ার মতো পুরুষের কোনো অভাব ছিল না। কিশোরীবয়স থেকেই তাকে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল। ফিরেও তাকাতে ইচ্ছে করেনি। কিন্ত পরে যতবার কারও দিকে তাকাতে চেয়েছে আঘাত পেয়েছে। একেই কি নিয়তি বলে? আর পাঁচজন স্বাভাবিক মেয়ের মতো ঘর সংসার করবার ইচ্ছেকে গোপনে মনের ভিতর লালন করেছে। তাকে সত্যি করতে পারেনি। নিজের কেরিয়ারে যতটা উন্নতি করেছে, ব্যক্তি জীবনে ততটাই ব্যর্থ, নিঃস্ব। নিসঙ্গতা ঘিরে ধরে। ক্লান্ত, বিষণ্ন লাগে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মন কাঁদে, কোনো কোনো সময় প্রবল রাগে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। উঠে বসে বিছানা। দু’হাতে কপালের রগ টিপে ধরে ইচ্ছে করে, যারা ঠকিয়েছে তাদের খুঁজে বের নিজের হাতে গলা

টিপে খুন করে। তবেই শান্তি। উন্মাদের মতো লাগে। ধীরে ধীরে নিজেকে শান্ত করে। 'ক্রোধে উন্মত্ত হৈমন্তী'কে সে বোঝায়।

'এই পাগলামি তোমাকে মানায় না। তোমার বয়স হয়েছে হৈমন্তী। নিজের ব্যক্তিজীবনকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নাও। তোমার কীসের অভাব? টাকা –পয়সা, কেরিয়ার, শখ আহ্লাদ সবই তো তুমি পেয়েছো। কর্মক্ষেত্রে তুমি যোগ্যতা দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছো। পুরুষ শরীর পেতে ইচ্ছে করলে তাও পেতে পারো। এর জন্য সংসার করার কী প্রয়োজন? কতো মেয়েই তো জীবন একা কাটায়। তারা তো সুখেই থাকে। অতীত আঁকড়ে এই দুঃখ বিলাসিতা তোমাকে মানায়।'

মানুষের সমস্যা হল, মন যেমন যুক্তির কাছে বশ্যতা মানে, তেমনই আবার মানেও না। হৈমন্তী ব্যতিক্রম নয়। সারাদিন কাজের পর কোনো কোনোদিন তার কান্না পায়, কোনো কোনোদিন রাগে ফুঁসতে থাকে। জোয়ার ভাঁটার মতো। জল চলে যায়, আবার ফণা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীরে।

হৈমন্তী পূরবীর সঙ্গে কথা বলেছে মোবাইলে প্লাগ লাগিয়ে।

'পূরবী, মনে রাখবে, আমরা এমন সব কেমিক্য লস্ নিয়ে কাজ করি যেগুলো ভংয়কর। আমি যে কদিন ল্যাবরেটিরতে যাচ্ছি না, তুমি দায়িত্ব নিয়ে এগুলো লক করবে। লিস্ট মিলিয়ে রাখবে।'

'জানি ম্যাডাম। সেবারের ঘটনাটা অ্যাক্সিডেন্টাল।'

হৈমন্তী তার একটা জামায় হালকা আয়রন বোলাচ্ছে। বলল, 'আমি জানি, ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, তবে তারপর থেকে আমাদের অ্যালার্ট থাকতে হবে।'

বাইরে থেকে শুনলে মনে হবে, সামান্য একটা কেমিক্যাল নিয়ে হৈমন্তীর মতো অভিজ্ঞ কেমিস্ট কি একটু বেশি উদ্বিগ্ন হচ্ছে না? এতবার অ্যাসিসটেন্টের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবার দরকার কী? পূরবী একজন সিনসিয়ার কর্মী। একবার বললেই হয়। হৈমন্তী সম্ভবত, বেশি চিন্তা করছে। আবার এমনটাও হতে পারে, গতমাসের ঘটনাটার কারণেই এই উদ্বেগ। ঘটনাটা উদ্বেগের ছিল। কিছু হয়নি, কিন্তু হলে মুশকিল হতো।

ঘটনাটা ছিল এরকম—

বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছের এক্সট্র্যাক্ট নিয়ে হৈমন্তীদের লেবরেটরিতে কাজ হয়। এদের মধ্যে বেশিরভাগই অতিরিক্ত মাত্রায় কনসেন্ট্রেটেড্। এত ঘন যে কয়েক ফোঁটা নিলেই কাজ চলে যায়। এদের মধ্যে কিছু রস ভয়ংকর বিষাক্ত। মানুষকে মেরে ফেলতে বেশি সময় নেয় না। আবার এসবের মধ্যেই রয়েছে নানা রোগের প্রতিষেধক। বিষ বাদ দিয়ে গাছের রোগ প্রতিষেধক গুণ বের করে কাজ করতে হয় হৈমন্তীদের। কোন গুণ সাবানে যেতে পারে, কোনটা যেতে পারে তেলে, কোনটা ইচ্ছে করলে ক্রিমে মেশানো যায় তাই নিয়ে রিপোর্ট তৈরি হয়। এই সব এক্সট্র্যাক্ট আসে বাইরে থেকে। অর্ডার দিলেই হয় না। স্পেশাল রিকুইজিশন লাগে। সঙ্গে ল্যাবরেটরির লাইসেন্সের কপি দিতে হয়। কী ধরনের গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে জানাতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই নানা ধরনের কনসেন্ট্রেটেড্ এক্সট্র্যাক্টের শিশিতে ল্যাবরেটরি ভর্তি। একের পর এক তালা দেওয়া আলমারি। এসবের জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা রাখা হয়। দাম অনেক। চুরি করে কেউ বাইরে বেচে দিলে তিনগুণ বেশি দাম পাবে। তারপর ভয়ংকর সব বিষ। এসবের মূল দায়িত্ব ল্যাবরেটরির হেডের। সে না থাকলে দায়িত্ব অন্য কারওকে বুঝিয়ে দিতে হয়। এবার যেমন হৈমন্তী পূরবীকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সে যতক্ষণ না কলকাতা থেকে ফিরে জয়েন করছে ততক্ষণ পূরবী বুঝবে। এর আগেও বুঝেছে। এবারে হৈমন্তীর এই বাড়াবাড়ি চিন্তার কারণ গতমাসে পরপর দুদিনে দু–দুটো শিশি নিখোঁজ হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষ করবার পর লগ বুক মেলাতে গিয়ে ধরা পড়ে। প্রথমে পাওয়া যায় না ডি. স্ট্র্যামোনিয়া। পরের দিন হারায় ওপিয়ামের শিশি।

খুব টেনশনে কেটেছিল হৈমন্তীর। কাউকে বলতে পারেনি। জানত শুধু পূরবী। হৈমন্তী ঠিক করেছিল, সে আর পূরবী মিলে দুটো দিন চুপচাপ খোঁজার পর সবাইকে জানানো হবে। নইলে বিচ্ছিরি একটা আতঙ্ক তৈরি হবে। কোম্পানির ওপরমহল জানলে থানা পুলিশ পর্যন্ত করতে হতে পারে। তিনদিনের মাথায় খোঁজ পাওয়া যায়। আলমারি বদল হয়ে গেছে। তারপর থেকেই হৈমন্তী বেশি সতর্ক হয়েছে। প্রতিদিন কাজ শেষ হলে আলমারি ধরে ধরে খাতা মেলানো হয়।

হৈমন্তী আয়রন করা জামা ব্যাগে ঢোকাল।

‘পূরবী দুটো রিপোর্টে পাঠানোর আছে। দুটোই রেডি,ফাইনাল দেখে নেবে।’

‘দেখব ম্যাডাম।’

‘স্যাম্পেলের ব্যাচ নম্বর গুলো যেন ঠিক থাকে। ’

‘অবশ্যই।’

‘আমি কলকাতায় যাচ্ছি। পারসোনাল কাজে। খুব প্রয়োজন ছাড়া ফোন করবে না। ফোন বন্ধও থাকবে। প্রয়োজনে আমিই যোগাযোগ করব।’

পূরবী নিচু গলায় বলল, ‘হ্যাপি জার্নি ম্যাডাম।’

হৈমন্তী ফোন কেটে খুব সাবধানে ব্যাগ আটকাল। ছোটো হলেও ভিতরে কাচের শিশি রয়েছে। লাগেজে রাখলেও একটু জার্কিং তো হবে।

তুষার তার জন্য এরকম যত্ন করেই বিদেশ থেকে সেন্ট এনেছিল।

‘কত যত্ন করে এনেছি জানো?’

হৈমন্তী ভুরু কুঁচকে বলেছিল, ‘কত যত্ন করে?’

তুষার গাঢ় স্বরে বলেছিল, ‘তোমার সঙ্গে আমার প্রেমে যেমন যত্ন। নাও কাছে এসো- নতুন সেন্টটা একটু গায়ে স্প্রে করে দিই।’

ঐন্দ্রিল চলে যাওয়ার পর এসেছিল তুষার। দ্বিতীয় প্রেম। মাঝে চার বছরের ব্যবধান। তুষারের মধ্যে কোনো শিল্প টিল্পর বালাই ছিল না। একেবারে শুকনো বিজনেসম্যান। বাড়ির বিজনেস। আলাপ হয়েছিল মুম্বাই এয়ারপোর্টে। দুজনেই দিল্লি যাচ্ছে। গোস্ট কলে ফ্লাইট লেট। কে যেন ফোনে হুমকি দিয়েছে বোম্ মেরে ফ্লাইট উড়িয়ে দেবে। হৈমন্তী বই খুলে লাউঞ্জে বসে গিয়েছিল। পাশে লম্বা চওড়া ছেলেটিকে খেয়াল করেনি। একসময়ে উঠেও যায়। খানিক পরে হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে,‘এক্সকিউজ মি, আমার মোবাইল ফোনটা কি আপনি দেখেছেন?’

হৈমন্তী বিরক্ত হয়ে বলে বই থেকে মুখ সরিয়েছিল।

‘না।’

ছেলেটি অধীর হয়ে বলে, ‘কিন্তু আমি তো আপনার পাশের চেয়ারেই রেখেছিলাম।’

হৈমন্তী এবার বিরক্ত গলায় বলল, 'রাখতে পারেন, আমি দেখিনি।'

'সেকী! আপনি দেখেননি!'

হৈমন্তী এবার সোজা হয়ে বসে কড়া গলায় বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো? আপনার ফেলে যাওয়া ফোন পাহারা দেওয়া কি আমার কাজ ছিল?'

সুন্দরী মেয়ের ধমকে গা না করে ছেলেটি বলল, 'আপনার পাশে কি কেউ এসে বসেছিল?'

হৈমন্তী আরও কড়া বলল, 'দেখিনি।'

ছেলেটি এবার অতি বিরক্ত গলায় বলল, 'আপনি তো কিছুই দেখননি দেখছি! আমার তো সন্দেহ হচ্ছে। দেখেও না দেখার ভান...ওই ফোনে আমার এভরিথিং রয়েছে। ইস্ কী হবে?'

এতো বড় একটা ছেলেকে এই ভাবে বিচলিত হতে দেখে হৈমন্তী এবার রাগ ভুলে মজাই পেল। বলল, 'সিকিওরিটি কাছে গিয়ে কমপ্লেন করুন। কেউ নিলে সিসিটিভিতে ধরা পড়বে। আমিও যদি নিই দেখা যাবে।'

ছেলেটি এবার উৎসাহ নিয়ে বলল, 'এটা ঠিক বলেছেন।'

সে সিকিওরিটি অফিসের দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই তার কাঁধের ব্যাগে ফোন বেজে ওঠে। এক গাল হেসে ছেলেটি লাফিয়ে ওঠে।

'ওই তো আমার ফোন! ওয়াশরুমে যাওয়ার সময়ে ব্যাগে ঢুকিয়েছিলাম, সেটাই ভুলে গিয়েছি।' ফোন বের করতে করতে ছেলেটি বলল, 'আমি খুবই লজ্জিত। আপনাকে এমন ভাবে বললাম।'

হৈমন্তী বলল, 'আমি খুবই নিশ্চিন্ত যে আপনার মোবাইল চুরি করে ধরা পড়তে হল না।'

'আমাকে ক্ষমা করবেন। মাথার ঠিক ছিল না।'

'আচ্ছা ক্ষমা করলাম।' বলে মুচকি হেসে হাতের বইয়ে মন দ্ল হৈমন্তী। আড়াই ঘন্টা পর প্লেনে উঠলে হৈমন্তী দেখতে পেল সেই ছেলের সিট তার পাশে পড়েছে। হৈমন্তী মুচকি হেসে বলল, 'নিজের জিনিস সাবধানে রাখবেন।'

ছেলেটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

এই ছেলেটিই তুষার। আলাপ এবং প্রেমের আটমাসের মধ্যে সে জানায়, বাড়িতে থেকে বিয়ের চাপ দিচ্ছে।

হৈমন্তী বলল, 'আমার কথা বলেছো?'

তুষার আমতা আমতা করে বলে, 'চাকরি করা বউ আমাদের বাড়িতে অ্যালাও কর হয় না। আমার দুই দাদাও...তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও হৈমন্তী...বাড়ির অমতে আমি যাইনি কখনও।'

হৈমন্তী শরীর কেঁপে ওঠে। সে একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তোমাকে জানাব।'

তুষারের সঙ্গে সেটাই ছিল হৈমন্তীর শেষ কথা। আর কোনোদিন তার ফোন ধরেনি। প্রতিজ্ঞা করেছিল, অনেক হয়েছে, আর পুরুষমানুষ নয়। তখনও কি সে জানত আবার পুরুষমানুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে? আবার অনাবৃত হবে? তবে এবার নিজেকে অন্যভাবে তৈরি করেছে। আর প্রতারিত হবে না। এবার অন্য খেলা।

সেই খেলা ভয়ংকর। সেই খেলা মৃত্যুর।

৮

'এ মোহ আবরণ খুলে দাও, দাও হে।

সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,

চাও হৃদয়মাঝে চাও হে।'

সুবিনয় রায় গাইছেন। এমনিতেই সুবিনয় রায়ের গলা গমগমে। ভাল মিউজিক সিস্টেমে গলা আরও গমগম করছে।

টুকটাক্ ঘরের কাজ সারতে সারতে মুকুর গান শুনছে। ছুটির দিন সকালে মুকুর খানিকক্ষণ গান শোনে। নির্দিষ্ট কোনো গান নয়, যখন যেরকম ভাল লাগে। বাংলা আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, হিন্দি ফিল্ম। বাছবিচার কিছু নেই। পুরোনো গান নিয়ে যেমন আদিখ্যেতা নেই, নতুন গান নিয়ে তেমন হ্যাংলামোও নেই। তবে গানের ব্যাপারে তার একটা মজার স্বভাব আছে। কোনো গান শুনে যদি ভাল লেগে যায়, বারবার সেই

গানটাই শুনতে থাকবে। শুধু এখানেই থামবে না। সেই গানটা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ারও চেষ্টা করে। কার লেখা, কে সুর দিয়েছিল, কবে গাওয়া হয়েছিল এইসব। এর জন্য তার একজন ফেলুদার মতো 'সিধু জ্যাঠা' আছে। না, 'সিধু জ্যাঠা' নয়, 'সিধু জেঠি'। মুকুরের কলিগ শ্রাবন্তী। ওর গানের গলা ভাল নয়, তবে গানবাজনা, সিনেমা, থিয়েটার নিয়ে খোঁজ খবর রাখে। এই বিষয়ে ওর স্টকে প্রচুর বই, ম্যাগাজিন রয়েছে। শ্রাবন্তীর বাবা একসময়ে গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিনয় করতেন। থিয়েটারে গানও গাইতে হতো। সম্ভবত সেই কারণেই মেয়ের মধ্যে এইসব গান বাজনার নেশাটা রয়েছে গেছে । 'এ মোহ আবরণ' গানটা নিয়ে একটু আগেই শ্রাবন্তীকে ফোন করেছিল মুকুর।

শ্রাবন্তী বলল, 'এ তো রবীন্দ্রনাথের গান।'

'সে তো জানি, তুমি একটু ইনফর্মেশন দাও।'

শ্রাবন্তী বলল, 'ইনফর্মেশন দেওয়ার কী আছে? যাকে জিগ্যেস করবে সে–ই বলে দেবে। এই ভদ্রলোকের গান নিয়ে তিন হাজার তিনশো তিপান্ন রকমের গবেষণা হয়েছে। বেশিও হতে পারে। অজস্র বইও তো রয়েছে।'

মুকুর বলল, 'তুমি কি আমাকে এখন তিন হাজার তিনশো তিপান্নটা বই ঘাঁটতে বলছো শ্রাবন্তী?'

শ্রাবন্তী বলল, 'ঠিক আছে, কী জানতে চাও বলো। দেখি পাই কিনা।'

মুকুর বলল, 'স্পেসিফিক কিছু নয়। যেটুকু পাবে। আমি তো কিছুই জানি না। গানটা এতো সুন্দর! সুন্দর একটা গান সম্পর্কে কিছু না জানলে গান শোনাটা কেমন ইলকমপ্লিট লাগে। মন হয়, পুরোটা বোঝা হল না।'

শ্রাবন্তী হেসে বলল, 'তোমার যত রাজ্যের খেপামি মুকুরদি। ঠিক আছে, একটু সময় দাও। শান্তিনিকেতনে কল্যাণকাকুকে ফোন করছি। একসময়ে উনি সঙ্গীতভবনের শিক্ষক ছিলেন। রবিঠাকুরের গানের ডিরেক্টরি।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যে মুকুরের ওয়াটসঅ্যাপে শ্রাবন্তীর মেসেজ চলে এলো

'এ মোহ আবরণ—রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান। ২৩ বা ২৪ বছর বয়েসে লিখেছিলেন। সম্ভবত ২৩

বছর বয়েসে। গানের রাগ ইমন। গানটি তৈরি করা হয় আদি ব্রাহ্মণ সমাজ মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে। স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন ইন্দিরা দেবী। আপাতত এইটুকু। পরে আরও পাওয়া গেলে জানাব।'

এই মেসেজ পাওয়ার পর মুকুর গানটা আবার শুনছে। মনে হচ্ছে, তথ্য জানাবার পর গানটা যেন একটু বেশি গম্ভীর গম্ভীর লাগছে। কোনো গান সম্পর্কে তথ্য জানবার এটাই মজা। জানবার পর একটু হলেও গান অন্যরকম হয়ে যায়। মহম্মদ রফির গাওয়া একটা গান নিয়ে একবার এরকম হয়েছিল। গানটা আগে একরকম লেগেছে, পরে যখন জানা গেল, আর্টিস্ট গায়ে জ্বর নিয়ে এই গান গেয়েছিলেন, তখন আরেক রকম মনে হল। মনে হল, শরীর ভাল থাকলে গানের ভিতরের প্রেম ভাবটা আরও ভাল ভাবে ফুটত। না জানলে এমন মনে হতো না।

আজ কিন্ত সবার ছুটি নয়, শুধু মুকুরের ছুটি। তার স্কুলের 'ফাউন্ডেশন ডে'। পরপর তিনদিন ছুটি পাওয়া গেল। কাল শনিবার কী একটা পরব আছে। পরশু তো রবিবার। ফলে তিনদিন ছুটি। ছুটির কথা জানবার পর টিচার্সরুমে মিটিঙ হয়েছিল। দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়া হবে। দীঘা, তালসারির মতো কোথাও একটা টুক্ করে ঘুরে আসা যায় না? এই ধরনের বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে টিচারদের মধ্যে মুকুরের উৎসাহ সবথেকে বেশি। তার ছেলেপুলে নেই। বরকে নিয়ে একার সংসার। সেই অর্থে ঝাড়া হাত পা। তারওপর সুনন্দ মানুষটা চমৎকার। বউয়ের কোনো উৎসাহে বাধা দেয় না। তার অবশ্য একটা অন্য কারণও আছে। বিয়ের পাঁচ বছর পরেও তাদের এখনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। ফলে মুকুর খানিকটা একা। যদিও মা হবার বয়স এখনও অনেকটা পড়ে আছে। ডাক্তারও সেরকম বলেছে। তাও চিন্তা তো থাকে। যদিও মুকুর বিষয়টা নিয়ে একেবারে আলোচনা চায় না। চিন্তা নিজের ভিতরে রাখে। আত্মীয়রা বিরক্ত করে বেশি। এটা সেটা বলার পর, বাচ্চার কথা জিগ্যেস করে বসে।

'কী রে, অনেকদিন তো হল, এবার ভাল ডাক্তার দেখা।'

'ভাল ডাক্তারই দেখাচ্ছি কাকিমা।'

'রাগ করিস না, মাথা ঠান্ডা করে শোন। এসব অসুখ শুধু ডাক্তাকে সারে না।'

মুকুর রাগ সামালে ঠান্ডা গলায় বলে, 'কী লাগে ?'

‘আমি একজনকে চিনি, খুব ভালো মাদুলি দেয়। একদিন শনিবার করে আমার সঙ্গে চল।’

মুকুর আত্মীয়দের অ্যাভয়েড করতে শুরু করেছে। তবে তার ‘একা’ হওয়ার কারণ শুধু এটাই নয়, সুনন্দর চাকরিও একটা কারণ। সুনন্দ ইঞ্জিনিয়র। বড় চাকরি করে। কলকাতায় অফিস হলেও বড্ড ট্যুরে যেতে হয়। মাসে তিন চারবার করে মুম্বাইতে ছোটে। পুনের কাছে কোথায় যেন কাজ চলছে। কোনো কোনোবার দশ–বারো দিন পর্যন্ত থাকতে হয়। সাউথ ইন্ডিয়াতেও কাজ পড়ে। গতমাসেই চেন্নাই ছুটতে হল। এই সময়গুলো মুকুরের একাই থাকতে হয়। তবে ব্যস্ত থাকবার মতো তার কাজ অনেক। তার মধ্যে একটা অংশ বাধ্যতামূলক। চাকরির জন্য করতেই হয়। আর একটা অংশ সে নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। স্কুলের গাদাখানেক খাতা দেখা থাকে। পড়ানোর জন্য রোজ রেডি হতে হয়। সে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের সায়েন্স টিচার। কেমিস্ট্রি পড়ায়। সাবজেক্ট হিসেবে কেমিস্ট্রি একবারেই ইজি নয়। ছাত্রীদের সহজ করে বোঝানো আরও কঠিন। সিলেবাস দিন দিন কঠিন হচ্ছে। তাই রোজই প্রিপারেশন নিয়ে স্কুলে যেতে হয়। এছাড়াও মুকুর গান বাজনা শোনে, বই পড়ে, থিয়েটার দেখতে যায়। মাঝে মধ্যে শপিং মলে ঘোরে। কিছু স্কুল -কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। বহ্নিশিখা, অত্রিনা, হৈমন্তী। কলেজের ব্যাচমেট সব। এদের মধ্যে হৈমন্তীর সঙ্গে সম্পর্কটাই সবথেকে বেশি হয়েছে। তাও মাঝখানে যোগাযোগ ছিল না, তিন বছর হল রিনিউড্ হয়েছে। ঘনিষ্ঠও হয়েছে। হৈমন্তী মজার, খেপুটে ধরনের মেয়ে ছিল। স্টুডেন্ট হিসেবে ব্রিলিয়ান্ট। দেখতেও মিষ্টি। কলেজে সবাই ‘মিস্ কেমিস্ট্রি’ বলে ডাকত। পরে মেয়েটার ওপর দিয়ে মারাত্মক সব ঝড় বয়ে গেছে। ভিতরের উচ্ছ্বাসটা কমে গেছে। এখন পুনেতে ভাল চাকরি করছে। যে কোনো সময় বিদেশে চলে যাবে। কলকাতায় কাজে এসে দু’বার দেখা করে গেছে। একবার ফ্ল্যাটেও এসেছিল।

আড্ডার একটা পর্যায়ে মুকুর বলছিল, ‘খুব গম্ভীর হয়ে গেছিস হৈমন্তী।’

‘আমাদের চাকরিতে গম্ভীর থাকাটাই শর্ত। অফিসে ঢোকবার আগে যখন ফর্ম ফিলাপ করেছিলাম, তখন একটা পয়েন্ট ছিল—কোনটা পছন্দ? হাসিখুশি না গম্ভীর? যারা হাসিখুশিতে টিক দিয়েছিল, তাদের সবাই আউট। কারও চাকরি হল না। আমার মতো যারা রামগড়ুরের ছানা তারা কেবল চাকরি পেলাম।’

দুজনে হেসে উঠল। মুকুর বলল, ‘এই তো চমৎকার মজা করতে পারিস।’

‘তোর কাছে এসে পারছি মুকুর। ’

‘তাহলে এরপর থেকে কলকাতায় এলে হোটেলে না উঠে আমার ফ্ল্যাটে উঠবি।’

হৈমন্তী হেসে বলেছিল, ‘ফ্ল্যাটের ভাগ নিচ্ছি বলে তোর বর মারবে।’

‘ওমা! কেন? মারবে কেন! সুনন্দ খুব ভালোমানুষ।’

হৈমন্তী শুকনো হেসে বলেছিল, ‘ভালোমানুষরা আমাকে সহ্য করতে পারে না। আমার পাস্ট দেখলেই বোঝা যাবে। সবাই আমাকে কোনো না কোনোভাবে বিট্রে করেছে।’

মুকুর হৈমন্তীর গায়ে হাত রেখে বলল, ‘ওভাবে বলিস না।’

হৈমন্তী লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, ‘আর বলব না। তোর বর কেমন ভাল শুনি? রোজ আদর করে?’

মুকুর ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ‘রোজ তাকে পাই কই? ট্যুরে ঘুরে বেড়ায়।’

হৈমন্তী বলল, ‘ভেরি গুড। রোজ রোজ আদর করলে আদর একঘেয়ে হয়ে যায়।’

ছুটিছাটা থাকলে মুকুর কলিগদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে বেড়াতে যায়। সব মিলিয়ে হইচইয়ের মধ্যেই থাকতে চেষ্টা করে মুকুর।

মুকুর বলল, ‘তোমরা যাও এবার আমার হবে না।’

মধুমিতাদি বলল, ‘কেন? তোমার হবে না কেন?’

মুকুর বলল, ‘একটা অনুষ্ঠান আছে।’

চন্দনা বলল, ‘কী অনুষ্ঠান? পরে করলে হয় না?’

মুকুর হেসে বলল, ‘না। স্পেশাল অনুষ্ঠান। ডেট বদলানো যাবে না।’

৯

মুকুর মিউজিক সিস্টেম বন্ধ করে ফোন নিয়ে সোফায় বসল। ফোনের সঙ্গে ডায়েরি। এই ডায়েরির একটা নাম আছে। সিক্রেট ডায়েরি। নামের কারণ আছে।

এখন আর কেউ ফোনের জন্য হাতে লেখা ডায়েরি ব্যবহার করে না। ফোনবুকেই সব রাখা থাকে। মুকুর ব্যবহার করে। সবসময় নয়, অনেক ফোন করতে হলে করে। তাছাড়া মুকুরের ডায়েরিতে একট মজার ব্যাপার আছে। কেউ জানে না। এমনকি তার বর সুনন্দও নয়। ডায়েরি থাকে কাবার্ডের একবারে নিচের তাকে। এখানে মুকুরের লেখাপড়ার বই আছে। বেশিরভাগই কলেজের বই। কেউই হাত দেয় না।

মুকুর এখন সিক্রেট ডায়েরির মজা হল এখানে নম্বর, ঠিকানার সঙ্গে নানা ধরনের নোট থাকে। কার সঙ্গে কী কথা হল, তার একটা বিশেষ কথা হয়তো লিখে রাখল। এতে পরের কথার একটা কিউ যেমন পাওয়া যাবে, তেমন জরুরি কিছু হলে লেখা থাকবে। তবে বেশিরভাগ সময়েই মুকুর উলটোদিকের মানুষটার মুড ধরবার চেষ্টা করে। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

মণিকা রায় (হেড মিসট্রেস)— কেমন যেন থমথমে গলা লাগল। হুঁ, হাঁ বলে ফোন রেখে দিল। কোনো কারণে চটে আছে নাকি?

বাবু (মামাতো ভাই)— ওর ধার চাওয়াটা বেড়েছে। সুনন্দর ইনডালজেন্সে হচ্ছে।

নির্মলদা (কলিগের স্বামী)— এখনও বউয়ের ফোন ধরে!

মধুসা (বন্ধু)— ফট করে রেগে গেল কেন? আমার ওপর জেলাসিটা আজও গেল না। স্কুলে আমি ফার্স্ট হতাম এটা এই ধেড়ে বয়েসেও ভুলতে পারে না।

মেজোকাকিমা— খুব আশ্চর্যের ব্যাপার আজ আর বাচ্চা টাচ্চার কথা তুলল না।

নিতাইয়ের মা (কাজের মাসি)— একটুও জ্বর নয়। জোর করে কাশল। এই নিয়ে তিনদিন কামাই।

মিঠু (পরিচিত, বন্ধুর মতো)— সুনন্দ সম্পর্কে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। কী বলতে চাইল? কিছু দেখেছে।

কাঁকনদি (আত্মীয়)— উলের প্যাটার্ন বলতে হবে।

হৈমন্তী (কলেজের বন্ধু)— একটা মিথ্যে কথা বলেছে। মিথ্যেটা ধরতে পারছি না।

বাচ্চুকাকু (আত্মীয়)— খালি খারাপ খবর দেবে। আজ মেজদিদার মৃত্যুর খবর দিল।

সুনন্দ— সামথিং রং।

এইরকম সব নোট লেখা আছে। অনেকটা কোডের মতো। সবটা বোঝাও যায় না।

সেই ডায়েরি খুলে এখন পরপর ফোন করবে মুকুর। হাতে মাত্র একটা দিন। গেস্টদের রিমাইন্ডার পাঠাতে হবে। শুধু গেস্ট নয়, কেটেরারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ঠিক সময়ে যেন ওরা রান্নাবান্না নিয়ে চলে আসে। এখন সুবিধে হয়েছে। কম লোকের কাজ হলে, কেটেরার একেবারে রান্না–খাবার নিয়ে চলে আসে। খাবার সার্ভ করবার আগে গরম করে নিলেই হল। এমনকী গরম করবার গ্যাস সিলিন্ডার, ওভেনও ওরা আনে। বাকি খাবার রান্না করা হলেও, ভাজাভুজির আইটেমগুলো নিয়ে এসে ভাজে। সেদিক থেকে কোনো চিন্তা নেই। গরম করার জন্য ছাদের একপাশে ব্যবস্থা হয়েছে। মাথার ওপর চাঁদোয়া মতো একটুকরো কাপড় টাঙিয়ে দিলেই হবে। ডেকরেটরকে বলা আছে। কাল সকালে এসে টাঙিয়ে দেবে। আজ ফোন করে বলতে হবে ক'টা চেয়ারও চাই। নিউমার্কেটে ফুলের অর্ডার দেওয়া আছে। তাদেরও মনে করিয়ে দিতে হবে। বিকেলের মধ্যে এসে সাজিয়ে দেবে। কাল আর সময় পাওয়া যাবে না। গাদাগুচ্ছের ফুল নয়, শুধু সদর দরজাটা খুব ঝলমলে করে সাজানো হবে। নেমপ্লেটের ওপর একটা ফুলের পর্দা থাকছে। নেমপ্লেটটা কালকের প্রোগ্রামে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাকি সব ঘরে ফুলদানিতে ফুল থাকবে। সুনন্দর সঙ্গে গিয়ে ফুল পছন্দ করে এসেছে মুকুর। ফুলের দোকানদার অনুষ্ঠানের কথা শুনে বলল, 'আরে বাঃ, এমন অকেশনের কথা তো আগে শুনিনি! ম্যাডাম, একেকটা ঘরে একেকরকম ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করি?'

মুকুর বলেছিল, 'নানা, বেশি কিছু নয়। শুধু ফুলদানিতে ফুল দিলেই হবে।'

দোকানদার বলল, 'তাই তো বলছি। চারটে ঘরে চার রকমের ফুল।'

সুনন্দ পাশ থেকে বলল, 'সেটাই ভাল হবে।'

এখন সবই মেকশিফটে করা যায়। নেমন্তন্নের জন্য হোস্টকে কিছু ভাবতে হয় না। খাওয়া দাওয়া, সাজগোজ, আপায়্যন সব আউট সোর্সিং। নানা ধরনের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ হয়েছে। তারা যে কী পারে না! বিয়ে, শ্রাদ্ধ, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন সব তুলে দিচ্ছে। কিচ্ছু ভাবতে হয় না। এই তো কিছুদিন আগে সুনন্দর এক বসের মেয়ের বিয়েতে গিয়েছিল মুকুর। সেখানে সবটাই বাইরের লোকের হাতে ছাড়া

ছিল। বিয়ে আর খাওয়াটুকু যা নিজেদের। রিসেপ্‌শনে যে ছেলেময়েরা ছিল, তারা এমন ভাবে কথা বলছিল যেন অনেকদিনের পরিচিত। এমনকী গেস্টেদের সম্পর্কে তাদের হাতে ছোটোখাটো তথ্যও ছিল। কার অফিস থেকে বেরোতে দেরি হয়, কার বাড়িতে অসুস্থ মানুষ রয়েছে, কার ছেলে এবছর হায়ার সেকেন্ডারিতে ভাল রেজাল্ট করেছে—সব। মুকুর অবাক হয়েছিল। মিলিয়ে মিলিয়ে বলছে কী করে!

'আসুন স্যার, মেসোমোশাই কেমন আছেন?'

'ম্যাডাম আপনাদের নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। উল্টোডাঙা ব্রিজে হেভি ট্রাফিক হচ্ছে। আপনাদের তো ওই রুটটাই সুবিধেজনক।'

'স্যার কনগ্রাচুলেশন। ছেলে এতো ভাল রেজাল্ট করছে...উই ফিল প্রাউড ফর হিম।'

এসব শুনে খানিকটা যেন ভড়কেই গিয়েছিল মুকুর। সুনন্দ বলেছিল, 'এত অবাক হওয়ার কিছু নেই। হোমওয়ার্ক করেছে। এর জন্য ওরা পেমেন্ট পায় মুকু।'

মুকুর চাপা গলায় বলল, 'পেমেন্ট পায় তো জানি, কিন্তু মিস্টার রায়, মিসেস সেনকে আলাদা করে চিনছে কী করে!'

সুনন্দ বলল, 'তুমি খেয়াল করনি। ওদের কানে ব্‌লু টুথ আছে। কেউ আড়ালে বসে চিনিয়ে দিচ্ছে।'

মুকুর আরও নিচু গলায় বলল, 'আড়ালে বসা লোকটা কে? তোমার বস ?'

সুনন্দ বলল, 'হতে পারে। বসের কোনো চেলাচামুন্ডাও হতে পারে। আগে থেকে ছবি টবি হয়তো জোগাড় করে রেখেছে। এখন ইনফর্মেশনের যুগ মুকুর। সব ডেটা নিয়ে কারবার। কে কীভাবে ডেটা সাপ্লাই করেছে কে বলতে পারবে?'

মুকুরের মনে হয়েছিল, এ এক আশ্চর্য পৃথিবী তৈরি হচ্ছে। মানুষ–রোবটের পৃথিবী। মানুষের ভিতরে কিছু ডেটা ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, সেই ডেটা অনুযায়ী সে হাসবে, হ্যালো বলবে, বাতের ব্যথা কেমন আছে জিগ্যেস করবে।

মুকুরদের অনুষ্ঠান অবশ্য বিরাট কিছু নয়। ছোটো একটা পার্টি। পার্টি না বলে গেট টুগেদার বলা যায়। মোটে তেরোজন আসছে। তেরো নম্বর মানুষটি অবশ্য প্রথমে লিস্টে ছিল না। হঠাৎই ঢুকেছে। সে সুনন্দর

জন্য সারপ্রাইজ হবে। এই মানুষটির কথা সুনন্দ তার মুখে শুনেছে কিন্তু 'মুখোমুখি' দেখা হয়নি। অন্তত এমনটাই জানে মুকুর। সুনন্দও কি তাই বলবে?

মুকুর ভেবেছিল, বাইরে কোনো হোটেলে পার্টি করবে। অনেকেই আপত্তি করল। সবথেকে আপত্তি করল ছন্দাদি। ছন্দা সাহা। বলল, 'এরকম একটা ইন্টারেস্টিং অনুষ্ঠান কেউ বাইরে করে?'

কথাটা ঠিক। নিউমার্কেট থেকে ছন্দা সাহা সকলেই অকেশনটা নিয়ে মজা পেয়েছে। পাওয়ারই কথা। নিউটাউনে আটতলার ওপর এই ফ্ল্যাট মুকুররা কিনেছিল এক বছর তিন মাস আগে। সেই অর্থে ফ্ল্যাটের বর্ষপূর্তিও বটে। এক বছরের জন্মদিন। মুকুর কিছুদিন ধরে ভাবছিল, এই এক বছর উপলক্ষ্যে একটা কিছু করবে। যাদের গৃহপ্রবেশ, মতপার্থক্যে ফ্ল্যাট প্রবেশের দিন ডাকা হয়নি, তাদের মধ্যে থেকে কজনকে ডাকবে। একদিন রাতে শোবার সময় সুনন্দকে বলেও ফেলল।

সুনন্দ বলেছি, 'যা খুশি করো, আমাকে টানা হেঁচড়া করবে না।'

মুকুর ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল, 'তুমি থাকবে না!'

'থাকব না তো বলিনি। কাজ না থাকলে অবশ্য থাকব।'

মুকুর বলল, 'ছুটি নেবে।'

সুনন্দ বলল, 'তুমি জানো তো ছুটি নেওয়া আমার কত ঝামেলা।'

মুকুর স্বামীর ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেছিল, 'ওসব শুনব না।'

সুনন্দ বলে, 'আচ্ছা সে হবে। অকেশনটা কী?'

মুকুর সুনন্দ গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'এখন বলব না। একটা দারুন আইডিয়া এসেছে।'

বলতে বলতে মুকুর সুনন্দর জামার বোতাম খুলতে থাকে।

'ভেবেছি ইউনিক। তবে একজনের হেল্প নেব ঠিক করেছি ।'

সুনন্দ বলে, 'খুবই রহস্যজনক পার্টি মনে হচ্ছে।'

সুনন্দর নগ্ন রোমশ বুকে নাক ঘষে মুকুর বলেছিল, 'করতে পারলে তাই হবে। নাও আমার জামা খোল

দেখি। বাপ্‌রে কতদিন পরে তোমাকে পেয়েছি।'

সুনন্দ একটু থেমে মুকুরকে সরিয়ে দিতে দিতে বলে, 'সরি ডার্লিং আজ খুব টায়ার্ড।'

১০

ছন্দা সাহা আর তার স্বামী বসন্ত সাহার সঙ্গে খুব অদ্‌ভুত ভাবে আলাপ হয়েছিল মুকুরদের। ঘটনাটা ছিল, একেবারে নাটকের মতো। মজার ব্যাপার হল, ঘটনাটা ঘটেও নাটক দেখতে গিয়ে। নাটকের ভিতর নাটক হয়। থিয়েটার উইদিন থিয়েটার। এটা শিল্পের একটা ফর্ম। কিন্তু এটা ছিল নাটকের বাইরে নাটক।

দু'বছর বছর আগের ঘটনা।

অকাদেমিতে নাটক দেখতে গিয়েছিল মুকুর আর সুনন্দ। বাদল সরকারের লেখা দুটো নাটক। 'সারারাত্তির' আর 'সলিউশন এক্স'। দলের নাম 'ভাঙা মঞ্চ'। এই গ্‌রুপ থিয়েটার সেই সময় বেশ নাম করেছিল। কাগজের ছোটো বিঞ্জাপন দেখে মুকুর ঠিক করল যাবে। কলেজ জীবনে মুকুর নাটক দেখত। বন্ধুরা ছিল সিনেমার পোকা, মুকুরের নেশা ছিল নাটকে। নাটকের জন্য সঙ্গী পাওয়া যেত কম। তারপরেও এক আধজন জুটে যেত। কোনোদিন অত্রিনা, কোনোদিন আফরিন। কেউ না থাকলে একাই যেত। অকাদেমি, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্রসদন তো ছিলই, গিরিশ, মিনার্ভাতেও যেত। দূরে বলে মধুসূদন মঞ্চে যেতে একটু অসুবিধে হতো। বাড়িতে রাগ করত। তবে মেয়ের নাটক দেখার নেশায় বাবার মদত ছিল। এই নাটক দেখতে গিয়ে টুকটাক অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। যেমন মধুসা আর কিশোর। ওরা পরে বিয়েও করে। এবারের পার্টিতে নেমন্তন্নও পেয়েছে। কলেজ ইউনিভার্সিটি শেষ করবার পর নাটকের নেশা দূর হল মুকুরের। শ্বশুরবাড়ি বাড়ির বউয়ের বাইরে বেরোনো পছন্দ করত না। কতবার যে চাকরি ছাড়তে বলেছে। নাটক দেখা তো দূরের কথা। দমদমে আলাদা ফ্ল্যাটে চলে যাওয়ার পর আবার একটু আধটু হয়েছিল। তবে আর একা যাওয়া পোষায় না। সুনন্দও সময়ও পায় না। তার নিজেরও তো স্কুলের খাতা দেখা, প্রশ্ন করা থাকে।

যাই হোক সেবার বাদল সরকার বলেই ইচ্ছে হল মুকুরের। কলেজের পর বাদল সরকারের নাটক আর দেখা হয়নি। সুনন্দও রাজি হল। তখনও থিয়েটারে অনলাইনে টিকিট সেভাবে চালু হয়নি। হলে গিয়ে

লাইন দিয়ে কাটতে হল। মোটামুটি ভালই জায়গা পেয়েছিল। 'সলিউশন এক্স' নাটকটা তো দারুণ হল। ওরকম মজার নাটক খুব কমই হয়। ইন্টারভ্যালের পর শুরু হল, 'সারারাত্তির'। মুকুর নড়েচড়ে বসল। সিরিয়াস নাটক। নাটকটা দেখেনি আগে। আসবার আগে শ্রাবস্তীকে ফোন করেছিল। সিধু জেঠী। ও খানিকটা বলেছে। সত্যি মেয়েটা এসব জানেও বটে! বলেছিল সারারাত্তির একটা অ্যাবসার্ড নাটক।

'অ্যাবসার্ড নাটক! সে আবার কী?'

শ্রাবস্তী বলেছিল, 'এই ধরনের নাটকের সূত্রপাত প্যারিসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই স্টাইলকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। এখানে চরিত্রগুলো ইচ্ছে করে অবাস্তব, দুর্লভ করে তৈরি করা হয়। দেখতে দেখতে তাদের কখনো মনে হবে চিনি, কখনো মনে হবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তারা যে সংলাপ বলবে বেশিরভাগের কোনো অর্থ নেই। পারস্পরিক মিল নেই। ঘটনায় কার্যকারণ খুঁজে পাবে না, এমনকী শুরু শেষের যেন বালাই নেই। অথচ দেখতে মজা লাগবে। একধরনের সেন্স তোমাকে প্রিক করবে। খোঁচা দেবে। অনেকক্ষণ তুমি ভাববে মুকুরদি। প্রতিটা ভাবনাই হবে আলাদা আলাদা।'

মুকুর বলেছিল, 'বাপ্‌রে এ তো বিরাট ইনটেলেচ্যুয়াল।'

শ্রাবস্তী হেসে বলল, 'বাদল সরকারের সারারাত্তির দেখতে গেলে কিঞ্চিৎ মাথা তো লাগবেই।'

নাটক জমে উঠেছিল। হল চুপ। যাকে বলে, পিন ড্রপ সাইলেন্স। হঠাৎ ঘটল অঘটন। মিনিট কুড়ি পর এক মহিলা সিটে বসে চিৎকার দিয়ে উঠলেন।

'আমার গলার হার...আমার গলার হার কোথায় গেল... কোথায় গেল আমার হার?'

মহিলা চার নম্বর সারিতে বসেছিলেন। তিনি হাত ছুঁড়ে এমন হট্টগোল শুরু করে দিলেন যে নাটক থমকে গেল। মহিলার চিৎকার থামল না।

'হার আমার গলা ছিল...কে নিল? নিল কে?'

হলে ভিড়। বাদল সরকারের লেখা নাটক এতদিন পর মঞ্চে হচ্ছে, ভিড় তো হবেই। অনেকেই মহিলার ওপর রেগে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন।

'চুপ করুন দিদি। আপনার হার গোল্লায় যাক।'

‘বাড়িতে গিয়ে খুঁজবেন।’

‘থানায় যান।’

‘নিজের গলায় ভাল করে দেখুন। পরে নেই তো?’

‘হার পরে থিয়েটার দেখতে এসেছেন কেন? এটা নেমন্তন্ন বাড়ি না থিয়েটার হল?’

খেপে ওঠা মহিলা কোন কথায় কান দিলেন না। তিনি প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলে যেতে লাগলেন, ‘আমার সোনার হার…লাখ টাকার ওপর দাম…।’

পরিচালক স্টেজের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাত তুলে বললেন, ‘দিদি, নাটকটা শেষ হতে দিন। তারপর খুঁজে দেখা যাবে।’

মহিলা চিৎকার করে বললেন, ‘নাটক শেষ হতে দিন মানে! লাখ টাকার হার আপনার শো’য়ের মধ্যে চুরি হয়ে যাবে, আর আপনি বলছেন নাটক শেষ হতে দিন! এতো মনে হচ্ছে, আপনাদের সাপোর্ট রয়েছে…।’

এই কথায় বিরাট হট্টগোল শুরু হল। এবার হলের লোক আলো জ্বালাতে বাধ্য হয়। সবাই মহিলাকে দেখতেও পেল। উনি চেয়ারে বসে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাউমাউ করে কাঁদছেন। পাশে সম্ভবত স্বামী। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

‘তখনই বললাম, এতো দামী জিনিস পরে বাইরে যেও না। একটু আগে বললাম খুলে ব্যাগে পুরে রাখো। রাখলে তো… তারপর কী হল!’

মহিলা মুখ তুলে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘খুলে রাখতে গিয়েও তো…একটু আগেও ছিল। ইন্টারভ্যালের সময়… আমার মনে হয়, গলায় কেউ টান দিয়েছে। সবাইকে সার্চ করতে হবে।’

সবথেকে বিশ্রী অবস্থায় পড়ল মুকুর আর সুনন্দ। তারা ওই মহিলার ঠিক পিছনের সিটে বসেছিল। যেভাবে মহিলা ‘গলায় কেউ টান দিয়েছে’ বলছে, তাতে তো তাদের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়। এ তো আচ্ছা বিপদ! সব মিলিয়ে হলের ভিতর একটা বড় ধরনের কেওস বেঁধে গেল। এমন সময় একেবারে প্রথম সারি বসা একজন লম্বা চওড়া, সুদর্শন পুরুষ উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে স্টেজে উঠে পড়লেন। সেখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে নাটকের পরিচালক এবং বাকিদের সঙ্গে কী যেন কথা বললেন। তারা মাথা

নাড়ল। এবার ভদ্রলোক স্টেজের সামনে এসে উঁচু গলায় বলতে শুরু করলেন। স্টেজের নিচে রাখা ক্যাচারে ধরা পড়ে তার গলা গমগম করে উঠল।

'আপনারা শান্ত হোন। প্লিজ শান্ত হোন, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। আমার নাম বসন্ত সাহা। আমি একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার। গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করি। এই দেখুন আমার আইডেনটিটি কার্ড। আমি হল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি, পুলিশ না আসা পর্যন্ত আপনারা বেরোনার গেটগুলো বন্ধ রাখুন। আমি খবর দিচ্ছি পুলিশ এখুনি চলে আসবে।'

কয়েকজন দর্শক তেড়েফুঁড়ে উঠে বলল, 'আমাদের কি সার্চ করা হবে? এই অপমানের মানে কী!'

বসন্ত সাহা বললেন, 'কী করব বলুন, এত টাকা দামের হার বলে কথা। তবে চিন্তা করবেন কাউকে অপমান করা হবে না।'

একদল বলে উঠল, 'তবে?'

অফিসার ভদ্রলোকের পার্সোনালিটি দেখবার মতো। গোটা হলটা নিমেষে যেন গ্রিপে নিয়ে নিলেন। বসন্ত সাহা বললেন, 'হারটা খুঁজে বের করা হবে। আমিই নিজেই পারতাম, কিন্তু একজন লেডি পুলিশ ছাড়া তো সম্ভব নয়। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী রয়েছেন, কিন্তু তিনি তো পুলিশ নন।'

এবার সেই মহিলা বললেন, 'ততক্ষণে হার পাচার হয়ে যাবে।'

অফিসার ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি শেষ কখন হারটা দেখেছিলেন?'

মহিলা নিজের সিটে বসেই বললেন, 'এই তো বললাম, ইন্টারভ্যালের আগে। হারটা খুললাম, ভাবলাম ব্যাগে রাখি। ও এত বার বলছিল... হারটা আমি খুলে রাখলামও। ইন্টারভ্যালের সময় আবার মনে হল, থাক পরেই থাকি। লোকে দেখুক। নাটক তো শেষ হয়ে যাবে। বেরিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ব। ইস্ কী হবে এবার! আমি ভাবতেও পারিনা এমন ভদ্রলোকের জায়গায়...।'

অফিসার বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি শান্ত হয়ে থাকুন।'

মহিলা এবার তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি শান্ত হয়ে থাকব মানে! আমার হার ছিনতাই হবে আর আমিচুপ করে থাকব? আপনি তো মনে হচ্ছে চোরেদের সমর্থন করছেন!'

বসন্ত সাহা এবার হেসে বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার হার কোথায় রয়েছে আমি জেনে ফেলেছি। মনে হয়, আমার অনুমান ঠিক হবে। একটু অপেক্ষা করুন। একজন লেডি অফিসারকে আসতে দিন।'

হল ভর্তি দর্শক যেন থিয়েটার দেখতে এসে ম্যাজিক দেখছে। লোকটা বলে কী! অতদূর থেকে বলছে হার কোথায় জেনে গেছে!

১১

মহিলা বললেন, 'আপনি জানেন! কোথায় আছে?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'জানি বলছি না, অনুমান করছি।'

এবার আর মুকুর পারল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে বলল, 'কী অনুমান করছেন? আমরা কেউ পিছন থেকে টেনে নিয়েছি?'

পাশে বসা সুনন্দ স্ত্রীর হাত ধরে টান দেয়। মুকুর বসে না। অফিসার ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'আমি সে কথা তো বলিনি। তবে কোনো সম্ভবনাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পুলিশ যখন ডিটেকশনে যাবে তখন সবকটা দিকই বিচার করবে। বাধ্য হয়েই করবে।'

সুনন্দ আর পারে না। এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? থিয়েটার হলে ছিনতাইবাজ ঢুকেছে? ভুলে যাবেন না আমরা বাদল সরকারের নাটক দেখতে এসেছি। বাসে ট্রামে উঠিনি।'

অফিসার ভদ্রলোকে বললেন, 'জানি আপানার নাটক দেখতে এসেছেন। আমিও তো এসেছি। তবে এখানে ক্রাইম হবে না এমনটা ভাবছেন কেন? থিয়েটারে ক্রাইম হতে পারলে হলেও ক্রাইম হতে পারে। থিয়েটার হলে মার্ডারের মত ঘটনাও ঘটেছে। পৃথিবীতে সেরকম উদাহরণও রয়েছে।' একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বলতে থাকেন, 'এখানেও হতে পারে। নাটকের নাম সারারাত্তির। ক্রাইম তো হতে পারে না? তবে সত্যি বলতে কী এটাও একটা প্রশ্ন। নাটকে দেখতে এসে ছিনতাই!'

একজন দর্শক পিছন থেকে চিৎকার করে বলল, 'লেকচার থামান। আপনার লেকচার শুনতে আসিনি।'

হার হারিয়ে ফেলা মহিলার থেকে যারা দূরে বা সামনের সিটে বসেছিলেন তাদের মতো হইচই শুরু হল।

'ভেবেছেনটা কী? আমরা কি ভূত? অন্ধকারে লম্বা হাত বাড়িয়ে গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছি?'

সুনন্দ ফের উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তবে কি আমরা পিছন থেকে হার টেনে নিয়েছি বলছেন?'

সামনে থেকে একজনে বললেন, 'আমরা তো বলিনি। যে বলছে তাকে বলুন। তবে যাদের সাসপেক্ট করবার প্রশ্নই ওঠে না, তাদের এভাবে বেইজ্জতি করবার মানে কী?'

এবার অনেকেই উঠে দাঁড়িয়ে হইচই শুরু করল। নাটকের দলের একজন এসে হাতজোড় করে বলল, 'দয়া করে আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। একজন অনারেবল দর্শক গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তার একটি মূল্যবান অলংকার খোয়া গেছে। এই অবস্থায় আমাদের তো কোনো না কোনো স্টেপ নিতেই হবে। আমরা হল ম্যানেজমেন্টের সঙ্গেও কথা বলেছি। যদি জিনিসটা খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে কোনো আমরা এফোর্ট না নিই, তাহলে আমাদেরও রেসপনসিবিলিটি থেকে যায়। উই আর লাকি এনাফ, আজ আমাদের নাটক দেখতে এসেছেন বসন্ত সাহার মতো একজন বড় পুলিশ অফিসার। তিনি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে রয়েছেন। তিনি যিনি নিজেই এগিয়ে এসেছেন। এই মিস্ট্রি সলভ করতে চান। আপনারা তাকে কো অপারেট করবেন এটাই আশা করি...।'

হার হারানো মহিলা বললেন, 'এসব বাজে কথা রাখুন। হার কোথায় বলুন।'

হৈচৈ আরও বাড়ল। আবার অনেকে চেঁচামেচি শুরু করল। পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে নানা কথা বলতে লাগল।

'আপনি এই ভাবে আমাদের আটকে রাখতে পারেন না। '

'আপনি ভেবেছেনটা কী? এটা একটা থিয়েটার হল। কোনো অন্ধকার গলি নয়।'

'আপনি ভদ্রলোকদের অপমান করছেন।'

'সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া, আপনি কাউকে সার্চ করতে পারবেন না।'

অফিসার হাত দু'হাত তুলে বললেন, 'আপনারা খামোখা উত্তেজিত হচ্ছেন। আমি কি সার্চের কথা বলেছি!

বলেছি পুলিশ আসতে দিন। যেহেতু এখানে অনেক মহিলা রয়েছেন, লেডি পুলিশও প্রয়োজন। এক্ষুনি খবর পেয়েছি ফোর্স এসে গেছে।'

এতে উত্তজনা কমল না বরং বাড়ল। স্টেজে পুলিশ অফিসার, নাটকের দলের লোকজন নিজেদের মধ্যে কিছু একটা আলোচনা করলেন। তারপর অফিসার ভদ্রলোক একটি সামনে এগিয়ে এলেন।

'আপনাদের দাবি অনুযায়ী আমি একবার চেষ্টা করছি। জানি না পারব কিনা। শুধু ওই ভদ্রমহিলার কথা শুনে অনুমানের ওপর ডিটেকশন করতে হচ্ছে। মিলতে নাও পারে। তবে আমি শুধু ম্যাডামকেই বলে দিচ্ছি, হারটা কোথায়? কে নিয়েছে? আপনি কি একবার এখানে আসবেন?'

দর্শকরা হইহই করে উঠল, 'আমরা জানব। আমাদেরও জানাবার অধিকার রয়েছে। আমরা এতক্ষণ হ্যারাসড হয়েছি।'

এত উত্তেজনার মধ্যেও পুলিশ অফিসার হেসে, ঠান্ডা গলায় কথা বলছেন। বোঝা যাচ্ছে তিনি উত্তেজনা কমাতে চাইছেন এবং সময় নিচ্ছেন।

অফিসার বললেন, 'তবে সবটাই অনুমান নয়। অনুমানের একটা ভিত্তিও রয়েছে। আসলে আমার কাছে একটা প্রিসিডেন্স রয়েছে। দু'মাস আগে ঠিক এই ভাবে একটা কানের দুলের কেস সলভ করেছি। ঘটনাটা ঘটেছিল সিনেমাহলে। সেখানও এরকম ভাবে একজন মহিলা...ম্যাডাম আপনি যদি ইচ্ছে করেন, স্টেজ পর্যন্ত আসতে পারেন। আমরা কোনো জোর করব না। শুধু বলব, হলের সব লাইট ভাল করে জ্বালিয়ে দিতে।'

এতক্ষণ পরে মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। নিজের আসন ছেড়ে বেরিয়ে, এগিয়ে এলেন।

বেশি নয়, কয়েক পা হেঁটে যেতেই মহিলা লাফিয়ে উঠলেন।

'এই তো হার। এই তো মাটিতে পড়ল। আমার কোলের ওপর ছিল।'

হল শুদ্ধ সবাই 'রে রে' করে উঠল। সকলেই উঠে দাঁড়াল। হারটা দেখতে চাইছে। মহিলা নিচু হয়ে হার কুড়িয়ে নিলেন। এক হাত জিভ বের করে বললেন,'ছিছি।'

অফিসার ভদ্রলোক স্টেজ থেকে বললেন, 'ম্যাডাম, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এরকম ভুল সকলেরই

হয়। আপনি একবার হারটা যদি তুলে দেখান, সবাই নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

মহিলা মুহূর্তখানেক থমকে দাঁড়িয়ে ফের স্টেজের দিকে হেঁটে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেও পড়লেন ওপরে। হাত জোড় করে বললেন, 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বারবার হারটা খোলা পরা করতে হয়, হুক্ আলগা হয়ে পড়ে যায়। আমার জন্য আপনাদের নাটক দেখায় বিঘ্ন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ মনে আঘাতও পেয়েছেন। আমার গলা থেকে কেউ হার টেনে খুলে নিয়ে গেছে কথাটা বলাটা আমার অন্যায় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

পুলিস অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি দুঃখ প্রকাশ করলেন এটাই যথেষ্ট। অত দামি একটা জিনিস হারিয়ে গেলে কারোর মাথার ঠিক থাকে না। বিশেষ করে মহিলারা যদি গয়নাগাঁটি হারিয়ে ফেলেন...যাক হারটা যে পাওয়া গেছে, এটাই যথেষ্ট। আমরা সবাই খুশি। ফোর্সও পৌছে গেছে, তাদের ফেরত পাঠাই। আসুন সবাই আবার নাটক দেখতে বসে যাই।'

থিয়েটার শেষ হলে একরকম ছুটে গিয়ে বসন্ত সাহাকে ধরেছিল মুকুর আর সুনন্দ। নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলে, 'আপনি আমাদের বিরাট এম্ব্যারাস্মেন্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমরাই সন্দেহের তালিকার প্রথমে ছিলাম। যতই মিথ্যে হোক, খুবই লজ্জার একটা পরিস্থিতি... আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব...।'

বসন্ত সাহার সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছন্দাও ছিলেন। বসন্ত সাহা হেসে বললেন,'খেপেছেন? এখানে সব মানিগন্যিরা আসেন, এখানে কাউকে হ্যারাস করলে চাকরি থাকবে ?'

সুনন্দ বলেন, 'আমরা যদি আপনাদের একটু কফি খাওয়াই আপনারা কি না বলবেন! জানি না বড় পুলিস অফিসাররা অচেনা বা সদ্য পরিচিত কারও কফির নেমন্তন্ন রাখেন কিনা।'

বসন্ত সাহা হেসে বলেছিলেন, 'না রাখি না। কফির নেমন্তন্ন রাখি না, তবে চায়ের নেমন্তন্ন রাখি। চা খাওয়াবেন? সাধারণের নেমন্তন্ন না নিই, প্রাইম সাসপেক্টের নেমন্তন্ন তো নিতেই হবে। চল ছন্দা।'

মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খেতে চারজনে মিলে কথা হল।

বসন্ত সাহা বললেন, 'আসলে কী জানেন, হার ছিনতাইয়ের সম্ভবনাটা আমি প্রথমেই বাদ দিয়ে

দিয়েছিলাম। পিছনে বসে গলা থেকে কেউ হার টেনে নেবে এটা হতে পারে একমাত্র চলন্ত বাসে–ট্রামে। হার ছিনতাই করে কেউ পিছন বসে থাকবে না। এক হতে পারে খুব প্রফেশনাল কেউ। হারটাকে নিয়ে হাতসাফাই করে সিটের নিচে কোথাও যদি লুকিয়ে ফেলে। এর জন্য দুঃসাহস চাই। ধরা পড়বার চান্স একশো ভাগের মধ্যে একশো ভাগ। তার মানে সেই লোককে জানতে হবে, কে হার পরে ঢুকছে, তার পিছনে টিকিট কেটে বসতে হবে, ধরে নিতে তার পাশে বসা কেউ ঘটনা দেখবে না। এটা খুবই কষ্টকল্পিত। আমাদের অপরাধ বিজ্ঞানে বলে ইমপসিবল ক্রাইম। এরপর মহিলা বারবার হার খোলা এবং পরবার কথা বলতে সবটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। নিশ্চয় হুক আলগা হয়ে পড়ছে। কিছুদিন আগে আমার ম্যাডামও এই কীর্তি করেছিলেন। সিনেমা হলে কালের দুল নিয়ে কিছু একটা কেরামতি করতে গিয়ে জিনিসটা ফেলে দিয়েছিলেন। সিনেমা শেষ হলে সিটের কোনায় খুঁজে পাই।'

পাশে দাঁড়ানো ছন্দা সাহা বলে, 'কেরামতি বলছো কেন? কানে বিঁধছিল।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'আহা রাগ করছো কেন। সেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল বলেই তো আজকের অনুমানটা মিলে গেল। তবে লেডি পুলিশ ছাড়া তো ওঁর কাছে পৌঁছোনো যেত না। তাই সময় নিচ্ছিলাম।'

এরপরে খুব দ্রুত মুকুরদের সঙ্গে বসন্ত সাহাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল। সুনন্দ অবশ্য এড়িয়ে চলে। বলে, 'পুলিশের সঙ্গে বেশি গা ঘেঁষাঘেঁষি না থাকাই ভাল।'

১২

সুনন্দ এড়িয়ে চললেও মুকুর ছন্দার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। ছন্দাও রাখে। দুজনে টিচার বলে গল্প করবার কিছু কমন বিষয় থাকে। কলিগরা কে কেমন পড়ায়, কে কেমন ফাঁকি দেয়, স্কুলের ম্যানেজমেন্টকে কীভাবে সামালাতে হয়, সিলেবাসের চাপ —এইসব।

এছাড়া দুজনের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামও রয়েছে। ছন্দা রান্নার রেসিপি বলে, মুকুর গানের ইনফো জানায়। যেমন এই তো সেদিন ইলিশ মাছের বিরিয়ানির একটা অন্যরকম রেসিপি বলল ছন্দা। মুকুর রান্না তেমন জানে না, এটা তো একেবারেই জানত না। ছন্দা টেলিফোনে বলেছে, মুকুর ওর সিক্রেট ডায়েরিতে নোট

রেখেছে।

‘বাসমতী চালটাকে জলে ভিজিয়ে রাখবে। এই ধরো মিনিট আধঘন্টা–পঁয়ত্রিশ মিনিট। কেউ কেউ কুড়ি বাইশ ভিজিয়ে তুলে নেয়, এটা ঠিক করে না। এবার যে ভাতটা করছ তাতে এক চামচ মতো নুন ফেলবে। ছোটো এলাচ ফেলবে চারটে। বেশিও নয়, কমও নয়। ও বলতে ভুলে গিয়েছি, এই মাপটা তোমার আড়াইশো গ্রাম চালের জন্য। এবার পরিমাণ যেমন বাড়বে, সেই মত বাকি সব বাড়াবে। আমি ধরেই নিচ্ছি, তুমি আর সুনন্দ খাচ্ছো। সেরকম ধরেই এগোচ্ছি। মনে রাখবে ভাতের কোয়ালিটি এখানে খুব ইমপর্টান্ট। একটু শক্ত থাকতে থাকতেই জল ঝরিয়ে নেবে। এর মধ্যে দু’টুকরো মাছ ভাপিয়ে রেডি করে রেখেছো। ভাপানোটা যেন হালকা হয়। তারপর...।’

ঠিক তেমন ভাবে গানের তথ্য সাপ্লাই করে মুকুর। ছন্দাদের স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে ছোটো একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছিল ছন্দা। তিনটে গানের তথ্য তাল্লাশ করে দিয়েছিল মুকুর।

‘কোথা বাইরে দূরে যায়রে গানটার স্বরলিপি করেছিলেন অনাদিকুমার দস্তিদার। বয়স পঞ্চাশ বছর হওয়ার একটু আগেই গানটা লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ধর, আটচল্লিশ বা উনপঞ্চাশ হবে। রাজা নাটকের গান। খাম্বাজ রাগে...। পরের গানটা কী যেন বলেছিলে? দাঁড়াও খাতাটা দেখে নিই। হ্যাঁ, এই তো কতবার ভেবেছিনু আপন ভুলিয়া। এই গানের সুরটা ইংরেজি গান ড্রিঙ্ক টু মি ওনলি থেকে ফলো করা। বলা হয় পাশ্চাত্যের ভাঙা সুর।’

ছন্দা বলে, ‘বাবা, তুমি কত জানো !’

মুকুর বলে, ‘খেপেছো। সব সাপ্লায়েড বাই মাই কলিগ। ও আমার গানের সিধু জেঠিমা।’

বসন্ত সাহাও মেয়েটিকে পছন্দ করে। হাসিখুশি। ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কথা বলে না। পুলিশে কাজ করে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সমস্যা। কিছু না কিছু করে দিতে বলে। সে পকেটমারি থেকে দোকানে জিনিস খারাপ দিলেও ফোন করবে। ডাক্তারদের এই সমস্যা। বসন্ত সাহার ডাক্তার বন্ধুরা বলে, ‘তুমি তো তাও চুরি ডাকাতির কমপ্লেন নিয়ে থাকো, আমাদের তো চোঁয়া ঢেঁকুর উঠলেও ফোন করে। মোবাইলে ট্রিটমেন্ট

করতে করতে পাগল হয়ে যাই। বিয়েবাড়িতে গিয়েও রক্ষে নেই। বলে, ডাক্তারবাবু লিভারটা একটু দেখে দিন তো। বোঝো কাণ্ড।' মুকুরের এসব ঝামেলা নেই। বরং একদিন ছন্দা বলল, 'জানো, মুকুরদের স্কুলে বড় চুরি হয়ে গেছে। রাতে জানলা ভেঙে টাকা পয়সা তো নিয়েছেই, দরাকরি কাগজপত্রও গেছে।'

বসন্ত বললেন, 'কই আমাকে তো কিছু বলেনি!'

ছন্দা বলল, 'তোমাকে বলবে? খেপেছো? উলটে আমাকে বলল, দাদাকে এসব বলতে যেও না। ছোটোখাটো ব্যাপারে ওনাকে ব্যস্ত করবার কোনো মানে হয় না।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'বাঃ, খুব কম লোকেই এটা বোঝে।'

বাইরে পার্টি করবার প্রস্তাব শুনে ছন্দা বারণ করল।

'এটা কী বলছো মুকুর! এই পার্টি কখনও বাইরে হতে পারে? অসম্ভব। তোমার ফ্ল্যাটেই হবে।'

মুকুর বলল, 'ছন্দাদি, আমি ভাবছিলাম, ওইটুকু ফ্ল্যাটে অতজনের অসুবিধে হবে না তো?'

ছন্দাদি বলল, 'হলে হবে। তাছাড়া তোমাদের ফ্ল্যাটটা মোটেও ছোটো নয়। আর অতজনই বা কোথায়? তুমিই তো বললে অল্প কয়েকজনকে বলেছো। তোমার স্কুলের কেউ আসছে?'

মুকুর বলল, 'সেটা তো গৃহ প্রবেশ, সরি ফ্ল্যাট প্রবেশের সময় হয়ে গেছে। এটা একেবারেই নিজের মধ্যে। যারা কোনো না কোনো ভাবে কনসার্ন, সেদিন আমাদের উৎসাহ দিয়েছিল, মজা করে খেতে চেয়েছিল... অথবা যারা কখনও আসেনি...সুনন্দর অফিসের দু–একজনকে বলতে হয়েছে।'

ছন্দাদি হেসে বলল, 'আমিই তো খেতে চেয়েছিলাম।'

মুকুর বলল, 'এবারে একেবারে জনা বারো।'

সুনন্দ অবশ্য এতেও আপত্তি করেছিল।

'এই ঝামেলা নিতে পারবে?'

মুকুর বলেছিল, 'ঝামেলার কী আছে? কয়েকজনকে নিয়ে একটু হইচই করা।'

সুনন্দ বলল, 'বাইরে কোথাও করতে পারও তো। কোনো রেস্টুরেন্টে চলে যাব। বাড়িতে ফ্যাচাং থাকবে না।'

মুকুর বলল, 'আমিও সেরকম ভেবেছিলাম। ছন্দাদি আপত্তি করল। বলল, না ফ্ল্যাটেই হবে। মজার কথা কী জানো, ছন্দাদি নিজে রান্নাও করতে চেয়েছিল। অত বড় পুলিশ অফিসারের বউ হলে কী হবে, রান্নায় এক্সপার্ট।'

কথাটা ঠিক। ছন্দা সাহা রান্নায় অতি এক্সপার্ট একজন মহিলা। রোজকার রান্নাও যেমন জানে, শখের রান্নাতে ভাল। বড় গোয়েন্দা অফিসার বসন্ত সাহার স্ত্রীকে বাড়িতে রান্না করতে হয় না। কুক রয়েছে। তারপরেও নিজের চাকরি সামলে রোজ একবার রান্না ঘরে ঢোকা চাই। দুপুরে স্বামীর ঘরে পাতা দই খাওয়া অভ্যেস। সেই দই ছন্দা নিজের হাতে পাতে। তবে স্বামীকে বকাবকি করতেও বাদ রাখে না।

'রোজ রোজ দই খাওয়া কী আছে? আর খেলেও বাড়িতে খাও। অফিসে নিয়ে যাওয়ার কী হয়েছে? এতো বড় অফিসার হয়েছো এখন কি অফিসে গিয়ে রোজ দই খাওয়া সাজে?'

পঁয়তাল্লিশ বছরের বসন্ত সাহা যিনি পুলিশ মহলে বি.সাহা নামে পরিচিত মানুষটি যেমন বুদ্ধিমান তেমন ঠান্ডা মাথার। পেশায় অতি যোগ্য। লম্বা পেটানো চেহারা। সম্প্রতি বিদেশ থেকে বিশেষ একটা ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। কিন্তু মানুষটার চোর-ডাকাত, খুনির বদলে সাহিত্য, শিল্প, গান বাজনায় অনেক বেশি ইন্টারেস্ট। একেকটা সময় একেকটা জিনিস মাথায় চেপে বসে। কিছুদিন আগে রাগ–রাগিণী নিয়ে মেতেছিলেন। কোন রাগে কী এফেক্ট। রাগের শাখা প্রশাখা কেমন থাকে। কানাড়া রাগ নিয়ে তিনি ডায়েরিতে একটা প্রবন্ধ মতো লিখেছিলেন। তবে সেটা স্ত্রীকে ছাড়া কাউকে পড়াননি। এখন আবার মাথায় ঢুকেছে ছবি আঁকা। নিজে আঁকা নয়, ছবি নিয়ে লেখাপড়া। ছবি দেখা, ছবির বিশ্লেষণ, ছবির অর্থ—বোঝবার চেষ্টা। স্ত্রীর দই খোঁচার উত্তরে সেদিন বলেছিলেন, 'কী বলছো ছন্দা! আমাকে দেখে অফিসে কতজন দই খেতে শুরু করেছে জানো? বাড়িতে খাওয়ার সময় কোথায়? লাঞ্চের পর খানিকটা গ্যাপ দিতে হবে তো।'

ছন্দা বলল, 'বাপ্‌রে এমন ভাবে বলছো যেন দই নিয়ে বিরাট বিশেষজ্ঞ।'

বসন্ত সাহা লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সেদিন স্ত্রীর হাতে ধরে টেনে পাশে বসিয়েছিলেন। তারপর জ্বলজ্বলে চোখে বললেন, 'দইয়ের গুণকীর্তন রয়েছে সর্বত্র। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বইতে রয়েছে চাঁপাকলা দধি

সন্দেশ কহিতে না পারি।/ সঘৃত পায়েস নব—মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। আমি দই কেন খাই জানো ছন্দা? বাড়িতে পাতা সাদামাঠা দই খেলে বুদ্ধির গোড়ায় জল দেওয়া হয়। দইতে কী থাকে না? ভিটামিনস্, মিনারেলস্, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট। মস্তিস্কের কোষকে একেবারে সতেজ, টানটান করে দেয়। জটিল ক্রিমিনাল কেসগুলো একেবারে জলের মতো হয়ে যায়।'

ছন্দা উঠে পড়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে এবার থেকে কৌটোর বদলে, অফিসে তোমাকে হাঁড়ি করে দই দেব। তুমি গোটা ফোর্সকে বিলোবে।'

ছন্দাদি ছাড়া আরও কয়েকজন হোটেলে যেতে আপত্তি করেছে। বলেছে, 'এই অকেশনে বাইরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।' পরে মুকুর ভেবে দেখল, এটা ঠিকই বলেছে। এই পার্টি ফ্ল্যাটেই হবে। শুধু খাওয়াদাওয়া নয়, আরও একটা মজা রযেছে। সেই মজাটা একেবারে গোপন। কাউকে বলা হয়নি। শুধু সুনন্দ জানে। তাও জেনেছে মাত্র দুদিন আগে। মুকুরের কাছে শুনে অল্প হেসে বলেছে, 'যতসব ছেলেমানুষি। যাক, তুমি যা ভাল বোঝো করো।'

মুকুর বলেছিল, 'কেন তোমার পছন্দ হয়নি?'

সুনন্দ বলেছিল, 'খুব হয়েছে। নামটা কার দেওয়া? তোমার?'

মুকুর মুচকি হেসে বলল, 'এখন বলব না। সেদিন জানতে পারবে। কারপেন্টারকে বলা আছে। সেদিন সকালে এসে দরজার পাশে লাগিয়ে দেবে।'

সুনন্দ বলল, 'গুড।'

মুকুর এই ফ্ল্যাটের একটা নাম রেখেছে। দ্য ড্রিম। নামটা রেখেছে তার এক বন্ধু। দরজার পাশে নেমপ্লেটটা থাকবে। ফুলের পর্দা থাকবে তার ওপর। মুকুরের সেই বন্ধু পর্দা সরিয়ে নাম উদ্বোধন করবে।

ক্যাটারার, ডেকরেটরের ফোন সেরে ডায়েরি খুলে গেস্টদের লিস্ট বের করল মুকুর। প্রথমেই চোখ পড়ল একেবারে নিচে। তেরো নম্বরে। মুচকি হাসল মুকুর।

১৩

মুকুরের মুচকি হাসবার কারণ আছে।

এই তেরো নম্বর গেস্টই তার এই নতুন ফ্ল্যাটের নামকরণ করেছে। যদিও সে ইংরেজি শব্দ চায়নি। বাংলাই চেয়েছিল। মুকুরই জোর করে ইংরেজি রেখেছে। মুকুর বলেছিল, 'নাম চাই।'

'কার নাম!'

মুকুর বলল, 'আমার ফ্ল্যাটের নাম।'

'ফ্ল্যাটের নাম!'

মুকুর বলল, 'কেন খারাপ হবে? থ্রি বাই টু, ফোর বাই টু তো থাকছেই, কার সঙ্গে একটা নামও থাকুক।'

'গুড আইডিয়া। তা আমাকে কী করতে হবে?'

মুকুর বলল, 'নাম বেছে দিতে হবে।'

'আরে! আমি কী নাম বাছব! আমি কি লেখক? কাঠখোট্টা সাবজেক্টের লোক।'

মুকুর বলল, 'আমি লেখক টেখক চাই না, কোনও ভাবের দরকার নেই, একটা স্ট্রেটকাট নাম চাই।'

তেরো নম্বর গেস্ট দুদিন সময় নিয়ে জানালো।

'স্বপ্ন নাম দিলে কেমন হয়? বাড়ি তো আসলে স্বপ্নই। সবাই একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখে। শুধু কাঠ খড়, সিমেন্ট বালি দিয়ে তৈরি বাড়ি নয়, যারা সঙ্গে থাকে তাদের নিয়েও বাড়ি। যদি কেউ না থাকে তবে নিজেই নিজের সঙ্গী হবে।'

মুকুর টেলিফোনেই লাফ দিয়ে উঠে বলেছিল, 'খুব ভাল হয়। স্বপ্ন। কোনো কায়দা নেই। একেবারে স্ট্রেট। ঠিক যেমনটা আমি চাইছিলাম। তবে বাংলায় নয়, ইংরেজিতে করব। ড্রিম...।'

'ইংরেজি! কেন ইংরেজিতে কেন! স্বপ্ন শব্দটা তো খুব সুন্দর। বাঙালির বাড়ির নাম বাংলায় হবে।'

মুকুর বলেছিল, 'বাড়ি ঠিক নয়, ফ্ল্যাট। আর স্বপ্ন দেখতে সুন্দর, শব্দে সুন্দর কিনা জানি না। হলেও কিছু করবার নেই। এই নামটা ইংরেজি রাখাই ভাল। আসলে আমাদের এই ফ্ল্যাটবাড়িটার নাম তো বাংলায়। কবিতা টাইপ নাম। তরণী। কে নাম দিয়েছিল জানি না। আমরা তো কেনবার সময় থেকেই দেখছি। যে

আসে সেই বলে, তোমাদের এই বাড়িতে নিশ্চয় কবি থাকে? এর ওপর যদি ফ্ল্যাটের নামও স্বপ্ন রাখি তাহলে তো হয়েছে। এত কবিতার ধাক্কা সামলাতে পারব না বাপু।'

'এটা কোনো যুক্তি হল? স্বপ্ন'র মতো শব্দ হয়? পৃথিবীর তিনটে সেরা শব্দের একটা হল বাংলায় স্বপ্ন।'

মুকুর হেসে বলল, 'তাই নাকি!'

'অবশ্যই তাই। স্বপ্ন কথাটা উচ্চারণ করলেও মন ভাল হয়ে যায়।'

মুকুর বলল, 'আর দুটো শব্দ কী?'

'একটা হল অ্যামোর। উচ্চারণের সময় আর সাইলেন্ট। বলতে হবে অ্যামো।'

মুকুর অবাক হয়ে বলেছিল,'অ্যামোর মানে কী?'

'অ্যামো হল ফরাসি শব্দ। মিনস লভ। ভালবাসা।'

মুকুর বলল, 'বাপ্‌রে! আর তিন নম্বর সুন্দর শব্দটা কী শুনি?'

'ওটা ইংরেজি শব্দ। রিভেঞ্জ।'

মুকুর আঁতকে উঠে বলেছিল, 'রিভেঞ্জ! মানে প্রতিশোধ? এটাও সুন্দর শব্দ! প্রতিশোধ কখনও সুন্দর হয়?'

'অবশ্যই সুন্দর হয়। যদি প্রতিশোধ বলে কোনো শব্দ না থাকত, জীবনটাই কমপ্লিট হতো না। প্রতিশোধ সবসময় বাইরের মানুষের ওপর হবে তার তো কোনো মানে নেই, নিজের ওপরও হতে পারে। থাক্ এসব ফিলসফি, তাহলে ফ্ল্যাটের নামে দ্য ড্রিমই থাকুক। ফ্ল্যাটের মালকিন যেমন চাইবেন।'

নেমপ্লেটের ডিজাইন নিজে গিয়ে পছন্দ করে এসেছে মুকুর। পিতলের ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো দিয়ে কারসিভ হরফে লেখা থাকছে।

মুকুর ডায়েরি খুলল। ভাল করে লিস্টে চোখ বোলালো। নাম এবং তার সঙ্গে দু–এক লাইনের নোট রয়েছে। কঙ্কনা বসু আর পলাশ সান্যাল। পাশে নোট লেখা, আসবে তো?

কঙ্কনা পলাশ স্বামী–স্ত্রী। কঙ্কনার বয়স তেত্রিশ, পলাশ ছত্রিশ। আগে যে বাড়িতে একসময় মুকুর সুনন্দ ভাড়া থাকত, তার কটা বাড়ি পরে প্রতিবেশী ছিল। প্রথমে সামান্য আলাপ। তারপর চেনাজানা বাড়ে। কাছাকাছি বয়স হওয়া সত্ত্বেও কঙ্কনা মুকুরকে 'দিদি' ডাকে। পলাশের মুকুরের প্রতি একধরনের মুগ্ধতা

ছিল। মুকুরের নাকি সব ভাল। রূপ, গুণ, লেখাপড়া। কোনো কোনো সময়ে মুকুরের মনে হত, স্বামীর এতো পছন্দের কারণে কঙ্কনা অল্প হলেও তার ওপর জেলাস। মনে মনে চাইত, মুকুর ওই পাড়া ছেড়ে চলে যাক। মাঝেমধ্যে বলত, 'মুকুরদি, আর কতদিন ভাড়া থাকবে? এবার একটা ফ্ল্যাট কিনে নাও।'

মুকুর বলত, 'এখানে কিছু আছে নাকি? কোনো খোঁজ খবর তুমি জানো?'

কঙ্কনা বলত, 'এখানে থাকবে? নানা, এসব কোনো জায়গা নাকি? ঘিঞ্জি, আনপ্ল্যানড। সাউথে কোথাও দেখ।'

পরে মুকুরের মনে হয়েছে, তার এই ধারণা হয়তো ভুলই ছিল। একটু বেশিই ভেবে ফেলেছিল। ঘন ঘন না হলেও এখনও যোগাযোগ রয়েছে। মাঝেমধ্যে দেখাও হয়। টুকটাক ফোন, মেসেজও হয়। সেদিন সাউথসিটি মলে কঙ্কনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'কী গো মুকুরদি ভুলেই গেলে।'

মুকুর বলল, 'ভুললাম কোথায়? এই তো গতমাসে ফোনে কথা হল।'

কঙ্কনা বলল, 'নতুন ফ্ল্যাটে গেলে, ডেকে একদিন খাওয়ালেও না।'

মুকুর একটু লজ্জাই পেয়েছিল। কঙ্কনা মুচকি হেসে বলল, 'আমি আর কে বল, এই যদি পলাশ বলতো তুমি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ডেকে নিতে।'

মুকুর হেসে বলেছিল, 'আচ্ছা তাই করব, পলাশকেই খাওয়াব। তুমি বাদ। খুব তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাট সেলিব্রেশন পার্টি দিচ্ছি।'

কঙ্কনা বলল, 'ভেরি গুড। হেভি সেজেগুজে যাব। মুকুরদি, খবর জানও? পলাশ চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ব্যবসা করছে।'

'তাই নাকি! কীসের ব্যবসা করছে?'

কঙ্কনা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি জানো না?'

মুকুর অবাক গলায় বলল,'আমি কী করে জানব?'

কঙ্কনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে জানায় নি। বিশ্বের সবাইকে ফোন করে বলে, আমি এখন

স্বাধীন। আই অ্যাম ফ্রি।'

মুকুর বলল, 'ভাল তো। তোমার সুনন্দদাও সর্বক্ষণ বলে। চাকরি ছেড়ে দেব। তা পলাশের ব্যবসা কীসের?'

কঙ্কনা মুচকি হেসে বলল,'বিষের।'

মুকুর বলেছিল, 'অ্যাঁ! বিষের! সে আবার কেমন ব্যবসা?'

'আমাকে মারবে বলে এই ব্যবসা নিয়েছে।'

মুকুর বলেছিল, 'তোমাকে মেরে পলাশের লাভ কী?'

কঙ্কনা বলেছিল,'ওমা! লাভ নেই? কী বলছো মুকুরদি! আমি মরলেই তো সবথেকে লাভ। নিজের পছন্দ মতো কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে। ওর কাছে দুনিয়ার সবথেকে খারাপ মেয়ে তো আমি। থাক, ওসব কথা। কেমিক্যাল সাপ্লাইয়ের বিজনেস করছে ও। ইনড্রাস্টিয়াল কেমিকালস্। এক বন্ধু পার্টনার।'

মুকুর বলল, 'খুব ভাল। বিষ লাগলে তোমার বরকে ফোন করব।'

মুকুর রিমাইন্ডার দেওয়ার জন্য মোবাইলের নম্বর টিপল। ফোন বেজে গেল। একবার, দু'বার, তিনবার। নো রিপ্লাই। মুকুর ভুরু কুঁচকে মেসেজ টাইপ করল—কাল সন্ধেবেলা আসছো কিন্তু।

এরপর উজ্জ্বল-নয়নিকা

স্কুলের বন্ধু উজ্জ্বল। এক ক্লাসে পড়ত। বলেছিল, 'বাড়ি করলে দেখাবি, গাড়ি কিনলে চড়াবি।' মাঝখানে হারিয়ে গেল। বহু বছর পর ফেসবুকে দেখা। আবার চেনাজানা হয়েছে।

এই ছেলে একসময়ে মুকুরের জীবনে 'সামথিং স্পেশাল' ছিল। তখন কোন ক্লাসে পড়ছে দুজনে? টুয়েলভের শেষের দিক। কোএডুকেশন স্কুলে পড়লে যেমন ছেলেমেয়েদের মন খোলামেলা হয়, তেমন টপাটপ্ প্রেমও হয়। কিশোর প্রেম। ইনফ্যাচুয়েশন, ক্রাশ। বেশিরভাগ সময়েই এই প্রেম টেঁকে না। বয়সের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। ব্যতিক্রম নেই এমন নয়, তবে তা একেবারেই হাতে গোনা। মুকুরেরও ক্রাশ হয়েছিল। একটু বেশিই হয়েছিল। উজ্জ্বল লেখাপড়ায় খুবই ভাল। তার থেকে বড় কথা, ছেলেটা ছবি আঁকত বড় চমৎকার। স্কুলে ছবি এঁকে নাম করে ফেলল। লেখাপড়ার থেকেও বেশি নাম। টিচাররা খুব হই হই করত। মুখের স্কেচ করতে পারত। কটা লাইনে ফটাফট্ একজনকে মোটামুটি চিনিয়ে দিত। মুখের

বিশেষত্বটা দেখতে পেতে। কতজনের যে মুখ আঁকত। বন্ধুরা ছিলই, চিচার, পিওন, গার্ড তারাও বাদ যেতেন না। অনেকে আবার নিজে থেকে বলত। মুকুরের ছবি এঁকেছিল। কপালে এসে পড়া কটা চুল, বাঁ গালে ব্রন। মুকুর রেগে গিয়ে বলেছিল, 'ব্রনটা আঁকলি কেন?'

উজ্জ্বল বলল, 'আছে বলে।'

মুকুর চোখ পাকিয়ে বলল, 'দুদিন পরেই তো চলে যাবে।'

উজ্জ্বল বলল, 'দুদিন পরে তো ছবিটাও চলে যাবে।'

মুকুর বলল, 'এখনই চলে যাবে।'

বলে ফস্‌ফস্‌ করে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলেছিল।

এর কদিন পরে ফিজিক্স ক্লাস শেষে একটা পাকানো কাগজ এনে মুকুরের হাতে ধরিয়ে দিযেছিল উজ্জ্বল।

মুকুর রাগ রগা বলল, 'কী এটা? আবার ছবি? বলেছি তো তুই আমার ছবি আঁকবি না। বলিনি?'

উজ্জ্বল গম্ভীর মুখে বলল, 'পরে খুলে দেখিস। তবে সবার সামনে নয়, একা খুলবি।'

মুকুর ক্লাসের কোণে বসে সেই কাগজ খুলল। বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠল।

একটা পেনসিল ড্রইং।

এক কিশোর সামান্য ঝুঁকে পড়ে একটি কিশোরীর গালে চুমু খাচ্ছে। দুজনেরই চোখ বোঁজা। কিশোরীর গালে ব্রন। চুলের কটা গোছা এসে পড়েছে কপালের ওপর। আর কিশোরটি চুল এলোমেলো। কেয়ারলেস ভাব, ওই বয়েসে যেমন হয়। মাত্র কয়েকটা টানে উজ্জ্বল নিজেকে খারাপ আঁকেনি। একবার দেখেই চেনা যাচ্ছে। বিশেষ করে কপালের কাটা দাগটা। ছেলেটার এটাই গুণ। কারও মুখের স্কেচ কররার সময় তার কোনো বিশেষত্বের ওপর নজর রাখে। নিজের কপালের দাগটাকেও ছাড়েনি।

সেদিন তাড়াতাড়ি ছবিটা গুটিয়ে ফেলেছিল মুকুর। বুক ধুকপুকানি সামলানোর পর রাগে, লজ্জায় কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। বলা নেই কওয়া, নেই একেবারে চুমু! এই ছেলের প্রতি তার দুর্বলতা আছে বলে এতো দূর কল্পনা করে ফেলল! সে মনে মনে ঠিক করল, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। উজ্জ্বলকে চেপে

ধরল স্কুল ছুটির পর। নিচু গলায় বলে, 'তোর তো সাহস খুব। কালই আমি প্রিন্সিপালকে বলে দেব।'

উজ্জ্বল নির্বিকার ভাবে বলেছিল, 'বলিস।'

মুকুর চাপা গলায় বলে, 'ভাবছিস ছাড় পেয়ে যাবি?'

'একেবারেই ভাবছি না। আমার ছবি সবাই চেনে। ছবি দেখে দুজনকে চিনতে পারবে। ছবির নিচে তো সই করেছি। সুতরাং পালিয়ে যাব কী করে?'

মুকুর দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'স্কুল থেকে যখন তাড়িয়ে দেবে, সই করা বেরিয়ে যাবে।'

উজ্জ্বল যেন মজা পায়। মুচকি হেসে বলল, 'তাড়ানোর আগে নিজেই ছেড়ে যাব। তুই যদি বলিস, কাল থেকে আর স্কুলে আসবি না উজ্জ্বল, তাই হবে। আগে বল এবারের ছবিটা তোর পছন্দ হয়েছে? নাকি এটাও ছিঁড়ে ফেলেছিস?'

মুকর জবাব দেয় না। মনে মনে ঠিক করে, প্রিন্সিপালকে কমপ্লেন না করলেও একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতেই হবে। উজ্বল ভেবেছেটা কী? সে গটগটিয়ে চলে যায়। বাড়ি ফেরবার পরই ঘটনা গোলমেলে হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসে, লুকিয়ে ছবিটা বের করে মুকুর। উজ্জ্বলের মাথা নামিয়ে চুমু খাওয়ায় দৃশ্যটা দেখে এবার আর রাগ নয়, মাথা টলমল করে ওঠে। শিরশির করে ওঠে শরীর। ধুকপুকানির বদলে বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে। একেই কি উথালপাথাল বলে? উজ্বলকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! ছেলেটাকে এতো সুন্দর! কই আগে তো এভাবে নজর পড়েনি। নিজের অজান্তে গালে হাত দেয় মুকুর। নিজেকে স্পর্শ করে ? নাকি উজ্জ্বলের ঠোঁট? কেমন গরম! তার কি জ্বর এলো? তাড়াতাড়ি ছবিটা ভাঁজ করে ফিজিক্স বইয়ের ভিতর লুকিয়ে ফেলে মুকুর। নিজেকে সামলায়।

পরপর তিনদিন স্কুলে আসে না উজ্বল। ছটফট করে মুকুর। 'পাজি'টা আসছে না কেন? শরীর খারাপ? মন? নাকি ভয় পেয়ে সত্যি সত্যি স্কুল ছেড়ে দিল? বন্ধুদের জিগ্যেস করতেও কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। এরা সবসময় সন্দেহ করবার জন্য বসে আছে। বয়সটাই এরকম। এর ওর পিছনে লাগাবার বয়স।

পাঁচদিনের মাথায় এক বিকেলে উজ্জ্বলের বাড়ি গিয়ে হাজির হল মুকুর। উজ্জ্বলের কিছুই হয়নি। সে নিজের ঘরে বসে দিব্যি পা নাচিয়ে নাচিয়ে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস করছে। বাড়িতে কেউ নেই।

‘কী হয়েছে? অ্যাবসেন্ট করছিস কেন?’

উজ্জ্বল হেসে বলল, ‘তোকে চুমু খাওয়ার অপরাধে শুনে স্কুল ছেড়ে দিচ্ছি।’

মুকুর অবাক হয়ে বলল, ‘মানে!’

উজ্জ্বল বলল, ‘চুমু খাওয়ার পানিশমেন্ট। নিজেই নিজেকে শাস্তি দিলাম।’

মুকুর চিন্তিত হয়ে বলল, ‘বাজে কথা ছাড়। কী হয়েছে বল।’

উজ্জ্বল বলল, ‘বাবার ট্রান্সফার হয়েছে। হায়দরাবাদ চলে যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হব। মাঝপথে স্কুল বদলে ঝামেলা আছে। কিন্তু যেতে হবে। ওখানে একটা বড় স্কুলের সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে। বাবার অফিস থেকেই ব্যবস্থা করেছে। শুধু একটা এক্সাম দিতে হবে। অঙ্কের এক্সাম। ভাল করলে নিয়ে নেবে বলেছে। ভাল তো করবই। তাই বাড়িতে বসে প্রিপারেশন নিচ্ছি। বাবা–মা, দিদি সবাই বেরিয়েছে মার্কেটিং করতে। জায়গা ছাড়তেও তো অনেক আয়োজন লাগে।’

মুকুর ধপাস্ করে উজ্জ্বলের পাশের চেয়ারে বসে বসল। তার ভিতরটা কেমন ফাঁকা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সামনে পিছনে কিছু নেই। উজ্জ্বল হাত বাড়িয়ে তার ডান হাতটা ধরে হেসে বলল, ‘ভালই তো হল। তোর ছবি নিয়ে আর জ্বালাতন করবার কেউ থাকবে না।’

মুকুর কাঁপা গলায় বলল, ‘আমার কী হবে?’

উজ্জ্বল ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, ‘খুব ভাল হবে। তুই লেখাপড়ায় ভাল। এডুকেশন শেষ করে চাকরি করবি। বাড়ি, গাড়ি করবি। ভাল বিয়ে হবে। অ্যাই বাড়ি করলে দেখাবি, গাড়ি কিনলে চড়াবি কিন্তু। এই বলে রাখলাম। ফাঁকি দিবি না।’

মুকুর ছলছল চোখে বলল, ‘চুপ কর, একদম চুপ। কিচ্ছু করব না। স্বার্থপর ছেলে একটা। বাজে ছেলে।’

উজ্জ্বল ঝুঁকে পড়ে তার ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বলল, ‘তোকে খুব সুন্দর লাগছে। ইচ্ছে করছে, একটা চুমু খাই।’

মুকুর আর পারল না। চোখ দিয়ে কয়েকটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। সেই বয়েসের ক্রাশ যা করতে পারে। সে মুখ নামাল।

উজ্জ্বল বলল, ‘নারে, চুমু খাব না। সত্যি চুমু খেলে, ছবির চুমুটা নষ্ট হয়ে যাবে। সত্যি চুমুর রেশে কতক্ষণ আর থাকবে? ছবির চুমু অনেকদিন থেকে যাবে। আমি একজম আর্টিস্ট না? আমরা ছবির চুমুটাই ঠিক।’

মুকুর আর নিজেকে সামলাতে পারে না। সে উজ্জ্বলকে জড়িয়ে ধরে।

বহু বছর কেটে গেছে। উজ্জ্বল হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় মুকুরও। সেই কৈশোরের ইমোশনকে খোলসের মতো সরিয়ে যে যার মতো জীবন তৈরি করে। তারপরেও আবার দেখা হয়। নাটকের মতো নয়, দেখা হয় স্বাভাবিক ভাবে, ফেসবুকে। এখন যেমন অজস্র হয়।। ততক্ষণে উজ্বল নয়নিকাকে বিয়ে করছে। বিদেশ, প্রবাস কাটিয়ে কলকাতায় এসেছে। মুকুরও সুনন্দর সঙ্গে জীবন সাজিয়ে নিয়েছে। পুরোনো মানুষ ফিরে আসে, পুরোনো ভালবাসার কথা ফিরে আসে, কিন্তু পুরোন প্রেম ফিরে আসে না। সে ফেলে আসা পথে পড়েই থাকে। দুজনেই চায়, কেউ একজন কুড়িয়ে নিক। তা আর হয়ে ওঠে না কারোরই। মনে পড়ে যায় মাত্র। সেই মনে পড়াকে কেউ ফেলে আসা প্রেম বলে ভুল করে। মুকুর সেই ভুল করেনি। নতুন করে যোগাযোগ হওয়ার পর সে উজ্বলের সঙ্গে নতুন করেই মিশেছে। ফোনে কথা বলে, দু’বার দেখাও করেছে। উজ্জ্বল মাঝমধ্যে মজা বলবার চেষ্টা করে।

‘হ্যাঁ রে প্রেম কি ফিরে এলো?’

মুকুর ভুরু কুঁচকে বলে, ‘ফিরে এলে কী করবি?’

উজ্জ্বল বলে, ‘ভেবে দেখব।’

মুকুর বলে, ‘কী ভেবে দেখবি?’

উজ্জ্বল বলে লম্বা করে শ্বাস টেনে বলে, ‘কীভাবে তোর বরকে স্যুইক্...’

ডান হাত দিয়ে তালু দিয়ে গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করে।

মুকুর হেসে বলে, ‘সুনন্দর গলা কেটে দিবি?’

উজ্জ্বল মুখটা দুঃখী দুঃখী করে বলে, ‘নারে পারব না। ছুরি দিয়ে মারতে পারব না, তবে খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে পারি।’

মুকুর বলে, ‘তারপর?’

উজ্জ্বল বলে, ‘তারপর আর কী তোকে ঘোড়ার পিঠে ছড়িয়ে ছুট লাগব।’

‘বাপ্‌রে এখনও এতো প্রেম!’

উজ্জ্বল একটু চুপ করে থেকে বলে, ‘ধ্যুস্‌... মজা করছিলাম।’

সেই উজ্জ্বলকে পার্টিতে ডাকতে হয়েছে। নয়নিকাও আসবে। মুকুর উজ্জ্বলকে ফোনে ধরল।

‘ইয়েস মাই ফার্স্ট লাভ।’

মুকুর হেসে ফেলে বলল, ‘ওহে মাই লাস্ট লাভ, কালকের কথা মনে আছে তো? নয়নিকাকে আসতে হবে কিন্তু?’

উজ্জ্বল বলল, ‘মনে আছে মানে! হাজারবার মনে আছে আমাদের ড্রেস রিহার্সাল পর্যন্ত হয়ে গেছে। নয়নিকা নতুন লেহেঙ্গা চোলি কিনেছে। শালা তোর জন্য ফতুর হয়ে যাব মুকুর। নতুন করে পরিচয় হয়ে খরচটা বাড়ছে।’

মুকুর বলে, ‘আমার জন্য কী গিফট আনছিস?’

উজ্জ্বল হাসতে হাসতে বলে, ‘তোর জন্য গোলাপ ফুলের তোড়া, আর তোর বরের জন্য বিষ। আমার রাজকন্‌্যাকে কেড়ে নেবার প্রতিশোধ নেব কাল।’

———

উজ্জ্বলের কথায় মনে মনে খানিকটা হাসল মুকুর। তবে তার সিক্রেট ডায়েরিতে নোটও রাখল। নোটটা একটু বড় হল। চার লাইনের-

‘উজ্জ্বলের পাগলামি এখনও গেল না। এত বছর কেটে গেল তারপরেও পুরোনো কথা ভুলতে পারে না। নাকি মজা করে? এরপর ওকে সাবধান করতে হবে। মজা বাড়াতে গিয়ে যেন হাত ফসকে বেরিয়ে না যায়। নয়নিকা এসব জানলেই বা কী ভাববে? তবে আমিও কি পুরোনো দিন ভুলতে পারিনি?’

শুধু উজ্জ্বলের নয়, মুকুর নোট রাখল কঙ্কনাকে নিয়েও।

‘ফোন নো রিপ্লাই বলছে। আর একবার কল করতে হবে। কে জানে বাবা, ওরা আসবে তো? কঙ্কনার মাথা থেকে বরের ওপর সন্দেহ কি গেছে? নাকি এখনও ধারণা বিষ খাইয়ে ওকে মারবে? পলাশকেও একটা

মেসেজ দিয়ে রাখতে হবে।'

এবার প্রতীকের নম্বর টিপল মুকুর। একটু আগে ক্যাটারিং –এর অফিসে ফোন করা হলেও, মালিককে করা হয়নি। মন্দার আর তার বর প্রতীক সুনন্দর গেস্ট। প্রতীক সুনন্দর এক সময়ের পাড়ার বন্ধু। ঠিক 'বন্ধু' না বলে পরিচিত বলাই ভাল। লেখাপড়া বিশেষ করেনি। বাবার ক্যাটারিং–এর বিজনেসে ঢুকে পড়ে। লেখাপড়ায় চোস্ত না হলেও বিজনেসটা ভালই করে। নামও হয়েছে। কাজ করতে করতেই সুনন্দর সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরিচয়ের সূত্রেই কাজ চায়। সুনন্দ অফিসের কিছু কাজ দিয়েছিল। প্রতীক ভাল করেছে। খাবার–দাবার, সার্ভিসিংয়ের প্রশংসা হয়েছে। বাড়ির এই কাজটা সুনন্দই ওকে দিতে চেয়েছিল।

মুকুর বলেছিল, 'ভাল তো হয়। চেনা লোক হলে কাজ ভাল হবে।'

সুনন্দ বলল, 'তা হবে। তবে একটা কথা, আমার বাড়ির ফাংশন তো ওকে কিন্তু নেমন্তন্ন করো। অনেকদিন থেকে চিনি। ছোটোবেলায় ওর বাড়িতে খাওয়া দাওয়াও করতাম। শুধু সার্ভিস নিতে ডাকলে খারাপ ভাবতে পারে। প্রতীকের সঙ্গে ওর স্ত্রী মন্দারকেও বলবে।'

মুকুর অবাক হয়ে বলেছিল, 'তুমি ওর স্ত্রীকেও চেন!'

সুনন্দ বলেছিল, 'চিনব না? বাপ্‌রে ওই ছেলে বিয়ে নিয়ে যা কাণ্ড করেছিল। পাড়ায় একেবারে তুলকালাম হয়ে গিয়েছিল।'

মুকুর বলেছিল, 'বিয়ে নিয়ে কাণ্ড! সে আবার কী?'

সুনন্দ বলেছিল,'আরে বাবা, ওর বউ মন্দার আমাদের পাড়ারই মেয়ে। স্কুলে পড়তে পড়তে প্রতীকের সঙ্গে পালালো। হুলুস্‌থূলু ব্যাপার। তখন প্রতীক আবার সঙ্গে পড়ছে। মন্দারের বাবা ছিলেন ডাকসাইটে লোক। পুলিশে চেনাজানা ছিল। সোজা কমপ্লেইন। ওই যে বলি না, পুলিশ থেকে যতদূরে থাকা যায়? সাধে কি আর বলি? পুলিশ তো প্রতীকের বন্ধুদের ধরে টানাটানি শুরু করল।'

মুকুর নাক মুখ সিঁটকে বলল, 'এমা! স্কুলে পড়া মেয়েকে নিয়ে পালালো!'

সুনন্দ বলল, 'আরে বাবা, ছেলেবেলার প্রেমে এসব ভুল হয়। তখন আর কি কেউ ভেবেচিন্তে কিছু করে? যা করে সবটাই ভুল হয়ে যায়। যাই হোক সেসব অনেক কষ্টে সামলানো হল। মেয়েকে ফেরত আনিয়ে

মামাবাড়িতে পাঠানো হল। তারও অনেক পরে ওদের বিয়ে। আমরা গিয়ে খেলাম।'

মুকুর বলেছিল, 'বাবা এতো ঘটনা! কই আগে তো বলোনি।'

সুনন্দ বলেছিল, 'তোমাকে কি আমারক সব বন্ধুর কথা বলেছি? তুমি বলেছো? এখন প্রসঙ্গ উঠল তাই বলছি।'

কথাটা হালকা খোঁচা থাকলেও এড়িয়ে গিয়েছিল মুকুর। ভুরু কুঁচকে বলল,'ওরা আমাদের এই পার্টিতে ফিট করবে তো? ওদের অসুবিধে হবে না?'

এই প্রশ্নে সুনন্দ বিরক্ত হল। বলল, 'অসুবিধে হলে আসবে না। তবে আমাদের বলাটা উচিত। পরে ভাববে সুনন্দর নতুন ফ্ল্যাটের খাওয়া, অথচ আমাকে একবার বলল না। আমার মনে হয় না আসবে।'

সেই মতো প্রতীককেও আসতে বলেছে মুকুর। স্ত্রী মন্দারকে নিয়েই আসতে বলেছে। প্রতীক বলেছিল,'চেষ্টা করব ম্যাডাম। খুব চেষ্টা করব।' এক সময়ের কাছের বন্ধুর স্ত্রীকে 'ম্যাডাম' ডাকবার কারণ কী মুকুর ঠিক বলতে পারবে না, তবে এই নিয়ে সে আপত্তি কিছু করেনি। বলছে বলুক। কথা বলবার সময়েও ছেলেটা খানিকটা জড়োসড়ো হয়ে থাকে। সম্পর্ক তো খুব লম্বা দিনের কিছু নয়। সুনন্দ চাইছে বলেই কথা বলা। ম্যাডাম ডাকুক আর যাই ডাকুক। তবে একদিক থেকে ভালই হল, খাবারের বিষয় কিছু নির্দেশ দেওয়ার আছে।

প্রথমবার রিং হতেই ফোন ধরল প্রতীক।

'সব রেডি তো?'

'নিশ্চয়। চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। বারোজনের কাজ আমাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়।'

'তা জানি, আপনারা অনেক বড় বড় অকেশন সামলান প্রতীকবাবু, কিন্তু আমার এই অল্প গেস্টরাই খুব স্পেশাল।'

'কোনো চিন্তা নেই। প্রতীকের বাড়ির কাজ বলে কথা। কোয়ালিটি নিয়ে নো কম্প্রোমাইজ। কিচ্ছু ভাববেন না ম্যাডাম। তাছাড়া আপনাদের অকেশনটাও তো একেবারে স্পেশাল। আমি গৃহপ্রবেশের কাজ অনেক করেছি, ফ্ল্যাটের হ্যাপি বার্থ ডে কখনও করিনি।'

মুকুর সামান্য হেসে বলল, 'ভালই বলেছেন, ফ্ল্যাটের হ্যাপি বার্থ ডে। আচ্ছা, ফ্রিশ ফ্রাইগুলো কিন্তু আটটার মধ্যে সার্ভ করতে হবে। ড্রিঙ্কসের সঙ্গে।'

প্রতীক বলল, 'শুধু ফ্রাই কেন, পকোড়া, কাবাব, বেকড্ পনির সবই ড্রিঙ্কসের সঙ্গে থাকবে।'

মুকুর বলল, 'তাই ফ্রাইটা দেখবেন যেন ঠিকমতো হয়।'

প্রতীক বলল, 'হবে ম্যাডাম। লোকজন জিনিসপত্র নিয়ে ঠিক সময়ে চলে যাবে।'

মুকুর বলল, 'থ্যাঙ্কু। আপনি দায়িত্ব নেওয়ায় অনেকটা ভরসা। তবে শুধু আপনার স্টাফেরা এলেই হবে, আপনি এবং মন্দারও কিন্তু আসছেন। নইলে আপনার বন্ধু খুব রাগারাগি করবে। ইন ফ্যাক্ট, এই ফোনটা আমি সেই জন্য করেছি। আপনাদের রিমাইন্ডার দিতে।'

প্রতীক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'চেষ্টা করব ম্যাডাম।'

মুকুর বলল, 'চেষ্টা নয়, আসতে হবেই।'

প্রতীক আবার একটু চুপ করে থেকে বলল,'আচ্ছা।'

ফোন ছেড়ে মুকুর তার নোটখাতায় লিখল— 'প্রতীকের গলার স্বর আজ কেমন থমথমে লাগল। তবে কথা শুনে বুঝতে পারছি, ক্যাটারিং এর ব্যাপারে কনফিডেন্ট। যাক, আমার সেটা হলেই চলবে। গলা থমথমে না গমগমে ভেবে আমার কী?'

পরের ফোনের জন্য তৈরি হতেই মুকুরের মোবাইল বেজে উঠল। প্রতীকের নম্বর। কী হল আবার?

'কী হয়েছে? কোনো সমস্যা?'

ওপাশে প্রতীক আগের থেকেও বেশি থমথমে গলায় বলল, 'একটু সমস্যা হয়েছে।'

মুকুর একটু ভয় পেয়েই বলল, 'কী সমস্যা ?'

প্রতীক আমতা আমতা করে বলল, 'কাল আপনার কাজটা যদি অন্য কেটারার করে দেয়, কোনো অসুবিধে...'

মুকুর প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বলে, 'কী বলছেন! আর মাত্র কয়েকঘন্টা বাকি...এই তো বললেন, কোনো চিন্তা না করতে...বললেন সুনন্দর বাড়ির অকেশন... বললেন না? দু'মিনিটও হয়নি।'

প্রতীক কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'বলেছি, কিন্তু...।'

'কিন্তু কী?'

প্রতীক বলল, 'বলেছি। আসলে খানিক আগে একটা বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে সুনন্দর...আপনার ফোনটা ছাড়বার পর ও আবার ফোন করে... করে বলে...।'

মুকুর অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে? বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া? ও তো আপনাকে খুবই পছন্দ করে।'

প্রতীক বলল, 'ঠিক ঝগড়া নয়...কিন্তু সুনন্দ যেভাবে রিঅ্যাক্ট করল।'

মুকুর বলল, 'আমাকে বলুন কী হয়েছে।'

প্রতীক একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আপনি কি আমাকে দিয়ে কাজটা করাতে চাইছেন?'

মুকুর উত্তেজিত গলায় বলল, 'চাইছি মানে! অবশ্যই চাই। আপনি কী বলেছেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

যেমন দুম্ করে ফোন করেছিল, তেমন দুম করেই ফোন রেখে দিল প্রতীক। মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে মুকুর ফোন তুলে সুনন্দকে।

সুনন্দ ফোন তুলে বিরক্ত গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

মুকুর বলল, 'আমিই তো জানতে চাইছি কী হয়েছে? প্রতীকের সঙ্গে কী হয়েছে তোমার? ও কাল কাজ করতে চাইছে না কেন?'

সুনন্দ একটু থমকে গিয়ে বলল, 'ও আমার কাছ থেকে টাকা ধার চাইছে। বিজনেসে ইনভেস্ট করবে।'

মুকুর বলল, 'এখন! কত অ্যামাউন্ট?'

'বড় অ্যামাউন্ট।'

মুকুর বলল, 'তুমি দিচ্ছো?'

সুনন্দ বলল, 'পাগল হয়েছো। অত টাকা কোথা থেকে দেব? আর কেনই বা দেব? আমি ফোন করে বললাম, দেখিস টাকা দিচ্ছি না বলে, খাবারে বিষ টিষ মিশিয়ে দিস না যেন। ইট ওয়াজে আ জোক। ওর মনে হয়, কথাটা লেগে গেছে।'

মুকুর বলল, ‘ছিছি। বিষ নিয়ে এরকম একটা ঠাট্টা কেউ করে? ছিছি। এটা ওর প্রফেশন। খাবারে বিষ মেশাবে কথাটা ওর কতটা খারাপ লাগতে পারে একবার ভাবলে না?’

সুনন্দ একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘দাঁড়াও আমি ফোন করে ম্যানেজ করছি।’

মুকুর বলল, ‘প্লিজ, তোমাকে কিছু করত হবে না। যা বলবার আমি বলেছি। ইস্, কাল নিশ্চয় ওরা আসবে না। বিষ দেবার কথা বললে কেউ নেমন্তন্ন অ্যাটেন্ড করতে আসে?’

১৬

পাহাড়ি এক ঝোরার নিচে চব্বিশ–পঁচিশ বছরের এক সুন্দরী।

সে কি স্নান করছে? বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, স্নান করছে না, ভিজছে। ভিজছে এবং হাসছে। বোঝাই যাচ্ছে, এই কনকনে পাহাড়ি ঠাণ্ডায় ভিজে সে খুবই আনন্দ পাচ্ছে। মেয়েটির চোখ মুখ তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। মানুষের সৌন্দর্য বুঝতে সবসময় তার চোখ মুখ দেখতে হয় না। এই কন্যাকে দেখে কেউ যদি ভাবে, পাহাড়ি ঝোরা এবং মেয়েটি বন্ধু। এখন তারা কোনো বিষয় নিয়ে একই সঙ্গে হাসাহাসি করছে।

মেয়েটি পরে আছে নীল জিনস, সাদা শার্ট। সে একটা পাথর থেকে আরেকটা পাথরে নাচে ভঙ্গিতে লাফাচ্ছেও।

পাহাড়ি পথের বাঁকে, ঘন সবুজ গাছের আড়ালে কোনো উচ্ছ্বল তরুণীর স্নান দৃশ্য অবশ্যই আকর্ষণীয়। আর স্নান যদি জিনস্ এবং শার্ট পরা অবস্থায় হয় তাহলে তো অতি আকর্ষণীয়। সেই সঙ্গে মজারও বটে। এই মজার দৃশ্য প্রথম চোখে পড়েছিল মুকুরের। পাশে ছিল সুনন্দ। ওরা ওই মেয়ের থেকে বেশ খানিকটা ওপরে। অন্তত ফুট তিরিশ তো বটেই। ঝোরাটা সেখান থেকে খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই মাথায়। তার মানে মেয়েটা হয় নিচ থেকে উঠেছে, নয়তো এখান থেকে পাহাড় বেয়ে নিচে নেমেছে। মুকুররা অবশ্য গাড়ি রেখে দুজনে বেশ হেঁটে ওপরে উঠেছে। ঝোরা দেখতেই এসেছে। ঝোরায় জল যে অনেক, এমন নয়। তারপরেও পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে, নিচে লাফিয়ে পড়ছে। ওপর থেকে ছবির মতো লাগছে। নিশ্চয়

বর্ষায় জল বাড়ে। গাছপালা, কুয়াশা আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আসায় রহস্যময় লাগছে। একধরনের আদিম সৌন্দর্য। বসবার জায়গা টায়গা এখানে কিছু নেই। বসতে হলে পাথরে বসতে হবে। এটা কোনোও ট্যুরিস্ট স্পট নয়। লোকজন খুব একটা আসে না। ড্রাইভারের কাছে শুনে গাড়ি নিয়ে উঠে এসেছে।

'ওখানে কী আছে?'

'কিছু নেই মেমসাব।'

সুনন্দ বলেছিল, 'কিছু নেই তো যাব কেন?'

ড্রাইভার বলেছিল, 'আমি তো যেতে বলিনি সাব। মেমসাব জানতে চাইলেন তো বললাম।'

মুকুর বলল, 'এই যে বললে, একটা ঝোরা রয়েছে।'

ড্রাইভার বলল, 'পাহাড়ি জায়গায় অমন ঝোরা অনেক থাকে।'

মুকুর বলল, 'এই ঝোরার নাম কী?'

ড্রাইভার বলল, 'এই ঝোরার নাম কোনো নেই। কেউ ওখানে যায় না, তাই ঝোরার নামও লাগে না।'

সুনন্দ মুখ ভেটকে বলল, 'ভালই হয়েছে। অত ওপরে আর যেতে হবে না। এই জায়গাটাতেই তো কিছু নেই। ফালতু আসা হল। তিনটে দিন গচ্চা গেল।'

মুকুর এই কথায় গা করেনি। এবার শুরু থেকেই সুনন্দ আসতে চাইছিল না। তার নাকি অফিসে কাজ। পুনের সাইটে যাওয়ার ছিল। বেড়ানোরে মতো সময় তার হাতে নেই। মুকুর একরকম জোর করেই নিয়ে এসেছে। মুকুরকে বেশি 'না' বলতে পারে না সুনন্দ, তাই মুখ গোমড়া করে চলে এসেছে। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে দু'ঘন্টার একটু বেশি লেগেছিল। পথে কফি আর মোমো খাওয়া হয়েছে। কালিঝোরা থেকে আরও তেরো কিলোমিটার মতো উঠতে হল। সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে। খুব ঠান্ডা। ট্যুরিস্ট গাইডে এই জায়গার নাম চট করে পাওয়া যাবে না। পাহাড়ি একটুকরো গ্রাম। নামটাও অদ্ভুত। অহলদার। ম্যাগাজিনে মুকুর খুঁজে পেয়েছে।

পাইন, ফার্মে ঘেরা নির্জন রঙিন গ্রাম একটা। একদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত দেখ যায়। পাহাড়ের কোনো কোনো ভিউ পয়েন্ট থাকে যেখান থেকে হাত বাড়ালেই

ছোঁয়া যায়। এতো কাছে রূপোয় মোড়া পাহাড়চূড়ো এর আগে দেখেনি মুকুর। ছোটো ছোটো রঙিন ঘরবাড়ি। গ্রাম থেকে একটু সরে গেলে খান কয়েক কাঠের বাড়ি। এটাই গেস্টহাউস। আসলে হোম স্টে। অহলাদারে এটি ছিল একমাত্র থাকবার জায়গায়। ভোরবেলা কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙে রাজকীয় ভঙ্গিতে। সোনালি আলোয় আড়মোড়া ভাঙে গ্রাম। দ্বিতীয় দিন ঘুরতে বেরিয়ে নামহীন ঝোরার কাছে চলে এসেছিল। বেশ ঠান্ডা। পাথরের ওপর বসে মুকুর নিচের দিকে তাকিয়ে ঝোরা দেখছিল আর তখনই ঝোরা কন্যাকে দেখতে পায়। সুনন্দ পাশে বসেছিল। মুকুর তার কোট ধরে টান দেয়।

'ওমা! দ্যাখো দ্যাখো। একটা মেয়ে কেমন জলে ভিজছে!'

সুনন্দর এমনিতেই মেজাজ কিঞ্চিৎ খটমট হয়ে আছে। বউয়ের ডাকে অনিচ্ছে সত্ত্বেও সে নিচে মুখ ফেরায়।

'এই ঠান্ডায় জলে ভিজছে! লোকাল?'

সুনন্দ বিরক্ত মুখে বলে, 'তাই হবে। না হলেও কিছু এসে যায় না। হয় পাগল, নয়তো মাতাল।'

'নিউমোনিয়া হবে তো।'

সুনন্দ বলল, 'হোক, তোমার কী? চল উঠি।'

মুকুর বলল, 'আর একটু থাকি।'

সুনন্দ বলে, 'পাগলামি দেখবে!'

মুকুর হেসে বলল, 'সে পাগল বলো আর যাই বলো বেশ মজা লাগছে কিন্তু। ইস্ আমিও যদি ঝরনার তলায় অমন নাচতে পারতাম।'

সুনন্দ এবার রাগ করেই উঠে পড়ল। বলল, 'যাও, তুমিও নেমে যাও না। নেমে গিয়ে ঝরনায় দাঁড়িয়ে নৃত্য করো।'

সুনন্দ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে সিগারেট ধরাল। মুকুর আকাশ, পাহাড়, জঙ্গল দেখার পর আবার নিচে তাকায়।

আরে! মেয়েটা কি সত্যি পাগল? ঝোরা কন্যা এবার তো ভয়ানক কাণ্ড করেছে। গায়ের ভেজা জামা খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। গায়ে শুধু কালো রঙের ব্রা। কোমরের বেল্টটা খুলে নিচু হয়ে ট্রাউজারটাও খুলে ফেলল। এখন শুধু প্যান্টি। এতদূর থেকে প্যান্টির রঙ বোঝা যাচ্ছে না। মুকুর বুঝতে পারল, আর দেখা উচিত না। মেয়েটি নিশ্চয় ভাবছে, এই পাহাড়-জঙ্গলে মেঘ আর কুয়াশা ছাড়া কেউ কোথাও নেই। সে প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির মতো আদিম হয়ে মিশে যেতে চাইছে।

মুকুর চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না। প্রায় নগ্ন তরুণী এবার দুপাশে দু'হাত ছড়িয়ে এক পাক ঘুরেও নিল। এক সময়ে দেখা সাবানের বিজ্ঞাপনের মতো। এবার মুকুর দেখতে পেল, তরুণী একা নয়। ঝোরার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে আছে এক তরুণ। সে ফটো তুলছে। হাঁটু মুড়ে, বসে পড়ে, কাত হয়ে নানা কায়দায় ছবি তুলছে। সে অবশ্য শার্ট-প্যান্ট পরে আছে। ছেলেটি কে? ওর স্ত্রী? তাই হবে। মেয়েটি সরে এসেছে, ছেলেটি তাকে একটা তোয়ালে ছুড়ে দিল। তার মানে তৈরি হয়ে এসেছে। ছেলেটি কিছু একটা বলল। মেয়েটি গা মুছতে মুছতে ব্রা খুলে ফেলল। তোয়ালে কাঁধে রেখে পাথরে বসে পোজ দিতে শুরু করল।

মুকুর আর পারল না। সে উঠে সরে গেল। এবার দেখাটা অপরাধ হচ্ছে।

সেদিন দুপুরেই কটেজে ওই ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। পাশের কোয়াটার্রে উঠেছে। দিশা আর কিশোর। দুই বন্ধু। হইচইয়ের মধ্যে থাকে। কাজ করে বড় কোম্পানিতে। লিভ টুগেদার করছে। বিয়ের কথা ভাবছেই না। কিশোরের আবার ফটোগ্রাফির শখ। পাহাড়ে সঙ্গিনীর ফটো তুলতে এসেছে। নানা পোজের ছবি। এবার কাছ থেকে দিশাকে দেখল মুকুর। অতি সুন্দরী বললে কম বলা হবে। কিশোর ছেলেটি মিশুকে। ওরাই আলাপ করল এবং জমিয়ে নিল। সারাদিনটা চমৎকার, কিন্তু সন্ধ্যের পর ভীষন একা। তাই পরের দুদিন হুইস্কি, পকোড়া সহযোগে সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত জমিয়ে গল্প হল। সুনন্দও মজে গেল। ওর বেড়াতে আসার বিরক্তিটাও কমল যেন।

রাতে নিজের কটেজে ফিরে মুকুর হালকা হেসে বলল, 'অমন সুন্দরীকে পেয়ে মুড ঠিক হয়ে গেল?'

সুনন্দ বলল, ‘মেয়েটি সুন্দরী তাতে কোনোও সন্দেহ নেই। তবে কিশোরও কম সুন্দর নয়। আর দেখছি ও তো তোমাকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে। তুমিও সুন্দরী বলে।’

মুকুর হাই তুলে বলেছিল, ‘তাও তো সেদিন ঝরনার পুরো দৃশ্যটা দেখতে পাওনি। তাহলে মাথা ঘুরে পড়ে থাকতে।’

সুনন্দ বলল, ‘ওসব ওদের বলতে যেও না যেন। লুকিয়ে প্রেম দেখা কোনো কাজের কথা নয় মুকুর।’

‘দেখিনি, চোখে পড়ে গিয়েছিল।’

সুনন্দ ভুরু কুঁচকে বলল, ‘কী চোখে পড় গিয়েছিল?’

কম্বলের তলায় সুনন্দর কাছে ঘেঁষের মুকুর বলেছিল, ‘শুনে কাজ নেই। কাছে এসো।’

সুনন্দ কম্বলের ভিতরই মুকুরের সোয়েটার নাইটি খুলতে খুলতে বলল, ‘কিশোর ছেলেটা ইন্টারেস্টিং। ফটো তোলে আর থ্রিলারের ভক্ত। একটা মার্ডারের গল্প বলল, আমি তো শুনে থ। পয়জন ইউজ করে খুন। কীভাবে বিষটা গেল বুঝতেই পারা যায় না। বাপ্‌রে!’

মুকুর সুনন্দর স্লিপিং সুট খুলতে খুলতে বলল, ‘এখন খুনের গল্প বাদ দাও তো।’

মুকুরের নিমন্ত্রিতের লিস্টে দিশা আর কিশোরও রয়েছে। সুনন্দর উৎসাহই বেশি। ওরা এখন সবসময় একসঙ্গে থাকতে পারে না। দিশা পুনেতে বদলি হয়েছে। এখন অবশ্য কলকাতায়।

দিশার ফোন পাওয়া গেল না। মুকুর ওর জন্য মেসেজ রাখল।

১৭

মানুষটা মেঝের ওপর পড়েছিল উপুড় হয়ে। মাথাটা একপাশে কাত। গায়ে কালো ঘরে পরবার গেঞ্জি আর পায়জামা। দুহাত ছড়ানো। মাথার চারপাশে জমাট বাঁধা রক্ত গোল হয়ে রয়েছে। টাটকা রক্ত। সবে গড়ানো শেষ করে থমকে গেছে। বাঁ হাতের কাছে পড়ে রয়েছে দলা পাকানো তোয়ালে। একটা হাত তোয়ালের ওপর রাখা। তোয়ালের রঙ নীল। রক্তের ছিটে এসে লেগেছে। তবে এটা বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোক স্নানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

ইনি একজন প্রাক্তন মিলিটারি অফিসার। মেজর ছিলেন। এখনও সবাই 'মেজরসাহেব' বলেই চেনেন। নাম সুনীলকুমার চৌবে। বয়স পঁয়ষট্টি থেকে ছেষট্টি। দেখলে বয়স বোঝা যাবে না। লম্বা, চওড়া পেটানো চেহারা। চুল ছোটো করে ছাঁটা। ঠোঁটের ওপর পাকানো গোঁফও রয়েছে। মিলিটারি অফিসারদের যেমন হয়।

'কারেন্ট গোপাল' পুলিশকে জানিয়েছে, মেজরের উপুড় হয়ে পড়ে থাকবার দৃশ্য প্রথম সে দেখতে পেয়েছে। সে যখন ফ্ল্যাটে আসে, মেন দরজা ভেজানো ছিল। লকে হাত দিতেই দরজা খুলে যায়। দরজা ঠেলেই সে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। একটু পরেই মেজরকে পড়ে থাকতে দেখে। তখনও সে জানত না, ভদ্রলোক মারা গেছেন, এবং মারা গেছেন গুলিতে। ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি মাথায় ঢুকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

গোপাল পাড়ার ইলেকট্রিক মেকানিক। সেই কারণে নাম 'কারেন্ট গোপাল'।

পুলিশ 'কারেন্ট গোপাল'কে জিগ্যেস করে, 'দরজা কেন খোলা ছিল?'

গোপাল পুলিশকে জানায়, সম্ভবত তার জন্যই খোলা ছিল। মেজর সাহেব অপেক্ষা করছিলেন।

গোপাল ঘটনার দিন সকালে ফোন পায়। মেজর নিজে ফোন করেছিলেন। গিজার কাজ করছে না। কয়েক মুহূর্ত লাল আলো জ্বালিয়েই থমকে গেছে। এখনই এসে গোপালকে সারিয়ে দিতে হবে। গোপাল ফোন পেয়েছিল সকালে। যেতে ঘন্টাখানেক লেট হয়ে যায়। এর মধ্যে আরও একবার ফোন যায়। সেই ফোনে সুনীল চৌবে তাকে তাড়া দেন।

পুলিশ জানতে চায়, কেমন ভাবে তাড়া দেন? বকাবকি করেন?

গোপাল বলে বকাঝকা করেননি। মিলিটারি হলেও তিনি কখনও রাগারাগি করতেন না। তবে গম্ভীর গলায় কথা বলেতেন। সেদিনও তাই বলেছেন।

'কখন আসছো গোপাল?'

'আসছি স্যার। একটু পরেই আসছি।'

'আমার তাড়া আছে যে। হসপিটাল যেতে হবে। আমার মিসেস কদিন ধরে হসপিটালে ভর্তি রয়েছেন।'

‘স্যার, একটা এমারজেন্সি কাজ সেরেই যাচ্ছি।’

‘আমারটাও এমারজেন্সি কম নয়। দেরি কোর না। স্নান করে বোরোতে পাচ্ছি না। ওদিকে ডক্টরের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তুমি দেরি করলে কিন্তু আমাকে ঠান্ডা জলেই স্নান করে ফেলতে হবে। রেজাল্ট উইল বি ব্যাড। আমার গলা ব্যথা হয়েছে।’

‘স্যার একটু অপেক্ষা করুন।’

গোপাল পুলিশকে জানিয়েছে, তারপরেও মেজরের ফ্ল্যাটে যেতে তার দেরি হয়। দেরি না করে উপায় ছিল না। গোপালকে কাজ করতে হয় প্রায়োরিটি বুঝে। সে মনে মনে সেভাবেই লিস্ট বানায়। এর আগে দুটো বাড়িতে তাকে যেতে হয়েছিল। প্রথম বাড়িতে মেন সুইচে গোলমাল হয়েছে। গোটা বাড়ির কারেন্ট চলে গেছে। বাড়ির ছেলে মোটরবাইক নিয়ে এসে হাজির। হইচই লাগিয়ে দিল। মোটরবাইকের পিছনে বসিয়ে এখনই নিয়ে যাবে। তাই গেল। সেই বাড়ির কাজ শেষ করতেই দ্বিতীয় বাড়ি থেকে ফোন এলো। আর্থিং-এর ঝামেলা হয়েছে। জলের কলে, রেফ্রিজারেটরে হাত দিলে চিন্‌চিন্‌ করে কারেন্ট লাগছে। বড় কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। গোপালের মনে হয়েছিল, গিজারের থেকে বেশি জরুরি। সে ওই বাড়িতে চলে যায়।

পুলিশ জিগ্যেস করে, দুটো বাড়ির নম্বর কত?

গোপাল একটি বাড়ির নম্বর বলতে পারে, দ্বিতীয় বাড়ির নম্বর বলতে পারে না। শুধু বলে, চারমাথার মোড়ের মা কালী ভাণ্ডারের দুটো বাড়ি পরে।

পুলিশ জানতে চায়, তারপর কী হল?

‘কারেন্ট গোপাল’ জানায়, তারপরে সে নাকি একটু ভয়ে ভয়ে ছিল। যতই প্রাক্তন হোক, মিলিটারি বলে কথা। তবে এর আগেও বেশ কয়েকবার এই ফ্ল্যাটে কাজ করেছে গোপাল। মানুষটা কখনও রাগারাগি করেন নি। সবথেকে বড় কথা, পয়সাকড়ি নিয়ে দরাদরি করতে হয় না। একদিন তো একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছিল। সেই গল্প গোপাল অনেককে বলেছে। পুলিশকেও বলল।

গোপাল মেজরের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল টিউবলাইটের সেট বদলাতে। ডোরবেল টিপতে ম্যাডাম এসে দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে ঢুকে গোপাল দেখল, বসাবার ঘরের সোফায় মেজর বসে। হাতে একটা রিভলভার। সামনের টেবিলে রাখা আছে শিশি, ঝাড়ন, নানা মাপের লম্বা, সরু, মুখ থ্যাবড়া ব্রাশ। সেসব দিয়ে সাহেব রিভলভার পরিষ্কার করছেন। গোপালের চোখ তো ছানাবড়ার মতো হয়ে গেল। সে এত কাছ থেকে কখন বন্দুক, রিভলভার দেখেনি। সেদিন নাকি যতক্ষণ সে মেজরের বাড়িতে ছিল, রিভলভার পরিষ্কারের কাজ চলেছে। একসময়ে সে আর থাকতে পারে নি। মেজরকে জিগ্যেসও করে বসে।

'স্যার, কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করতাম।'

রিভলভারের নলে লম্বা বুরুশ ঢুকিয়ে সুনীল চৌবে বলেন, 'এই পিস্তল নিয়ে জিগ্যেস করবে তো?'

গোপাল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কী করে বুঝতে পারল? একেই বলে বুদ্ধি।

'হ্যাঁ স্যার। এত কাছ থেকে আমি কখনও রিভলবার দেখি নি।'

'এটা রিভলভার নয়, নাইন এমএম পিস্তল। এটাকে বলে এমনাইন বেরেট্টা। জার্মান কোম্পানির তৈরি। ওয়ারফিল্ডে খুব ভাল কাজ করত। এখন অবশ্য অনেক মডার্ন জিনিস বেরিয়ে গেছে।'

'কারেন্ট গোপাল' গদগদ গলায় বলে, 'স্যার, এটা আপনার?'

'হ্যাঁ। লাইসেন্সও রয়েছে। আর্মি থেকে রিটায়ারমেন্টের সময় আমি স্পেশাল পারমিশন করিয়ে ছিলাম। আমার ওপর থ্রেট রয়েছে। যখন কাজ করেছি দেশের অনেক গুপ্ত শত্রুকে ঘায়েল করতে হয়েছে। তাদের দলের কারও তো আমার ওপর রাগ থাকতে পারে।'

গোপাল হাত কচলে বলেন, 'এটা আপনি সঙ্গে রাখেন স্যার?'

কম কথার মানুষ সুনীল চৌবে বললেন, 'কখনও কখনও।'

গোপাল পুলিশকে বলেছিল, সেদিন একরকম ছুটতে ছুটতেই সে গিজার সারাতে আসে। চেনা মিস্ত্রি বলে ফ্ল্যাটে ঢুকতে সমস্যা হয়নি। সিকিউরিটি আটকায়নি। সে লিফটে ঢুকে সোজা তিনতলায় চলে যায়। বাঁদিকের কোনার ফ্ল্যাটই মেজরের। পুলিশ ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার, সিকিউরিটি এবং অন্যান্য বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, মেজর স্ত্রীকে নিয়ে এই ফ্ল্যাটে উঠেছিলেন তিন বছর আগে। ছেলে আর

ছেলের বউ থাকে বিদেশে। ছেলে ওখানে চাকরি করে। সুনীল চৌবের ইচ্ছে ছিল একমাত্র ছেলে তাঁর মতোই মিলিটারিতে যোগ দিক। দেশের জন্য কাজ করুক। ছেলে রাজি হয়নি। এতে তিনি খুবই হতাশ হয়েছিলেন। দেশসেবা তাঁদের বংশ পরম্পরার কাজ।

তাছাড়াও ছেলের বউয়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সুবিধের ছিল না। মেয়েটি ফরাসি। দেশেপ্রেম তো দূরের কথা, তার এই দেশ নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। শ্বশুর শাশুড়ি এবং পুত্রবধূর মধ্যে রিলেশন কী সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই। মেজর সুনীল চৌবে এটা মেনে নিতে পারতেন না। ফলে দু পক্ষের আসা যাওয়া খুবই কম। ছেলে দেশে এলেও হোটেলে ওঠে। ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দারা এসব খবর জেনেছিল মুখে মুখে। এমনকি এও জেনেছিল, মেজরের পৈতৃক সম্পত্তি অনেক। সেসব তিনি একটি এনজিওকে দান করে দিয়েছেন। তারা মৃত সেনাকর্মীদের অসহায় পরিবারকে প্রতিপালন করে। এই নিয়ে ছেলের সঙ্গে নাকি ঝগড়াও হয়েছে খুব।

সুনীল চৌবে আর তাঁর স্ত্রী ফ্ল্যাটের বাকিদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা করতেন না। দেখা হলে সামান্য হেসে মুখে ফিরিয়ে নিতেন। কখনও হাসতেনও না। তবে একবার ফ্ল্যাটে আগুন লেগেছিল। মাঝরাতে, মিটারবক্সে। মেজর সাহেব ভয়ংকর সাহস দেখিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে ফেলেন দমকল আসবার আগেই। আর একবার লিফট খারাপ হয়ে যাওয়ায়, চারতলার অসুস্থ এক বৃদ্ধকে কোলে করে নিচে নামান। অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়।

'কারেন্ট গোপাল' পুলিশকে বলেছে, ভেজানো সদর দরজা সে ফাঁক করে ঢুকে পড়ে। দুবার নাকি 'স্যার, স্যার' বলে চিৎকারও করে। কোনো সাড়া পায়নি। তখন আরও একটু ভিতরে যায়। যেহেতু তার ফ্ল্যাট চেনা, আগেও কয়েকবার এসেছে, অসুবিধে হয়নি। এরপর ড্রইংরুম টপকে বেডরুমে ঢুকেই মেজরকে দেখতে পায়। ঘরের মাঝখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন।

গোপাল নাকি ছুটে যায়। সে যে তখনও জানত না সুনীল চৌবে আর ইহলোকে নেই। কাছে গিয়ে রক্ত দেখে ভাবে, পড়ে গিয়ে মাথা টাথা কিছু ফেটে গেছে। সে দ্রুত হাতের পাশে পড়ে থাকা তোয়ালেটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে দেয় দূরের টেবিলে। ছিটকে যাওয়া মোবাইল ফোনটা সরিয়ে রাখে খাটের ওপর। তারপর

‘স্যার, স্যার…’ বলতে বলতে মেজরের মুখটা নিজের দিকে ফেরায়। শিউরে ওঠে। বাঁ দিকটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কান, কপাল, মাথার খুলি আলাদা করা যাচ্ছে না।

পুলিশ ঠান্ডা গলায় বলে, ‘তারপর?’

গোপাল বলে, সে এতটাই ভয়ে পেয়ে যায় যে কাউকে কিছু না বলে ফ্ল্যাটের বাইরে চলে আসে। দরজা টেনে দেয়। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকে। সিকিউরিটি গার্ডের হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তারপর প্রায় ছুট দেয়।

পুলিশ অবাক হয়ে জানতে চায়, সে কেন ছুটেছিল?

কারেন্ট গোপাল কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, ‘স্যার খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মাইরি বলছি।’

পুলিশ গোপালকে লক আপে পোরে। মৃতের শরীরে, তোয়ালেতে এবং তোয়ালে মোড়া আর্মি পিস্তলের নিচের দিকে গোপালের হাতের ছাপ পাওয়া যায়।

১৮

সকলেই ধরে নিল, গোপালই খুন করছে।

ধরে নেওয়ার কারণ ছিল। পুলিশ মোটিভও সাজিয়ে ফেলল। বেশিরভাগ সময় পুলিশের কাজই তাই। সে উলটো দিক থেকে হিসেব করে। উত্তর যেন জানাই ছিল। এবার এগোতে এগোতে অঙ্কটা বানিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রেও তাই হল। প্রাক্তণ সেনা অফিসারের হত্যার কারণ, মার্ডার ফর গেইন। মারতে পারলে অর্থ লাভ। অনেকের মতোই ‘কারেন্ট গোপাল’ –এর কাছে খবর ছিল, এবাড়িতে নগদ টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি রয়েছে। এই ধরনের ‘খবর’ পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সবসময়েই চোর ডাকাতরা পেয়ে থাকে। এই ফ্ল্যাটবাড়িতে অনেকেই এসব ‘গল্প’ জানত। নিশ্চয় সেখান থেকেই গোপালের কানে এসেছে। মেজেরসাহেবের স্ত্রী হাসপাতালে শুনে লোভ সামলাতে পারেনি গোপাল। সে তখনই মনে মনে ভেবে নেয়। দুটো বাড়িতে কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করে। সে চাইছিল মেজর অধৈর্য হোক। হলেও অন্যমনস্কও থাকবে। সূক্ষ্ম সাইকোলজি নিয়ে খেলতে চায়। সাকসেসফুলও হয়।

পুলিশ বলেছে, গোপাল আগে থেকেই জানত অফিসারের একটা পিস্তল আছে। একথা সে স্বীকার করেছে। এমনকি ধরে নেওয়া যেতে পারে, সেই পিস্তল আলমারির কোথায় রাখা হতো সেটাও সে জেনে ফেলেছিল। মুখে এখনও বলছে না। পরে বলবে। কোনোও অপরাধী চট করে অপরাধ স্বীকার করে না। কবুল করতে সময় লাগে। এখানে লাগবে। যেদিন সে সুনীল চৌবের হাতে পিস্তলটা দেখেছিল, সেদিন আলমারি বা দেরাজ ধরনের কোথাও থেকে অস্ত্র বের করতে দেখাটা অসম্ভব নয়। রাখবার সময়েও দেখে থাকতে পারে। আবার এমনটাও হতে পারে ঘটনার দিনও মেজর সাহেব জিনিসটা বের করছিলেন। আবার নাও হতে পারে। কোনটা ঠিক তদন্তে জানা যাবে। গোপাল সেদিন ফ্ল্যাটে ঢোকবার আগেই মেজরসাহবের স্ত্রী হাসপাতালে, তিনি রয়েছেন একা। সে এই সুযোগটাই নিয়েছিল।

প্রশ্ন, সে কিছু চুরি করেনি কেন?

পুলিশ বলেছে, ভয় পেয়ে যায়। অমন ছিন্নভিন্ন মেজরকে দেখে সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে যায়। অতীতে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে। অপরাধী ভয় পেয়েছে। অপরাধ সম্পূর্ণ করবার আগেই পালিয়ে গেছে। যারা নতুন তাদের পক্ষে পালিয়েঅ যাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আবার এমনটাও হতে পারে, একেবারে খুন করে ফেলবার ইচ্ছে হয়তো ছিল না। শুধু আঘাত করতে চেয়েছিল। তবে যাই হোক, খুনটা যে গোপাল করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সর্বত্রই তার হাত ছাপ পাওয়া গেছে।

'কারেন্ট গোপাল' মুকুরের বাপেরবাড়ির পাড়ার ছেলে। খুবই পরিচিত। গোপালের বাবা একসময়ে মুকুরদের বাড়িতে কাজ করেছেন। তিনি অবশ্য ইলেকট্রিকের কাজ করতেন না, ছিলেন কারপেন্টার। সেই বৃদ্ধ এসে মুকুরের বাবার পায়ে পড়লেন।

'দাদা, ছেলে খুন করেনি। একাজ গোপাল করতে পারে না। তাকে বাঁচান।'

মুকুরের বাবা বললেন, 'পাড়ার সবাই তো তাই মনে করে। সকলেই গোপালকে পছন্দ করে। ছোটোবেলা থেকে দেখছে। কিন্তু কী করব বল? প্রমান তো অন্য কথা বলছে। যে পিস্তলের গুলিতে আর্মি অফিসার মারা গেছেন, সেই পিস্তলে গোপালের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে যে। শুধু পিস্তল কেন? ঘরের সর্বত্রই ছাপ রয়েছে।'

গোপালের বাবা হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, 'শুধু হাতের ছাপ পাওয়া গেলেই কি কেউ অপরাধী হয়ে যায়? এখন যদি ...এখন যদি বলতে নেই... আমি চলে যাওয়ার পর কোনো গুণ্ডা বদমাই এসে আপনাকে কিছু করে তখন আমার কী হবে? আপনার গায়ে তো আমার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে না। যাবে না দাদা? আমি তো আপনার পা ধরেছি...তবে কী আমি দোষ করলাম ? ছাপ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ লাগে না?'

মুকুরের বাবা আমতা আমতা করে বললেন, 'এতো বলতে পারব না। তবে হাতের ছাপই তো আসল। গোপাল হঠাৎ অস্ত্রটা ধরতেই বা গেল কেন?'

গোপালের বাবা আবার হাউমাউ করে বললেন, 'হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। আপনি ওকে বাঁচান।'

মুকুরের বাবা সেদিন শান্ত করে গোপালের বাবাকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এছাড়া আর কী বা করতে পারতেন তিনি? খুনের মামলা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়। তারপরেও বিকেলে তিনি মুকুরকে ফোনে সব বলেন। তখন সবে বিয়ে হয়েছে মুকুরের। সেও গোপালকে ভাল করে চিনত। ছেলেটা একটু খেপুটে হলেও ভাল। 'দিদি, দিদি' করত। বাবার মুখে ঘটনা শুনে তারও মন খারাপ হয়ে গেল।

'বুঝলি মুকুর আমারও কেমন যেন ধাঁধার মতো লাগছে। গোপালের বাবা যে বলল, হাতের ছাপই কি অপরাধী চেনার আসল উপায়?'

'তা তো বটেই বাবা। ওয়েপনে যার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে সেই তো দোষী।'

মুকুরের বাবা আনমনে বলেছিলেন, 'তাও তো বটে।'

সেদিন বাবার ফোন ছাড়বার পরেই অনুকূলকাকুর কথা মনে পড়ে যায় মুকুরের। স্কুলের বন্ধু মালশ্রীর কাকা। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন, কিন্ত পুলিশ নন। ফরেনসিক এক্সপার্ট। ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে বিদেশে পড়াশোনা করেছেন। এখন অপরাধের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে বেড়ান। জটিল কেসে ডাক পড়লে পুলিশকে সাহায্য করেন। যে কয়েকবার মালশ্রীর বাড়িতে ভদ্রলোকের সঙ্গে

দেখা হয়েছে হাতের ছাপ নিয়ে অনেক গল্প শুনেছে মুকুররা। কীভাবে হাতের ছাপ খুঁজতে হয়, চিনতে হয় সব বুঝিয়ে ছিলেন। এমন একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট শুনতেও তো মজা লাগত।

'বুঝলে ভাইঝিরা, অপরাধ বিজ্ঞানে হাতের ছাপ খুব ইমপর্টান্ট একটা ব্যাপার। দরজার লক্, জানলার রড, কাপড় জামা, ফার্নিচার, সব জায়গায় ছাপ থাকে। মানুষের হাতের আঙুলে একধরনের আউটলেট আছে। ভালো বাংলায় যাকে বলা হয় গ্রন্থি। সেখান থেকে একধরনের অয়েলি সাবস্টানস্ সিক্রেশন হয়। তবে সবসময়ে হয় না কিন্তু। আঙুল যদি কোনো কিছুর ওপর চাপ ফেলে তবেই হবে। এই তেল ছাপ ফেলে যায়। ছাপ বোঝবার সবথেকে সমস্যা হল সেটা যদি অস্পষ্ট হয়। বিভিন্ন ধরনের গুঁড়ো দিয়ে সেই অস্পষ্ট ছাপতকে স্পষ্ট করতে হয়। অ্যালুমিনিয়ম পাউডার, ভুসোকালির গুঁড়ো, পারদ, খড়িমাটি ব্যবহার করতে হয়।'

মালশ্রী বলত, 'বাঃ, এতো খুব সোজা। একটু চেষ্টা করলে আমরাও পারব। এবার থেকে আমাদের জিনিসে যে হাত দেবে পাউডার ছড়িয়ে ধরে ফেলব।'

অনুকূলকাকা হেসে বলতেন, 'তা পারবে, তবে বুরুশের কায়দা জানতে হবে। বুরুশে বেশি করা পাউডার লাগিয়ে সেই পাউডার আবার ঝেড়ে ফেলতে হবে।'

মুকুর অবাক হয়ে বলত, 'সে আবার কী! নেব আবার ফেলেও দেব?'

অনুকূলকাকা বলতেন, 'সেই জন্য শিখতে হয়। বেশি পাউডার থাকলে কাজ ভেস্তে যাবে। বুরুশে যেন সামান্য পাউডার লেগে থাকে। এবার অস্পষ্ট ছাপের ওপর সেই বুরুশ টানতে হবে খুব সাবধানে। আঙুল থেকে সিক্রেশন হওয়া তেল সেই পাইডারকে ধরে নেবে। ছাপ স্পষ্ট হবে। ওপর থেকে পাউডার ছড়াতে গেলে ছাপ পাওয়া যাবে না।'

মুকুররা তো থ'। এতো পুরো ম্যাজিক!

অনুকূলকাকা বলতেন, 'হাতের ছাপ শুনতেই সোজা, কিন্তু খুঁজে পেতে অলেক লেখাপড়া জানতে হয়। হোয়াইট লেড, সিলভার নাইট্রেট খুব কাজে লাগে। তারওপর অনেক ধরনের সলিউশন বানাতে হয়। যেমন ধর, লিউকো ম্যালাচিট নামের এক ধরলেরে কেমিকাল খানিকটা ইথার আর কয়েক ফোঁটা

গ্লোসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে দারুণ কাজ পাওয়া যায়। হালকা ছাপের ওপর এই সলিউশুন ছড়িয়ে দিলে নীল রঙের ছাপ পাওয়া যাবে।'

মুকুর বলতো, 'বাপ্‌রে! ক্রিমিনাল ধরবার কত টেকনিক।'

অনুকূলকাকা মাথা নেড়ে নেড়ে বলতেন, 'নইলে যে অপরাধ প্রমাণই করা যেত না। বেকসুর খালাস হযে যেত। শুধু কি আঙুলের ছাপ ভাইঝি? গন্ধে, পায়ের ছাপেও অপরাধ বোঝা যায়।'

মুকুর তার পুরোনো খাতা হাতড়ে মালশ্রীর ফোন নম্বর খুঁজতে লাগল। যে করেই হোক অনুকূলকাকাকে ধরতে হবে। গোপালকে বাঁচাতে হবে।

মুকুরের আর তিনজনকে ফোন করা বাকি। তাহলেই তেরোজনের লিস্ট কমপ্লিট হবে। লিস্ট তৈরি করবার সময় মুকুর একবার ভেবেছিল, আনলাকি থার্টিন হয়ে যাচ্ছে না তো? পরে মনে পড়ল, তেরো কোথায়? সে আর সুনন্দও তো রয়েছে। হোস্ট কি পার্টিতে জয়েন করে না? অবশ্যই করে। ক্যাটারার সবারই প্লেট গুনবে। তাহলে আর আনলাকি থার্টিন কোথায়?

যে তিনজনকে বলা বাকি সেই তিনজনই একা আসবে। সিঙ্গল। যদিও তন্ময় আর মেহুলিকে কি একা বলা যায়? এরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী ছিল। এখন মিউচ্যুয়াল ডিভোর্স নেওয়ার জন্য সেপরেশনে আছে। বিয়ের আগে থেকেই এদের সঙ্গে পরিচয় মুকুরদের আলাপ। একসময়ে দুজনেই একসময় সুনন্দর কলিগ ছিল। পরে অফিস বদলায়। আলাদা আলাদা অফিসে চলে যায়। অফিস ছাড়বার সময় সুনন্দ একদিন বাড়িতে ডেকে খাইয়েছিল। সেই সময় থেকে আলাপ। আলাপ সুনন্দর মারফত হলেও ঘনিষ্ঠতা বেশি হয়ে উঠেছিল মুকুরের সঙ্গে। ওদের ঝামেলার পর সেই ঘনিষ্ঠতা খানিকটা কমেছে। তারপরেও ওদের নেমন্তন্ন করতেই হয়েছে। নইলে সেটা একটা বিশ্রী ব্যাপার হতো। সত্যি কথা বলতে কী এই ফ্ল্যাটটা ওদের জন্যই পাওয়া গেছে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ফ্ল্যাটটা ওরাই ডেভলপারের কাছে থেকে বুক করছিল। তখনও ওরা একসঙ্গে। মেহুল একদিন মুকুরের কাছে এসে উপস্থিত হল। সেই প্রথম মুকুর ওদের ঝগড়ার কথা জানতে পারল। জেনে খুবই অবাক হল।

‘মুকুর, তোমাকে একটা জরুরি কথা জানাতে এসেছি।’

মুকুর বলল, ‘তার আগে বলো কী খাবে?’

মেহুল বলল, ‘এটা ভাল বলেছো। খিদে পেয়েছে। বাড়িতে কী আছে?’

মুকুর বলল, ‘তেমন কিছু নেই, করে দেব? আচ্ছা জোমাটোতে বলে দিচ্ছি। মিক্সড্ চাও বলি?’

তখনও মুকুর বুঝতে পারেনি এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। মাস দুয়েক ওদের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল না। স্কুলে চাপ ছিল খুব। মেহুল তন্ময় কোভালম্ না কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল। তাছাড়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করছে মেহুল। অনেকক্ষণ কেন? পুরোটাই বলা যায়। কোনোরকম উত্তেজিত গলাই ছিল না। বোঝাই যাচ্ছিল না, এতবড় ঘটনা একটা ঘটে গেছে।

জোমাটোতে অর্ডার সেরে মুকুর বলল, ‘তন্ময়ের খবর কী?’

‘খুব ভালো। অফিসে ওর একটা লিফট হয়েছে।’

মুকুর বলল, ‘তাই নাকি! ভেরি গুড। ওকে ফোন করে কনগ্রাচুলেশন জানাতে হবে।’

মেহুল বলল, ‘ওকে তো ধরাই যায় না। হিল্লি দিল্লি করে বেড়াচ্ছে। মুম্বাই, পুনে তো প্রতি মাসে একবার করে যেতে হয় শুনলাম। ওদিকে ট্রান্সফার হত পারে।’

মুকুর বলল, ‘সেকী! মেহুল তুমি কী করবে? তুমিও বরং ট্রান্সফার নিয়ে নাও। এতো একেবারে সুনন্দর মতো। সেও তো ঘন ঘন মুম্বাই আর বেঙ্গালুরু যাতায়াত করে।’

মেহুল হেসে বলল, ‘তুমি ট্রান্সফার নিচ্ছো না কেন মুকুর? স্যারের সঙ্গে চলে যাবে।’

মুকুরকে নাম ধরে ডাকলেও, মেহুল তন্ময় এখনো পুরোনো অভ্যেস মতো সুনন্দকে ‘স্যার’ ডাকে।

মুকুর বলল, ‘আমার কি সেই অপশন আছে? আমার স্কুলের তো আর ব্রাঞ্চ নেই, আর অন্য স্কুলে গিয়ে যে জয়েন করব, তারও উপায় নেই। তাছাড়া তোমাদের স্যার তো আর পাকাপাকি চলে যায়নি। যাতায়াত করছে। শেষ পয়েন্টটা কী জানো? কলকাতা ছাড়তে ইচ্ছে করে না।’

মেহুল অন্যমনস্ক হয়ে বলল, ‘আমি ছেড়ে দেব। খুব চেষ্টা করছি মুকুর। দেশের বাইরেই চলে যেতে চাই। ইউরোপে তো ওয়ার্ক ভিসা দিচ্ছে না, মিডল্ ইস্ট দেখব।’

মুকুর অবাক হয়ে বলল, ‘সেকী! তুমি একদিকে তন্ময় একদিকে! তোমরা তো কলকাতায় ফ্ল্যাটও নিচ্ছো।’

মেহুল ঠোঁটের কোণে হেসে বলল, ‘দূরে দূরে থাকাই তো ভাল।’

ডোরবেল বেজে উঠল। খাবার এসেছে।

মুকুর উঠে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, ‘মানে! কী হেঁয়ালি করছো মেহুল?’

মেহুল বলল, ‘দাঁড়াও, মানে বলছি। আগে খেয়ে নিই।’

সেদিন তৃপ্তি করেই খেয়েছিল মেহুল। চাও –এর সঙ্গে গার্লিক চিকেনও নিয়েছে মুকুর। টিস্যুতে মুখ মুছে মেহুল বলল, ‘মুকুর, উই ডিসাইডেড টু ব্রেক দ্য রিলেশন।’

মুকুর বলল, ‘মানে!’

মেহুল বলল, ‘ভেরি সিম্পল। আমার ডিভোর্সে যাচ্ছি। অলরেডি সেপারেশন শুরু করেছি। মাথা গরম, রাগারাগি কিছু নয়, মিউচুয়ালি আমরা সরে যাচ্ছি।’

মুকুর থতমত খেয়ে বলল, ‘কী বলছো মেহুল! হঠাৎ কী হল? এই তো তোমারা বেড়াতে গিয়েছিলে।’

মেহুল বলল, ‘ওখানে গিয়েই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর নয়। এনাফ ইজ এনাফ।’

মুকুর কী বলবে বুঝতে পারছিল না। সে চুপ করে রইল। এমন সুন্দর একটা কাপলের কী হল! সে কফি করে আনল। মেহুল কফি মাগে চুমুক দিয়ে নিজে থেকেই বলতে শুরু করল। গলায় খানিকটা অন্যমনস্ক ভাব, খানিকটা অভিমান, খানিকটা নতুন করে জীবনকে দেখা। তবে উচ্চকিত নয়। যাকে আমরা ‘লাউড’ বলি।

‘মুকুর, তন্ময় নতুন করে প্রেমে পড়েছে।’

মুকুর চুপ করে রইল। সে কী বলবে? এই পারসোনাল কথায় মন্তব্য হয় না। সে যে শুনতে চাইছে এমনটাও নয়। তারপরেও মেয়েটা যদি বলে মন হালকা করতে চায় তাহলে তো বলতে দিতে হবেই। মেহুল নিচু গলায় বলতে থাকে।

‘সেই মেয়েটির পরিচয় আমি জানিনা, জানতে চাইও না। শুনেছি অতিরিক্ত সুন্দরী, অতিরিক্ত বুদ্ধিমতী। কোনো একটা বড় কোম্পানির রিসার্চ উঁইং–এ রয়েছে, একাধিক বিয়ে। ফলে কামশাস্ত্র বিষষটি খুব ভাল করেই রপ্ত করেছে। মুকুর তোমাকে এখন বলতে এখন আর সমস্যা নেই যে তন্ময় সেক্সুয়ালি ভেরি হট। তার আর্জ ভেরি স্ট্রং। আর পাঁচটা ভেতো বাঙালির মতো শুধু সন্তানের জন্ম দিতে নয়, সে সেক্স এনজয় করে। মুখে বলে, মানুষের কাছে এটা একটা ব্লেসিংসের মতো। জীবজগতে সকলেই শরীরের তাগাদায় অন্য শরীরের সঙ্গে মিলিত হয়। হরমোনাল ফাংশন। একমাত্র মানুষই জানে এনজয় করতে। মুকুর, হি ইজ অলসো ভেরি এক্সপার্ট। কখন টিমিড, কখন অ্যাগ্রসিভ। ওর ফোর প্লে ভেরি ইন্টারেস্টিং এণ্ড ইউনিক। এমন বহুদিন গেছে দিনে উই মেট টোয়াইজ অর মোর। যে কোনও মেয়ের কাছেই পুরুষ হিসেবে তন্ময় লোভনীয়।’

মুকুর মাথা নামাল। তার অস্বস্তি হচ্ছে। কোনো মেয়ে এতো খোলাখুলি যদি নিজের সেক্স লাইফ নিয়ে কথা বলে লজ্জা পাওয়ারই কথা।

মুকুর অস্ফুটে বলল, ‘ঠিক আছে…শুধু শরীর নয় মেহুল ভালোবাসার পিছনে আরও অনেক কিছু থাকে। ভরসা থাকে।’

মেহুল বলল, ‘থাকে হয়তো, সেটা বুঝতে সময় লাগে। সে সময় আমাদের এখনও আসেনি। যাই হোক, বেশ কিছুদিন ধরে আমার মনে হচ্ছিল, বেড পার্টনার হিসেবে তন্ময়ের আমাকে আর পছন্দ নয়। সরি, পছন্দ নয় কথাটা ঠিক নয়। স্যাটিসফায়েড হচ্ছে না। আদর করতে গিয়ে মাঝখানে যেন বোরড হয়ে যাচ্ছে। অথবা ফিনিশ করছে রুটিন মাফিক। তখনই আমার সন্দেহ হয়। বেড়াতে গিয়ে আমি ওকে সরাসরি জিগ্যেস করি। সে কনফেস করে। বলে, আনফরচুনেট হলেও কথাটা ঠিক। তার অনেক বেটার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। এরপরই সে তার নতুন বান্ধবীর কথা বলে। নাম–পরিচয় ছাড়াই বলে। আমি খুব ঠান্ডা মাথায় বিষয়টা নিয়ে ভাবি। যে পুরুষ তার বেঁচে থাকার অন্যতম আনন্দটাই আমার কাছ থেকে পাচ্ছে না, তাকে ধরে রাখবার যুক্তি কোথায়? আমি ডিভোর্সের প্রোপোসাল দিই। তন্ময় একটু গাঁইগুঁই করে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে।’

মুকুর আশ্চর্য হল। তন্ময়কে দেখে তো বোঝা যায় না। অবশ্য বিষয়টা এতোটাই পার্সোনাল যে বাইরের কারও বোঝা সম্ভব নয়।

মেহুল শুকনো হেসে নিজেকে যেন সামলাতে চাইল। বলল, 'যাক। যা হওয়ার ভাল হয়েছে। তন্ময় তন্ময়ের মতো লাইফ এনজয় করছে, আমি আমার মতো। এটা কোনো দোষের ব্যাপার নয় মুকুর। স্বামী, স্ত্রী কোনো জীবজন্তু নয় যে তার সঙ্গে শুধু মায়া মমতা, করুণার সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আই অ্যাম হ্যাপি। বহু দাম্পত্যের ভিতরে বিষ থাকে। ধীরে ধীরে শরীরে, মনে ঢুকতে থাকে। যখন জানা যায় তখন আর করবার মতো কিছু থাকে না। এটা অনেক ভালো।'

মুকুর বলল, 'তুমি শান্ত হও মেহুল।'

মেহুল ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'তুমি কি আমাকে অশান্ত দেখছো মুকুর? অশান্ত হলে তো ওই মেয়েটিকে আমি বিষ দিয়ে মেরে ফেলবার কথা ভাবতাম। তা কি আমি ভাবছি? ডিভোর্সের জন্য গেলে কী হবে আমাদের সম্পর্ক এখন নরমাল। বিভিন্ন অকেশনে আমরা একসঙ্গে যাইও।' কথা শেষ করে ঠোঁটের ফাঁকে অর্থবহ হাসল মেহুল।

বলল, 'ওসব বাদ দাও। আর একটা জরুরি কথা আছে। তোমরা ফ্ল্যাট খুঁজছিলে না?'

মুকুর প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, খুঁজছিলাম তো।'

মেহুলি সোফায় হেলান দিয়ে বলল, 'আমরা যে ফ্ল্যাটটা বুক করেছিলাম, সেটা ছেড়ে দিচ্ছি। কলকাতায় থাকব কিনা তার ঠিক নেই। আমি তন্ময় দুজনেই ভেবেছি, প্রথমে স্যারকেই বলব। তোমরা যদি রাজি না হও তখন অন্য কোথাও বেচব। মুকুর ফ্ল্যাটটা যদি নাও আমার ভাল লাগবে। মনে হবে নিজেরই রইল।'

তন্ময়ও সুনন্দকে দেখা করে এই প্রস্তাব দিয়েছিল। তখনও তো ফ্ল্যাট কমপ্লিট হয়নি। শুধু কাঠামো ছিল। মুকুররা অনেক ভাবনাচিন্তা করে সেই ফ্ল্যাট নিয়েছে। মেহুল, তন্ময়কে নেমন্তন্ন না করলে হয়? সুনন্দ শুনে চুপ করে গিয়েছিল, তবে না বলেনি। ফ্ল্যাটে ঢোকবার সময় বললেও ওরা আসতে পারেনি। কলকাতায় ছিল না। এখন আছে। মেহুল তো বলল, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওদের দেখা হয়। তাহলে সমস্যা কী? মেহুল আর তন্ময়ের জন্য মেসেজ রাখল মুকুর। বাকি রইল একজন।

ঘরে ঢুকে জানলার পর্দা সরিয়ে দিল হৈমন্তী। দেওয়াল জোড়া কাচের জানলা দিয়ে কলকাতার ঝকেঝকে আকাশ ঘরের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেন হেসে বলল, 'কেমন আছ হৈমন্তী? কলকাতায় স্বাগতম।'

হৈমন্তী হাসল। মনে মনে বলল, 'ফাইন। হাউ আর ইউ?'

আকাশ বলল, 'সবসময় ভাল থাকি না। মাঝেমধ্যে তোমাদের জন্য মন কেমন করে। সেসব সামলে আবার ঠিক হয়ে যাই।'

হৈমন্তী বলল, 'মন কেমনের কী আছে মাই ডিয়ার? তুমি তো সব জায়গাতেই থাক। নানা রূপে হলেও একই তো আকাশ। কলকাতা, পুনে, লন্ডন যেখানেই থাকি না কেন তোমার সঙ্গে দেখা তো হয়।'

আকাশ বলল, 'তুমি মেয়েটা যেমন সুন্দর, তোমার কথাগুলোও সুন্দর।'

হৈমন্তী বলল, 'থ্যাঙ্কু ডার্লিং।'

বাইপাসের ধারের এই হোটেলটা ভাল। শুধু নামকরা বলে নয়, পজিশনটা চমৎকার। কলকাতায় এলে হৈমন্তী এখানে ওঠে। সে ঘর নেয় একবারে ওপরের দিকে। এতো ওপর থেকে কলকাতাকে দেখতে তার অদ্ভুত লাগে। মনে হয়, একটা খুব কাছের শহর কত দূরের হয়ে গেছে! কত স্মৃতি, কত সুখ দুঃখ। ভালবাসা অপমান কত, কতই না প্রতারণা। কলেজে পড়বার সময মনে হতো এমন শহর আর হয়তো। এতো প্রাণ আর কোথায় আছে? সে মহা ভাগ্যবতী, কারণ এই শহরের মেয়ে। পরে ধাক্কা খেতে খেতে মনে হয়েছে, এই বিশ্রী শহর থেকে তাকে পালাতে হবে। যতদূরে পারা যায় পালাতে হবে। এখন বয়স বাড়াবার পর, শহরের ওপর থেকে অভিমান মুছেছে। বুঝেছে, শহর নয়, তাকে ঠকিয়েছে মানুষ। নোংরা মানুষ তাকে নিয়ে খেলেছে। শহর সেই দায় নেবে কেন? তারপরেও মনে হয়, দূরে আছে বলেই ভাল লাগে। হৈমন্তী জানালার কাছে চলে আসে। কাচে হাত রাখে। কালকাতাকে স্পর্শ করতে চায়। প্রতিবারের মতো আজও অবাক হয়, শহরে এখন এতো সবুজও রয়েছে! এরোপ্লেন থেকে কিন্তু এরকম মনে হয় না। মনে হয়, এক্ষুনি কংক্রিটের জঙ্গলে নেমে পড়তে হবে। শুধু বড় বড় বাড়ির মাথা, রাস্তা, আর পুতুল খেলার গাড়ি। ল্যান্ডিং–এর ওই সময়টুকু হৈমন্তী চোখ বুঁজে থাকে।

হৈমন্তী জানলার সামনে থেকে সরে এল। ঘরের একপাশে রাখা ট্রলি ব্যাগটা টেনে টেবিলে তুলল। হালকা। জিনিসপত্র বেশি নেই তো। কটাদিনের জন্য তো আসা। কত ড্রেস আর লাগবে? ছোটো ব্যাগ আনলেও চলত। কেবিন লাগেদ করে নিয়ে আসা যেত। সেটা সম্ভব হতো না। সেই ব্যাগ কেবিনে অ্যালাও করত না। মাপের জন্য নয়, ভিতরে যা আছে সিকিউরিটি স্ক্যানার আটকে যেত। আজকাল প্লেনে নেলকাটার পর্যন্ত হ্যান্ড ব্যাগে রাখতে দেয় না।

এই হোটেল উঠলে কাজকর্মেরও সুবিধে হয় হৈমন্তীর। ঘরের সঙ্গে মেকশিফট অফিস রয়েছে। সেখানে অনায়াসে তিন–জন মিলে মিটিং করা যায়। নিচে লাউঞ্জে নামতে হয় না। তার পক্ষে ঘরে বসানোও সম্ভব। তাই ফর্মাল অফিসরুমটা জরুরি ছিল। সব হোটেলে এমন পাওয়া যায় না। এই তো গতবারই ড. ভার্গব দুজনকে নিয়ে এসেছিলেন। বটানির লোক। ওরা অ্যারোমাথেরাপি নিয়ে কাজ করেন। সুগন্ধী চিকিৎসা। ওরা অফিসে বসে ল্যাপটপে প্রেজেন্টেশনও দেন। পেনড্রাইভে গোটা জিনিসটা নিয়ে গিয়েছিল হৈমন্তী। পুনেতে ফিরে শুধু নিজেরা দেখেনি, স্যাম্পেল সহযোগে বিদেশে পাঠিয়েও দিয়েছিল। কোম্পানি উৎসাহ দেখিয়েছে। বিষয়টা নিয়ে এগোতে বলেছে। কসেমেটিকসের সঙ্গে গন্ধ দিয়ে চিকিৎসার বিষয়টা বাজাকর কেমন চলবে সেটাও দেখতে হবে বলে তারা নোটে মন্তব্যও করেছিলে। অ্যারোমাথেরাপি একটা প্রাচীন বিষয়, তারপরেও ড. ভার্গব আর তার টিমের প্রেজেন্টেশনটা ছিল পরিচ্ছন্ন। অনেক কিছু অজানাও ছিল হৈমন্তীদের।

গাছের ফুল, ফল, পাতা, বীজ, বাকলে থাকে একধরনের নির্যাস। ভেপারাইজড অয়েল। এই তেলে কিটোন, কোহল, টারপিন, এস্টারসের মতো অজস্র কেমিকালস্ রয়েছে। একেক ধরনের গাছে একেকরকম। এদের ফাংশনও একেকরকম। তুলসী, কপুর্র, দারুচিনি, লবঙ্গ থেকে হরতিকি, কালমেঘে, নয়নতারা সবই এই চিকিৎসায় কাজে লাগানো হয়। এই পর্যন্ত হৈমন্তীর জানা ছিল। এই চিকিৎসা যে একসময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল তার উদাহরণগুলো জানা ছিল না। তার একটা দুটো শুনে তো ল্যাবরেটরির ছেলেমেয়েরা তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম ফাউন্ডার ছিলেন হিপোক্রিটাস্। তিনি বলেছিলেল, নিয়মিত এই ধরনের সুগন্ধী তেল মেখে স্নাল করলে নানা রোগ এড়িয়ে

থাকা যায়। এথেন্স থেকে প্লেগের মতো মহামারীকে নির্মূল করতে হিপোক্রিটাসের এই পরামর্শ নাকি খুব কাজে দিয়েছিল। ক্যাসিয়া, শিবামনের মতো তেল ব্যবহার করা হতো। এমনকী রোমের মানুষ মন খারাপ হলে সুগন্ধী তেল ব্যবহার করতেন। হৈমন্তী এই জায়গাটা ধরেছে। তার ল্যাবরেটরিতে ল্যাভেন্ডার, সেডার উড, সাইপ্রেস নিয়ে কাজ চলছে। দেখা হচ্ছে, সুগন্ধ কী ভাবে আলফা তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে মস্তিস্কে প্রভাব ফেলতে পারে।

হৈমন্তীর মোবাইল বেজে উঠল। হৈমন্তী টেবিল থেকে ফোন তুলে নম্বর দেখল। চিনতে পারল না। ল্যান্ডফোনের নম্বর। ফোন কানে নিতে ওপাশের পুরুষকণ্ঠ বলল, 'এসে গেছ?'

হৈমন্তী বলল, 'এসেছি। কিন্তু তুমি তো ফোন করবে না বলেছিলে।'

পুরুষকণ্ঠ বলল, 'বাইরে থেকে করছি। বুথ থেকে।'

হৈমন্তী বলল, 'তোমাদের এখানে এখনো টেলিফোন বুথ রয়েছে!'

পুরুষকণ্ঠ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দু–একটা আছে। এটা একটা জেরক্সের দোকান। ফঁাকা বলে ঢুকেছি। যাক, ওসব কথা ছাড়, তুমি তৈরি?'

হৈমন্তী বিছানার বসে বলল, 'তুমি যে লিস্ট দিয়েছো, সবাই আসছে?'

পুরুষকন্ঠ বলল, 'আসবার তো কথা। তুমিও তো লিস্ট শুনেছো।'

হৈমন্তী বলল, 'ওই পুলিস অফিসার?'

পুরুষকণ্ঠ বলল, 'দুজন আসবে বলে আমি জানি। একজন হাফ পুলিশ।'

হৈমন্তী শার্টের বোতাম খুলতে লাগল।

'হাফ পুলিশ আবার কী ব্যাপার।'

পুরুষকণ্ঠ বলল,'ফরেন্সিক না কোথায় যেন কাজ করত।'

হৈমন্তী গা থেকে শার্ট খুলে পাশে ফেলে দিল। বলল, 'ইন্টারেস্টিং।'

পুরুষকণ্ঠ একটু চুপ করে বলল,'আর একবার ভেবে দেখ হৈমন্তী, এই সিচ্যুয়েশনে কাজটা করা ঠিক হচ্ছে কী?'

হৈমন্তী সহজ ভাবে বলল,'কাজ তো আমি করছি না।'

পুরুষকণ্ঠ বলল, 'তাহলে কে করছে!'

হৈমন্তী সহজভাবে বলল, 'কেউ করছে না। নিজে থেকেই হবে। সবথেকে বড় কথা একজন বড় পুলিশ অফিসারের সামনেই ঘটবে। অথচ বোঝা যাবে না। এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে?'

পুরুষকণ্ঠ থমকে গেল হতচকিত গলায় বলল,'মানে কী! কী বলছো এসব!'

হৈমন্তী উঠে দাঁড়াল। হ্যান্ডব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালা ঘুরিয়ে বড় ব্যাগটা খুলতে খুলতে বলল, 'মানে জানবার কোনো প্রয়োজন তোমার নেই। তুমি শুধু আমাকে বল, ভুল হচ্ছে না তো? লোক একই তো?'

'তোমাকে ফটো পাঠিয়েছি। তুমি তো নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

হৈমন্তী বলল, 'ফটো অনেকটা মিললেও, নাম তো মিলছে না।'

'একই লোকের দুটো নাম থাকতে পারে না?'

হৈমন্তী ব্যাগ থেকে একটা একটা করে পোশাক বের করতে লাগল। একপাশের কাপড়ে মুড়ে রাখা ছোট্ট শিশিটাও বের করল। একবার চোখের সামনে তুলে ধরে টেবিলের ড্রয়ার খুলে সাবধানে রাখল। ফোনটা বাঁ কাঁধে চেপে ধরে বলল, 'একবার আসবে নাকি? লাঞ্চের আগে একটু আদর নিতাম।'

ওপাশের পুরুষকণ্ঠ বলল, 'খেপেছো। তোমার হোটেলের সর্বত্র সিসি টিভির ক্যামেরা রয়েছে।'

হৈমন্তী হেসে বলল, 'তাহলে তুমি ধরেই নিয়েছো আমি ধরা পড়ব এবং তারপর সিসিটিভির ছবি দেখে পুলিশ তোমাকেও ধরবে? তাই তো?'

পুরুষকণ্ঠ থতমত খেয়ে বলল,'নানা, তা বলিনি। সাবধান হলে দুজনেরই সুবিধে।'

হৈমন্তী 'খিলখিল' আওয়াজে হেসে বলল, 'আপাতত আমার একটাই সুবিধে সোনা। একজন পুরুষমানুষ এসে আমাকে স্ট্রেস ফ্রি করে দিক। লম্বা ফোর প্লে এবং সেক্স অ্যাক্টের পর ক্লান্ত হয়ে আমি খানিকটা ঘুমোতে চাই।'

পুরুষকণ্ঠ বলল, 'ঠাট্টা করছো? ওসবের অনেক সময় পাওয়া যাবে। দিস ইজ নট দ্য প্রপার টাইম। আমি ফোন ছাড়ছি। তোমার সঙ্গে দেখা হবে। টেক কেয়ার।'

পুরুষমানুষটি ফোন রেখে ফোন কাম জেরক্সের দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল। দোকানে বসা অল্প বয়সের ছেলেটি দেখল, ফোন ছেড়ে বেরোনো কাস্টমারেরর গাড়ির নম্বরটা মজার তো! ১২৩৪৫। ছেলেটি হাতের মোবাইল দিয়ে ফট্ করে একটা ফটো তুলে ফেলল। পুরুষটি জানতেও পারল না, ছবিতে সেও রয়ে গেল। দোকানের ছেলেটি মোবাইল থেকে ছবিটা পাঠাল তার বান্ধবী ফুচির কাছে। মিনিটখানেক পরে নম্বর টিপল।

'ফুচি, দেখলে?'

'কী দেখব?'

'গাড়ির ছবি যেটা পাঠালাম। মজার নম্বর না?'

ফুচি গলায় বিরক্ত এনে বলল,'গাড়ির নম্বর মজার হোক আর দুঃখের হোক, তোমার কী শশা?

শশা বলল, 'আরে বাবা আমিও একদিন গাড়ি কিনব।'

ফুচি ধমক দিল, 'চুপ করো। বাবার জেরক্সের দোকানে বসে ফুটানি দিও না। ফোন ছাড় দেখি।'

এই সময়ে বাথরোব গায়ে জড়িয়ে বাথরুমে ঢোকবার জন্য তৈরি হয়েছে হৈমন্তী। সে গুনগুন করে গানও ধরেছে। ভাবটা এমন যেন সে খুবই স্বাভাবিক। আবার ফোন বেজে উঠল। হৈমন্তী ঝুঁকে পড়ে নম্বর দেখে ফোন ধরল।

'বল পূরবী।'

'মাডাম, ঠিক করে পৌছেছেন আশা করি।'

'হ্যাঁ তোমার ওখানে সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম। দুটো গুড নিউজ আছে।'

'বল।'

'ম্যাডাম, আমাদের সেই অ্যারোমাথেরাপিক কাজটা কোম্পানি সম্ভবত পার্শিয়ালি অ্যাপ্রুভ করতে চলেছে। কানাঘুষোয় শুনলাম। আপনি ফিরলে অ্যানাউন্স করা হবে।'

‘ভেরি গুড। একাজে কৃতিত্ব সবথেকে বেশি তোমার পূরবী। তুমি খুব খেটেছিল।’

‘থ্যাঙ্কু ম্যাডাম। আর নেক্সট গুড নিউজটা হল, আজ সকালে সালফিউরিক অ্যাসিড আর কার্বলিক অ্যাসিডের মিক্সচারের শিশিটা খুঁজে পেয়েছি।’

হৈমন্তী ফোন চেপে ধরে বলল, ‘সেকী! আবার হারিয়েছিলে?’

পূরবী হালকা গলায় বলল, ‘না ম্যাডাম, আমারই ভুল হয়েছিল। অন্য আলমারিতে খুঁজছিলাম।’

হৈমন্তী ভুরু কুঁচকে, চিন্তিত গলায় বলল, ‘খুব সাবাধানে রাখবে। ওই কনসেনট্রেশনটা যেমন দামী তেমন পয়েজনাস। তুমি তো জানো। কয়েক ফোঁটাই যথেষ্ট।’

22

হৈমন্তী বাথরুমে পা রাখতে না রাখতে খাটের ওপর ফেলে রাখা মোবাইলটা আবার বেজে উঠল।

‘ধরব না’ ভেবেও ফিরে এল হৈমন্তী। আবার অচেনা নম্বর। এটাও ল্যান্ড ফোন। ফোন কানে নিল। গলা চিনতে পারল।

‘আবার কী হল?’

ওপারের পুরুষকণ্ঠ বলল, ‘বাদ দাও হৈমন্তী। আমার কেমন ভয় করছে।’

হৈমন্তী বলল,‘তোমার ভয় লাগার কী হয়েছে? তুমি তো কনসার্নড নও। কাজটা তো তুমি করবে না।’

‘তা হোক। এভাবে…রিস্ক থেকে যাচ্ছে।’

হৈমন্তী বলল, ‘রিস্ক তো থাকবেই। এরকম একটা ঘটনায় রিস্ক থাকবে না তো কী থাকবে। এটা তো কোনো নতুন কথা নয়। যখন ভেবেছিলাম, তখন রিস্ক আছে জেনেই ভেবেছিলাম। তুমিও জানতে।’

‘অন্য কোনোদিন…অন্য কোনোভাবে।’

হৈমন্তী বিরক্ত গলায় বলল, ‘না, এবারই। সব সাজানো হয়ে গেছে। হৈমন্তী কখন পিছিয়ে যায়নি। আর কী ভাবে কাজটা করব তুমি জানলে কী করে?’

ওপাশের পুরুষকণ্ঠ এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল,'আমি নেই।'

হৈমন্তী মুচকি হেসে বলল, 'নো নিড। তুমি থাকা না থাকায় কী আসে যায়? তোমাকে নিয়ে তো আমি ভাবিনি। ফোন রাখছি, আমি স্নানে ঢুকব।'

পুরুষকণ্ঠ গলায় আকুতি এনে বলল, 'হৈমন্তী, প্লিজ শোনো, বিষয়টা বোঝবার চেষ্টা কর। ওখানে অনেকে থাকবে। আমরা সবার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। ইমপসিবল।'

হৈমন্তী কড়া গলায় বলল, 'আমার আসছে কোথা থেকে? আর আলোচনাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? ফোনে এই ধরনের আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে কি? বিপদ তোমারই হবে।'

'চিন্তা নেই, পোস্টাপিস থেকে করছি।'

হৈমন্তী খানিকটা অবাক হয়েই বলল, 'কলকাতার পোস্টাপিস থেকে এখনও ফোন করা যায়? ওসব তো প্রাচীনকালে হত। তুমি দেখছি আজ শহরের কোনো বুথ বাকি রাখবে না।'

'ওসব কথা বাদ দাও। তুমি প্ল্যান ক্যানসেল কর হৈমন্তী। যত সময় যাচ্ছে আমার মনে বলছে, ভুল হচ্ছে।'

হৈমন্তী সামান্য হেসে বলল,'তুমি প্ল্যানটাই তো জানও না। তার আবার ঠিক ভুল কী করে বুঝবে?'

'কী প্ল্যান?'

হৈমন্তী একটু ভেবে বলল, 'ফোনে বলা যাবে না।'

পুরুষকণ্ঠ উত্তেজিত ভাবে বলল, 'আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। তোমার হোটেলের কাছেই আছি আমি।'

হৈমন্তী ব্যঙ্গের হেসে বলল, 'হোটেলের সিসিটিভি? তোমার ফটো তোলা থাকবে যে।'

পুরুষকণ্ঠ আরও উত্তেজিত ভাবে বলল, 'নিকুচি করেছে তোমার সিসিটিভি। আই ডোন্ট কেয়ার।'

হৈমন্তী ঠাট্টার গলায় বলল, 'এই তো সাহসী প্রেমিকের মতো কথা।'

'আমি সবসময়ই সাহসী।'

হৈমন্তী বলল, 'সে তোমার সঙ্গে শোওয়ার সময়েই বুঝতে পারি।'

'এসব বাজে কথা বাদ রাখ। আমি আসছি। এসে তোমাকে বোঝাচ্ছি।'

হৈমন্তী ফিসফিস করে বলল, 'এস আমি বাথটাব রেডি করছি। তুমিও আমার সঙ্গে জলে শোবে। তারপর না হয় বুঝব।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে হৈমন্তী বাথরুমে গেল। বাথটাবের কলগুলো খুলে দিল। বাথটবে শুয়ে না থেকে পুলে গেলে ভাল হত। অনেকদিন সাঁতার কাটা হয়নি। যে কোনও টেনশনের আগে খানিকটা এক্সারসাইজ ভাল। অ্যাড্রিনালিন রিলিজ হয়। যদিও এখন আর তার কোনো টেনশন হয় না। টেনশন করবার জীবন হৈমন্তী আগেই শেষ করে এসেছে। কর্মজীবন অভ্যেসের, অভিজ্ঞতার। মেধা, লেখাপড়া তাকে কাজ শিখিয়েছে। তাই সে জীবনে ভাবনা থেকেছে, টেলশন থাকেনি। নোংরা মানুষের প্রতি কেমন করে কঠিন আচরণ করতে হয় তা যেমন শিখেছে, তেমনই শিখেছে গুণের কদর করতে।

টিম নিয়ে চলতে গিয়ে সমস্যা হয়েছে, আবার টিমই সমাধান করেছে অনেক জটিলতার। তাই এসব হৈমন্তীর কাছে কোনো ভাবনাই নয়। ঐন্দ্রিল এবং তুষারের ধাক্কাই তাকে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত করে তুলেছে। সহজ, সরল অথচ গভীর ভালবাসার সুযোগ নিয়ে তাকে যেভাবে প্রতারণা করা হয়েছে সেই অপমান হৈমন্তী সারাজীবন বহন করে চলেছে। ভুলতে চেয়েছে বারবার। পারেনি। উলটে অপমান ক্রোধে পরিণত হয়েছে। সেই ক্রোধের চরিত্র বড় অদ্ভুত। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, সুযোগ পেলেই ভিতরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

ঐন্দ্রিল আর তুষার তাকে যেমন প্রেমে অবিশ্বাসী হতে শিখিয়েছে, তেমনই ভিতর থেকে শক্তও করেছে। বিশেষ করে ঐন্দ্রিল। কিশোরীবেলা থেকে যত্নে লালন করা ভালবাসাকে পায়ে ফেলে পিষেছে যেন। সরল মুগ্ধতার সুযোগ নিয়েছে। রেপ ছাড়া তাকে আর কী–ই বলা যায়? হ্যাঁ, রেপই তো। শরীরে যেমন, মনকেও চরম অপমান। তুষারও কম কিছু নয়। সিরিয়াস প্রেম করেছে। ঘর পোড়া হৈমন্তী সতর্ক থাকায় শরীর পায়নি, কিন্তু ভালোবাসা পেয়েছে। বাবা–মায়ের শর্তে সেই ভালবাসাকে তুচ্ছ করতে একটুও সময় নেয়নি তুষার। শিক্ষিত, মেধাবী প্রেমিকা কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ির 'দাসী' বানানোর প্রস্তাব দিতে গলা কাঁপেনি তার। সারাদিন রান্নাঘরে বসে বাবা–মায়ের সেবা করবে, রাতে আমার সেবা করতে আসবে বিছানায়—এটাই যেন তার কথা ছিল। ঘরের বৌ বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারবে না। পরিবারে নাকি এমনটাই নিয়ম। এও

ভংয়কর অপমান। এরপর পুরষমানুষকে ঘেন্না করলে হৈমন্তীকে কি দোষ দেওয়া যেত? মনে হয় না। হৈমন্তী কি তাই করে? মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই। এখনও তার একাধিক পুরুষসঙ্গী। অন্তত তিনজন বটেই। ইচ্ছে হলে কারও সঙ্গে বেড়াতে যায়, কারও সঙ্গে যায় রেস্টুরেন্টে খেতে, কারওকে বিছানায় ডেকে নেয়। তিনজনই ভাবে ভালবাসা। হৈমন্তী জানে, ভালবাসা হোক অথবা না হোক, আসলে এটা তার একটা খেলা। নির্মম খেলা। এই খেলা সে নিজেই তৈরি করেছে। তিনজনই তার কাছে নিচু হয়ে থাকে। কেউ তার বুদ্ধি আর শিক্ষা, কেউ আবার বড় চাকরি, কেউ বা তার রূপের কাছে বশ্যতা মেনেছে। হৈমন্তী এই খেলায় পুরুষমানুষকে নেড়েঘেঁটে দেখতে চায়। অপমানও করে, ঘেন্না করে বুঝতে দেয় না। নিজের ভিতরে সে প্রতিশোধের তৃপ্তি পায়। এই খেলা সে মন দিয়ে খেলে। তারপরেও কখনও ক্লান্ত লাগে, লাগে একা। আয়নার সামনে দঁাড়িয়ে কথা বলে নিজের সঙ্গে। ভিতর আর বাইরের হৈমন্তী।

বাইরে থাকা হৈমন্তী জিগ্যেস করে, 'কেমন আছ হৈমন্তী ?'

আয়নার ভিতরে থাকা হৈমন্তী উত্তর দেয়, 'ভাল নেই হৈমন্তী।'

বাইরের হৈমন্তী বলে, 'কেন? কেন ভাল নেই? কত সুন্দর দেখতে তোমাকে! পুরুষমানুষরা তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকে। তুমি কেন ক্লান্ত হবে?

আয়নার হৈমন্তী ভিতর থেকে বলে ওঠে, 'অসহ্য লাগে। এই অভিনয়, এই খেলা অসহ্য লাগে। ঠকতে ঠকতে আমি ক্লান্ত হৈমন্তী।'

যাই হোক, এই তিন পুরুষের একজন সমস্যা করছে। বিবাহিত এই পুরুষের সমস্যা একটু জটিল। সে হৈমন্তীকে বিয়ে করবার জন্য পাগলামি শুরু করছে। এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, বিয়ের জন্য সে তার স্ত্রীকে ডিভোর্সও করতে পারছে না। যেদিন সেই পুরুষ এই কথা বলে হৈমন্তী খুব অবাক হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা হৈমন্তীর পুনের ফ্ল্যাটে সে এসেছিল। হৈমন্তীই তাকে থেকে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। এই লোক অন্যদিন তাও একটু আধটু গাঁইগুঁই করে। পরদিন মিটিং, সাইট ভিজিট, অডিট—এইসব ফ্যাকড়া তোলে। সেদিন এককথায় রাজি হয়ে গেল।

হৈমন্তীও সেদিন শরীর চাইছিল। একটু হাত ধরা, একটু চুমু খাওয়া, অথবা একটু বুকের ছোঁয়া নয়, উন্মাদের মতো শরীর চাই। বাঁধ ভাঙা শরীর। যেন পুরুষের আদরে সোহাগে নিজেকে দুনিয়ার সেরা মানবীর মতো নয়, লাগে সেরা মানুষের লাগবে। ঘামে, ক্লেদে, নিঃশ্বাসে শরীরে শরীর মিশিয়ে যেন চিৎকার করে উঠতে পারে।

'স্কাউন্ড্রেলের দল, তোমরা দেখে যাও। আমি কী পারি তোমরা দেখে যাও। হে পুরুষ, হাঁটু মুড়ে বস আমার সামনে। হাত তুলে আমার কাছে সোমরস ভিক্ষা কর।'

বিয়ার খেতে খেতে সেদিন সেই লোককে হৈমন্তী বলেছিল, 'জামা কাপড় খুলে ফেল। তোমাকে নগ্ন দেখতে ইচ্ছে করছে। আই ওয়ান্ট টু সি ইউ ন্যুড।'

'তুমি?'

'না। আমি পোশাক পরেই থাকব।'

23

পুরুষটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেছিল, 'তা কী করে হয়! আমি শুধু জামাকাপড় খুলব?'

হৈমন্তী বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'কেন, হবে না কেন? তোমার কি মেল শভিনিজ্‌মে লাগছে?'

'তা বলিনি।'

হৈমন্তী ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'আসলে কী জানো, পুরুষমানুষের কামনাকে প্রাধান্য দেওয়াটাই নিয়ম হয়ে গিয়েছে। সে যখন তার স্ত্রী বা প্রেমিকাকে নগ্ন দেখতে চাইবে, মেনে নিতে হবে মাথা পেতে। শুধু স্ত্রী আর প্রেমিকা কেন? পয়সা দিয়ে কোনো নারীর কাছে গেলেও এক মানসিকতা। পুরুষ নারী শরীরকে যেভাবে চাইবে সেটাই। কেন?'

পুরুষটি হাসবার চেষ্টা করে। বলে, 'তুমিও তো ফেমিনিস্টদের মতো কথা বলছো। পুরুষবিদ্বেষী।'

হৈমন্তী বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিয়ে বলল, 'ফেমিনিজিম মানে পুরুষহবিদ্বেষী কে বলল? সম অধিকারও তো হতে পারে। তুমি যদি তোমার সেক্সকে নানা ভাবে এনজয় করতে চাও, আমারও সে অধিকার রয়েছে। তাই নয় কী? কথাটা পুরোনো বলে এড়িয়ে যেতে পারও তাতে ফল হবে না কিছু। তোমরা মেয়েদের ইচ্ছে, অনিচ্ছে, তৃপ্তি অতৃপ্তি নিয়ে চিন্তিত নয়। প্রয়োজনও বোধ করও না। কারণ নেচার এমন ভাবে পুরুষের শরীর তৈরি করেছে যে তার স্যাটিসফ্যাকশনের কখনই নারীর স্যাটিসফ্যাকশনের ওপর নির্ভরশীল নয়।'

হৈমন্তী মদ বেশি খায় না। পার্টিতে লিমিটের মধ্যে থাকে। বাড়িতে খেলে হয়তো কোনও কোনওদিন একটু বেশি নিয়ে ফেলে। সেদিন যেমন দুটো শেষ করে তিন নম্বরে হাত বাড়িয়েছিল। নেশাও হতে থাকে। সেই নেশা জমাতে তিন নম্বর ক্যানও গলায় উপুড় করে নিয়েছিল।

'যদি মিস্টার গড, এমন ভাবে পুরুষমানুষের শরীরের কলকব্জা বানাতেন যাতে পাশে শুয়ে থাকা মেয়েটির ইচ্ছে ছাড়া কোনও ফাংশন অন হবে না, তাহলে কী হতো একবারে ভাবতে পারছো স্যার? ক্যান ইউ ইমাজিন? হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কঁকিয়ে মরতে হতো তোমাদের। দাস হয়ে থাকতে সব। স্লেভ।'

কথা শেষে জোরে হেসে উঠেছিল হৈমন্তী।

'তুমি টিপসি হয়ে যাচ্ছো হৈমন্তী?'

হৈমন্তী বলল, 'এনি প্রবলেম? তোমার কোনো সমস্যা আছে।'

'না না আমার কী সমস্যা? হৈমন্তী তোমাকে একটা সিরিয়াস কথা বলতে চাই।'

হৈমন্তী চতুর্থ ক্যান খুলে বলল, 'বল। তোমাদের সিরিয়াস কথায় আমার মজা লাগে। জোকস বলে মনে হয়।'

পুরুষমানুষটি হৈমন্তীর কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, 'তোমাকে আমি ভালবাসি হৈমন্তী।'

হৈমন্তী অবহেলায় বলেছিল, 'তাই!'

'তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

হৈমন্তী এই কথার কোন জবাব না দিয়ে চতুর্থ ক্যানটিও শেষ করতে থাকে।

'সত্যি বলছি হৈমন্তী। আই হ্যাভ ডিসাইডেড। আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

হৈমন্তী বলল, ‘তা কর। সমস্যা কী?’

‘তুমি রাজি আছ?’

হৈমন্তী সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

‘আমি তো কোনওদিনই এই ধরনের প্রস্তাবে আপত্তি করিনি। আমার অতীত তো তুমি জান। জান না? তখনও আমি কোনো কথা বলিনি। দুজনেই অপমান করল। ভালোবেসে ফেলেছিলাম বলে ঠকালও।’

সেই পুরুষ হৈমন্তীর কাছ ঘেঁষে আসে। বলে, ‘আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না। চাই না বলেই তোমাকে বিয়ে করতে চাই।’

‘অতি উত্তম প্রস্তাব। তাহলে বউকে ডিভোর্স দাও।’

পুরুষটি বলে, ‘এটাই তো সমস্যা হৈমন্তী। ওকে আমি ডিভোর্স দিতে পারব না।’

হৈমন্তী ঢুলু ঢুলু চোখে বলল,’বউকে ডিভোর্স না দিলে আমাকে বিয়ে করবে কী করে! দুটো বউ রাখবে?’

‘জানি না।’

হৈমন্তী ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করেছিল, ‘ডিভোর্স দিতে পারবে না কেন?’

পুরুষ আমতা আমতা করে উত্তর দিয়েছিল, ‘বিয়ের সময় আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম।’

হৈমন্তীর নেশা যেন আরও চড়ল। বলল, ‘সে আবার কী! কীসের প্রতিশ্রুতি? ডিভোর্স করতে পারবে না? এমন প্রতিশ্রুতি হয় নাকি?’

‘না তা নয়। আমি লিখে দিয়েছিলাম, যদি কোনওদিন ছাড়াছাড়ি হয়, আমি কমপেনশেসন হিসেবে ফ্ল্যাট, গাড়ি, ব্যাঙ্কের সঞ্চয়ের সিংহ ভাগটা দিতে বাধ্য থাকব। আমি তো নিঃস্ব হয়ে যাব।’

হৈমন্তী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,’ইমপসিবল্। এমন কন্ডিশন আবার হয় নাকি? এর কোনো লিগাল জাস্টিফিকেশন নেই। এমন উদ্ভট একটা শর্তে তুমি গিয়েছিলেই বা কেন?’

পুরুষটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ‘ভুল করেছিলাম হৈমন্তী। গ্রেট মিসটেক। সেদিন আবেগের বশে কোর্ট পেপারে সই করেছিলাম। এই কাগজ লিগ্যাল নয় সেটা প্রমান করতে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে

হবে। আমি বিশ্রী ভাবে আটকে গিয়েছি। হৈমন্তী তুমি একটা ব্যবস্থা কর।' কথা শেষ করে পুরুষটি দু'হাতে মুখে ঢেকে বসে থাকে।

হৈমন্তী বলে, 'কী ব্যবস্থা করব?'

পুরুষটি চুপ করে থেকে নিচু গলায় বলেছিল, 'আমি জানি না। একমাত্র পথ ও যদি নিজে থেকে সরে যায়।'

হৈমন্তী ঠান্ডা ভাবে বলে, 'কথা বল।'

'লাভ হবে না। আমার কাছে যুক্তি নেই। কী বোঝাব?'

হৈমন্তী কাঁধ ঝাকিয়ে বলে, 'কেন? আমাকে বিয়ে করবে এটাই কি যথেষ্ট যুক্তি নয়?'

পুরুষটি বলে, 'কে বোঝাবে? রাজি হবে কেন?'

হৈমন্তী অবাক গলয় বলে,'হবে নাই বা কেন? স্বামী আর এক মহিলার সঙ্গে থাকতে চাইছে এটা তো একজন স্ত্রীর পক্ষে অপমানের। নয় কী?'

পুরুষটি বলল, 'সবাই তোমার মতো নয় হৈমন্তী। ঐন্দ্রিলের বেলায় তুমিই টাকা দিয়েছিলে।'

হৈমন্তী বলল, 'তুমিও গাড়ি, বাড়ি, টাকা স্যাকরিফাইজ কর।'

'অত টাকা!'

হৈমন্তী বলল, 'তাহলে আমাকে ত্যাগ কর।'

পুরুষটি হাত বাড়িয়ে হৈমন্তীর হাত চেপে ধরেছিল।

'আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না হিমি। আই কান্ট। এই মিথ্যে দাম্পত্য আমাকে প্রতি নিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছে।'

হৈমন্তী একটু ভেবে বলেছিল, 'কী চাইছো? স্পষ্ট করে বল।'

'তুমি একটা পথ বের কর হৈমন্তী।'

হৈমন্তী গলা নামিয়ে বলে, 'কীসের পথ?'

পুরুষটি চকচকে চোখে বলল, 'বুঝতে পারছো না? আমাদের একসঙ্গে থাকবার পথ।'

হৈমন্তী চোখ সরু করে বলল, 'আমাকে ভাবতে দাও।'

'ভাবতে দাও' নয়, হৈমন্তী বলতে চেয়েছিল 'জানতে দাও'। এই পুরুষটি তাকে বিয়ে করতে কেন এত উতলা? কেনই বা তার কাঁধে বন্দুক রেখে বউয়ের দিকে গুলি চালাতে চাইছে? কে জেনে দেবে? সমস্যা নেই। তিনজন পুরুষের বাকি দু'জন তো রয়েছে। তারা কাজ করবে। এদেরই একজন সুশান্ত। সেই সুশান্তর সঙ্গে একদিন ডিনারে বসল হৈমন্তী। কবে যেন আড্ডার সময় শুনেছিল, সুশান্তর কোন এক বন্ধু কলকাতা ইনসিওরেন্স কোম্পানির বড় পোস্টে রয়েছে। শুরুটা ইনসিওরেন্স অফিস বা ব্যাঙ্ক থেকে করাই উচিত।

'সুশ্, একটা নাম আর অ্যাড্রেস দেব। তার বা তার স্ত্রী ইনসিওরেন্স অ্যামাউন্টগুলো জেনে দিতে হবে।'

'মি, কাজটা খুব জটিল। তাও চেষ্টা করব।'

সুশান্ত চেষ্টা শুধু করেনি, কাজটা করেও দিয়েছিল। শুনে অবাক হয়েছিল হৈমন্তী। এরপরে আরও খোঁজ পায়। ব্যাঙ্কে রাখা টাকা, ফ্ল্যাট, গাড়ির সব। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল হৈমন্তীর। অতীতের আগুন, অপমানের আগুন। সে ফোন করে। কথা বলে ঠান্ডা গলায়।

'আমি তোমার স্ত্রীকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। '

পুরুষকণ্ঠ একই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত এবং উত্তেজিত হয়ে বলে, 'করবে? কীভাবে? ওকে বোঝাবে?'

হৈমন্তী দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, 'সে জেনে তোমার দরকার কী? পরে আমাকে বিট্রে করবে না তো?'

'কী বলছো হিমি। আমিই তো তোমাকে বলেছিলাম...। ও কি ডিভোর্স করতে রাজি হবে?'

হৈমন্তী দাঁতে দাঁত চেপে হেসে বলেছিল, 'তাতে তো শুধু আমাকে পাবে, আমি আরও বেশি করব।'

'হিমি! কী বলছো!'

হৈমন্তী বলল, 'কী বলছি তুমি বুঝতে পারছো। মনে রাখবে, টাকা পয়সা ফ্ল্যাট গাড়ি সব ফিফটি ফিফটি ভাগ হবে। না, গাড়ি আমার লাগবে না। ফ্ল্যাটটা আমাকে দিও। ওটা আমার পছন্দ। নতুন ফ্ল্যাট। কলকাতায় আমার থাকবার জায়গা নেই।'

পুরুষকণ্ঠ কাঁপা গলায় বলল, ‘মনে হয় আমি খানিকটা আঁচ করতে পারছি।’

হৈমন্তী সামান্য হেসে বলল, ‘তোমার আঁচ করবার দরকার নেই। শুধু এটুকু মনে রেখ নরম হৈমন্তী কঠিনও হতে জানে। খুব কঠিন। আচ্ছা, একটা কথা বল তো অন্যের অপরাধের রিভেঞ্জ কি আর একজনের ওপর নেওয়া যায়? যদি সে একই অপরাধ করে?’

পুরুষকণ্ঠ বলল, ‘মানে!’

হৈমন্তী গলা আরও নামিয়ে বলল, ‘মজা করলাম।’

খুব সুইম করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু পুলে যাওয়া যাবে না। সুইম ট্রাঙ্ক নেই। সুইম ট্রাঙ্ক ছাড়া নামতে দেবে না। পুকুর বা দিঘি থাকলে এই সমস্যা হত না। সেখানে যা খুশি পরে নামা যায়। বাথ রোব খুলে ফেনা ভরা বাথটাবে গা এলিয়ে দিল হৈমন্তী। গুন গুন করে গেয়ে উঠল—

‘ফর দ্য আদার হাফ অফ দ্য স্কাই/ উওম্যান আই ক্যান হার্ডলি এক্সপ্রেস।’

24

নিজের বাড়িতে স্নান সেরে আয়নার সামনে এসে যেমন একবার দাঁড়ায়, হোটেলের এই ঘরেও হৈমন্তী এখন আয়নার সামনে।

তার গায়ে নীল রঙের তোয়ালে। একা ঘরে গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে থাকবার মেয়ে হৈমন্তী নয়। তারপরেও সে জড়িয়েছে। তার কারণ তোয়ালের রঙ। হোটেলের এই তোয়ালে নীল। গাঢ় নীল। খুব জোরে বৃষ্টির আগে যেমন মেঘ কালো হয়, তেমন বৃষ্টি ঝরে গেলে হয় ঘন নীল। একবারে সেই বালিকাবেলা থেকে নীল রঙ হৈমন্তীর পছন্দের। ড্রইং করতে বসলেই আগে নীল রঙ বের করে ফেলত। তখন আর আকাশ বা জল ছাড়া অন্য কিছু আঁকবার উপায় থাকত না। এখন যেমন তার মনে হচ্ছে, খানিকটা মেঘ গায়ে জড়িয়ে আছে।

ঐন্দ্রিলের সঙ্গে একবার পাহাড়ে গিয়েছিল। দার্জিলিঙের কাছে ঝাণ্ডিতে।

‘হিমি, আমার সঙ্গে স্পট দেখতে যাবে?’

হৈমন্তী বলেছিল, ‘স্পট! কীসের স্পট?’

ঐন্দ্রিল বলেছিল, ‘আমার সিনেমার স্পট। রেইকি করব। রেইকি জান? রেইকি হল আগে থেকে শুটিঙের জায়গা দেখা।’

হৈমন্তী উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘কোথায় যাবে?’

ঐন্দ্রিল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলেছিল, ‘আমার ছবি গল্প জানো? ’

হৈমন্তী বলেছিল, ‘জানব কী করে? তুমি বলেছ কখনও?’

কফি হাউসের মজা হচ্ছে, অনেকে এক সঙ্গে কথা বললেও সামনে বসা লোকের কথা শুনতে অসুবিধে হয় না। বরং অন্যদের কথা কানে ঢোকে না। একটা গমগমে হাউলিং সর্বক্ষণ হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে কারও অসুবিধে হচ্ছে না। মাঝেমধ্যে মনে হয়, ঘরটা বানানোর সময় নিশ্চয় কোনও সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া হয়েছিল।

‘দেখবেন স্যার, আমার কথা বলতে যেন অসুবিধে না হয়।’

সেদিন হৈমন্তী আর ঐন্দ্রিল কফি হাউসে বসেছিল। ঐন্দ্রিল মুখে একধরনের ভাবুক ভাব এনে বলেছিল, ‘আমার ছবির গল্প পুরোটাই পাহাড়ের কোনও গ্রামে। বলতে পার টোটাল আউটডোর। ইনডোরের কারবার থাকবে না। সিনেমা আউটোরই ডিমান্ড করে। এমন একটা গ্রাম ভেবেছি যেটা বেশিরভাগ সময়েই কুয়াশায় ঢেকে থাকে। সবাই কেমম আবছা, রহস্যময়। গল্পের নায়ক–নায়িকা সেখানে যাবে। আলাদা আলাদা ভাবে যাবে। একজন চা বাগানের অডিটের কাজে, একজন বোটানির এক্সকারসনে। গাছ পাতা খোঁজে। মেয়েটি এক বিকেলে কুয়াশার পাহাড়ে পথ হারাবে। চারপাশে ঘন জঙ্গল, চা বাগান। জিপ নিয়ে ফিরছিল নায়ক। নায়িকাকে দেখে গাড়ি থামায়। তাদের আলাপ হয়। সেই আলাপ কয়েকদিনের মধ্যে প্রেমে পৌছোয়।’

হৈমন্তী বলেছিল, ‘এতো তাড়াতাড়ি প্রেম! এ তো হিন্দি সিনেমায় হয়।’

ঐন্দ্রিল বিরক্ত হয়ে বলে, ‘উফ্ যা বোঝ না তা নিয়ে এধরনের কমেন্ট কোর না।’

হৈমন্তী বলল, ‘সরি। গল্পটা শেষ কর।’

ঐন্দ্রিল বলল, ‘এটা একটা মার্ডারের গল্প। মন দিয়ে শোন। কদিন পর তারা কুয়াশা ঢাকা জঙ্গলে শরীরে মিলিত হয়। ঝরে পড়া পাতা হয় তাদের মিলনের শয্যা, কুয়াশা হয় নগ্ন শরীরের আবরণ। রতি শেষে মেয়েটি জানায়, ছেলেটিকে সে বিয়ে করতে পারছে না। তার বিয়ের সব কথা পাকা হয়ে আছে। পাত্র বিদেশের পড়ায়। কলকাতায় ফিরে সে বিয়ে করে চলে যাবে। বাইরে গবেষণা করবে। ছেলেটি মেয়েটিকে গুডবাই ডিনারে আমন্ত্রণ জানায়। সংগ্রহ করে এক কঠিন বিষ। নাম জাড়ু। তিব্বতি এই বিষ জাড়ু নামের এক পাহাড়ি বনস্পতির বাকল থেকে তৈরি হয়। যে গাছ বছরের পর বছর রোদ পায় না। কুয়াশা মেখে দাঁড়িয়ে থাকে। কুয়াশা বিষকে কড়া হতে সাহায্য করে। ডিনারের সময় ছেলেটি মেয়েটির খাবারে জাড়ু মেশায়।’

হৈমন্তী বলে, ‘সেকী! মেয়েটাকে মেরে ফেলল!’

ঐন্দ্রিল হেসে বলল, ‘কী করবে? তার ভালবাসা তীব্র। সে চায় না তার প্রেমিকা অন্য কারও সঙ্গে মিলিত হোক। কুয়াশার মতো সে–ই শুধু ঘিরে রাখতে চায়।’

হৈমন্তী নাক কুঁচকে বলেছিল, ‘এটা কেমন গল্প? দর্শকরা এসব খুনোখুনি পছন্দ করবে?’

ঐন্দ্রিল আবার সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, ‘আমি দর্শকদের জন্য সিনেমা বানাব না হিমি। সিনেমা বানাব, ফেস্টিভালের জন্য। আমার নায়ক কুয়াশা মাখা বিষ দিয়ে প্রেমিকাকে খুন করবার পর কুয়াশায় মিলিয়ে যাবে। ছবির নাম দ্য মিস্ট।’

শেষ পর্যন্ত পাহাড়ে কুয়াশা দেখতে ঝাণ্ডিতে গিয়েছিল দুজনে। খরচ ঐন্দ্রিল ধার হিসেবে হৈমন্তীর কাছ থেকে নিয়েছিল।

‘চিন্তা কোর না। প্রোডিউসার টাকা দিলেই ফিরিয়ে দেব।’

হৈমন্তী চিন্তা করেনি। দুটো দিন কুয়াশা আর মেঘ মেখে সব ভুলে গিয়েছিল। টাকাপয়সা তো কোন ছাড়। তোয়ালেটা বুকের ওপর আলতো করে পেঁচিয়ে নিয়েছে হৈমন্তী। বুক থেকে কোমরের সামান্য নীচ পর্যন্ত ছাড়া শরীরের সবটাই অনাবৃত। ঘাড়ে, কাঁধে, উরুতে জলের গুঁড়ো। তাকে স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। মেয়েদের

সাধারণত স্নানের পর স্নিগ্ধই দেখায়। হৈমন্তীকে যেন বেশি দেখাচ্ছে। কে বলবে এই সুন্দরী এক গভীর ষড়যন্ত্রে মেতেছে?

হৈমন্তীর হাতে ড্রায়ার। চুল শুকোচ্ছে। সেই পর্ব মিটলে উঠে পড়ল। ট্রলি ব্যাগ টেনে টুকটাক কিছু জিনিসপত্র বের করে টেবিলে রাখল। কিছু কসমেটিকস্, কটা ঘরে পরবার জামা পায়জামা, মোবাইল ফোনের চার্জার। তারপর একটা কাপড়ের ভঁাজ থেকে বের করল একটা বাক্স। মাঝারি মাপের বাক্স। এই জিনিসটার জন্যই তাকে এত বড় একটা ব্যাগ এনে প্লেনের লাগেজে তুলতে হয়েছে।

মোবাইল বাজছে। ঝুঁকে পড়ে নম্বার দেখল হৈমন্তী।

'মাই ডিয়ার, তোমার ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছি।'

ওপাশ থেকে মুকুর উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'সবাইকে এক এক করে জেন্টল রিমাইন্ডার পাঠাচ্ছি। কাউকে ফোনে, কাউকে মেসেজে। তোর নাম একেবারে শেষে রেখেছিলাম।'

হৈমন্তী বলল, 'শেষে! তার মানে? কীসের শেষে? ফ্ল্যাটের নাম দিলাম আমি, আর আমার নামই একেবারে শেষে?'

মুকুর হেসে বলল, 'আরে বাবা, শেষে মানে লিস্টে লাস্ট নাম। কলকাতায় এসেছিস?'

হৈমন্তী বলল, 'কলকাতায় যাব না।'

মুকুর আঁতকে উঠে বলল, 'মানে, আমার ফ্ল্যাটের পার্টিতে তুই আসবি না!'

হৈমন্তী বলল, 'ভাবছি। যার নাম দিয়েছি দ্য ড্রিম, তার কাছে গেলে যদি ড্রিম ভেঙে যায়? ভয় করছে।'

মুকুর বলল, 'ফাজলামি রাখ। কোন ফ্লাইটে কলকাতায় আসছিস বল।'

হৈমন্তী বলল, 'কী হবে গিয়ে? পার্টিতে ইন্টারেস্টিং কেউ তো আসছে না। হ্যান্ডসাম কোনও পুরুষ মানুষ? যার গায়ে ঢলে পড়লে এক্সাইটমেন্ট হবে।'

মুকুর বলল, 'বাবা, তোর হল কী হৈমি! গায়ে ঢলে পড়বার জন্য একেবারে পুরুষ মানুষ খুঁজছিস যে বড়? আমার হাজব্যান্ড তো থাকবে। হি ইজ স্মার্ট এনাফ।'

হৈমন্তী বলল, ‘সুনন্দ দেখতে ভাল, তবে বড্ড বউ নেকু।’

‘বউ নেকু! সে আবার কী!’

হৈমন্তী বলল, ‘মানে জানি না। তবে দেখলে মনে হয়, বউয়ের জন্য গদগদ।’

মুকুর বলল, ‘তুই ওকে কোথা থেকে দেখলি।’

হৈমন্তী সহজ ভাবে বলল, ‘কোথায় আবার ? তোর ফেসবুকে। কখনও কোমর জড়িয়ে, কখনও হাত ধরে, কখনও কাঁধে মাথা রেখে তোরা কম আদিখ্যেতা করিস না। শুধু বেডরুমের ছবি বাদ দিয়ে সবই তো পোস্ট করেছিস। নানা, ও আমার চলবে না। সুনন্দ ক্যানসেল। পার্টিতে আর কে আসছে বল। পুরুষ মানুষের কথা বলবি।’

মুকুর হেসে বলল, ‘ফটো সবসময়ে সত্যি নাকি? ওসব তো ফর শো-ও হতে পারে।’

হৈমন্তী বলল, ‘ফর শো হোক আর না হোক, আমি ওতে নেই। নতুন কে আসছে বল, একটা স্লিট যা বেছে রেখেছি না দেখলে তোর মাথাও ঘুরে যাবে। একবারে কোমর পর্যন্ত চেরা। আর একটু ওপরও হতে পারে। সাদার ওপর ব্ল্যাক স্ট্র্যাপ, ওপরে কালো টপ। সেই কারণেই পুরুষমানুষের খোঁজ করছি।’

মুকুর বলল, ‘ছবি দেখেই সুনন্দকে বউ নেওটা বলছিস? আড়ালে কী করে বেড়াচ্ছে কে জানে বাপু। অফিসের কাজ বলে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, কাকে প্রেমিকা ঠাউরেছে তার ঠিক আছে। তোর পুনেও তো যায়।’

হৈমন্তী বলল, ‘তোর আর চিন্তা কী? তুই তো বলেছিস ইনসিওরেন্স থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকউন্টেসের সব টাকাই নিজের নামে লিখিয়ে রেখেছিস্, বলিস না।’

‘আমি কি তোর মত বুদ্ধিমতী হৈমী ? সুনন্দকে যতই ভালবাসি, নিজেরটুকু সামলে রেখেছি।’

হৈমন্তী বলল, ‘বেশ করেছিস। এবার দ্য ড্রিমের পার্টির লিস্ট বল।’

মুকুর বলল, ‘সব আসবে। সংসারী, অবিবাহিত, ডিভোর্স, লিভ টুগেদার। পুলিশ অফিসারও পাবি। তবে তিনি কি আর তোর গায়ে ঢলে পড়বেন?’

হৈমন্তী বলল, ‘তাহলে তো ইন্টারেস্টিং গ্যাদারিং।’

‘তুই কখন আসছিস? নেমপ্লেট উদ্বোধন করতে হবে না?’

হৈমন্তী বলল, ‘আমি এসে গিয়েছি ডার্লিং। এবার তোমার ফ্ল্যাটের জন্য একটা মস্ত কেকের অর্ডার দিতে বেরোব। ওপরে লেখা থাকবে হ্যাপি বার্থ ডে টু ড্রিম।’

ফোন ছেড়ে উঠে টেবিলে রাখা ছোটবাক্সটা খুলল হৈমন্তী। ঝলমল করে উঠল একসেট রুপোলি ছুরি, কাটা, চামচ। মুকুরের কিচেনের জন্য উপহার। ছুরি থাকার জন্যই ব্যাগটা প্লেনের লাগেজে পাঠাতে হয়েছিল। ছুরি হাতে নিয়ে তুলে দেখল হৈমন্তী। ছুরির হাতলটা বড্ড চমৎকার। সুক্ষ্ম কারুকাজ। ফুল আঁকা। হবে না কেন? বিদেশি জিনিস। দামও নিয়েছে অনেক। সে নিক, কলেজের বন্ধুকে উপহার দিতে গেলে একটু খরচ তো হবেই।

25

‘এখানে মেল কসমেটিক্সের বাজার কেন বাড়ানো যাচ্ছে না মিস্টার রায়? এ বিষয়ে আপনারা কি কোনরকম সার্ভে করেছেন?’

‘করেছি ম্যাডাম। একটা রিপোর্টও এনেছি, চাইলে ল্যাপটপে প্রেজেন্টেশনও দেখাতে পারি।’

‘রিপোর্টের ফাইলটা দিন। প্রেজেন্টেশন পরে দেখব। আমাকে পেন ড্রাইভ দিয়ে দেবেন, মেল করতে পারেন। আপাতত মুখে একটা–দুটো পয়েন্ট শুনতে পারি? যেগুলো আপনার কাছে প্রায়োরটি বলে মনে হচ্ছে?’

স্বর্ণাভ রায় বললেন, ‘ইস্টার্ন জোনে বিশেষ করে বাঙালি পুরুষের মধ্যে এখনও ফ্যাশন কোনও আলাদা সাবজেক্ট হয়ে ওঠেনি। যেটুকু হয়েছে তা শরীরচর্চার মধ্যেই লিমিটেড। তাও নট ফর বিউটি, ফর হেলথ এন্ড ফিটনেস। বাঙালি পুরুষ সুন্দর হতে চায় না, বেশিদিন বাঁচতে চায়।’

হৈমন্তী সেলস রিপোর্টের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল, ‘সেটা কেমন?’

স্বর্ণাভ রায় বললেন, ‘একথা ঠিক যে বাঙালি পুরুষের মধ্যে স্যালন বা জিমে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে, কিন্ত সেটা একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত। মূলত ইয়ং এজ। কলেজ, ইউনিভার্সিটি অথবা কপোরেট পারসন।

কমবয়সীরা পয়সা খরচ করে কতই বা কসমেটিকস প্রোডাক্ট কিনবে? শেভিং ক্রিম, পারফিউমের বেশি যাবে না। ফলে একটা জায়গা এসে আমরা আটকে যাচ্ছি। ওড়িশা, আসামের সমস্যাও একই রকম।'

হৈমন্তী মুখ না তুলেই বলল, 'মিস্টার রায়, এই ইনফর্মেশনটা মনে হয় না কারেক্ট। এখন চল্লিশের ওপর বাঙালি পুরুষরাও ফিটনেস নিয়ে কনসার্নড। ইয়ংদের থেকে বেশি। আপনি বিভিন্ন প্রোডাক্টের অ্যাডে দেখবেন এজেড্ স্টারেরা আসছেন। তাঁদের আনা হচ্ছে, বয়স্কদের অ্যাট্রাক্ট করতে। গোটা দুনিয়ার মতো, এখানেও বয়স বিষয়টা গুলিয়ে গিয়েছে। বুড়ো বলে যে শব্দটা একসময়ে ছিল, সেটা আর এখন নেই। আপনি কাউকে বুড়ো বলা মানে তাঁকে অপমান করা হয়। কোনও বয়েসের মানুষই আর নিজেকে বুড়ো হিসেবে মানতে চান না। বাঙালির মধ্যে এই প্রবণতা বেড়েছে। সবাই নিজেকে কমবয়সী ভাবতে ভালবাসছে। তাদের মতো অ্যাক্ট করতে চাইছে। পাহাড়ে চড়তে পারি, তাই আমি বুড়ো নই এটা যে সত্য নয়, এটা একটা ইলিউশন, এটা বুঝতে চায় না। আমি বুড়ো তাও আমি ফিট, তাও আমি পাহাড়ে উঠতে পারি এই সত্যটা মানতে চায় না। উই হ্যাভ টু বাঙ্ক অন ইট। এই ইলিউশনের ওপর নির্ভর করতে হবে। মে বি ইউ ক্যান কল ইট ইয়ং সিনড্রোম। নিজেকে কমবয়সী ভাববার অসুখ। অসুখও বলতে পারেন আবার ড্রিমও বলতে পারেন।'

স্বর্ণাভ রায় থমকে গেলেন। খুবই অবাক হলেন। এই মহিলা একজন কেমিস্ট। কেমিক্যালস নিয়ে কারবার, মার্কেটিং–এর এত কায়দাকানুন বুঝলেন কী করে! নাকি বেশি ওস্তাদি হয়ে যাচ্ছে?

স্বর্ণাভ রায় 'বন উই দ্য' কোম্পানির ইস্টার্ন জোনের হেড। সাত বছর হল কাজ করছেন। তাঁর অধীনে আটান্নজনের টিম রয়েছে। ত্রিপুরা, অরুণাচল, মেঘালয়ে আরও কয়েকজনকে নেওয়া হবে। পুনের অফিস থেকে তাঁর কাছে কানাঘুষোয় খবর এসেছিল, নতুন একজন তাঁদের কাজের ব্যাপারে নাক গলাতে আসছে। খোদ হেড কোয়ার্টার থেকে নাকি অর্ডার এসেছে। সবাই ভেবেছিল, সেলস বা মার্কেটিং এক্সপার্ট কেউ আসবে। তার বদলে একজন কেমিস্টকে দায়িত্ব দেওয়া হল! হৈমন্তী সেনের রূপ এবং পার্সোনালিটির খবর এই কোম্পানির সকলেরই জানা। আগে এঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছে। কলকাতা, ডিব্রুগড়, ভুবনেশ্বরের মিটিঙে হয়েছে। পুনেতে পার্টি। যতবার দেখা হয়েছে চোখ ধাঁধানো রূপে মুগ্ধ

হতে হয়েছে। হৈমন্তী সেনকে নিয়ে পুরুষদের মধ্যে যেমন কানাঘুষো হয়, মহিলারাও বাদ যান না। বাইরে যাই করুন, কাজের জায়গায় এই সুন্দরীর কোনও প্রগলভতা বা বেচাল ভাব নেই। অফিস পার্টিতে সবসময় ফরম্যাল পরেন। শাড়ি ব্লাউজ, কোট প্যান্ট যা ই হোক না কেন, পোশাক গলা পর্যন্ত ঢাকা থাকে। হাতের কব্জিও দেখা যাবে না। এতে বেশি আকর্ষণীয়, বেশি রহস্যময়ী লাগে। অবশ্যই সেই সঙ্গে অভিজাত। যেটুকু ভদ্রতা, তার বেশি হাসি নেই মুখে। কেউ গায়ে পড়লে সহজ ভাবে তাকে বুঝিয়ে দেন, আর এগোলে বিপদে পড়তে হবে। সবার সামনে চড়ও মেরে দিতে পারে। অথচ মহিলাকে ঘিরে নানাধরনের গসিপ রয়েছে। দুটো বিয়ে, দশটা প্রেম। এখন একা থাকেন, অথচ নতুন পুরুষমানুষ ছাড়া নাকি রাতে শুতে পারেন না। বাড়িতে বা বন্ধুদের সঙ্গে উদ্দাম। পুরুষরা জলভাতের বিষয়। অথচ অফিসের কাজের ব্যাপারে অতি দক্ষ।

দূর থেকে দেখা হলেও হৈমন্তী সেনের সঙ্গে এভাবে সরাসরি যোগাযোগ আগে কখনও হয়নি স্বর্ণাভ রায়ের। খানিক আগে টেলিফোন করেছিলেন।

‘মিস্টার রায়, আমি হৈমন্তী সেন বলছি।’

‘বলুন মিসেস সেন।’

‘মিসেস সেন।’ শুনে একটু থমকে ছিল হৈমন্তী। একটু অর্ডার করবার ঢঙে বলল, ‘সরি, ইট ইজ অফিসিয়াল কল। আপনাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আপনার জোনের সেলস রিপোর্টটা সঙ্গে আনবেন। পার্টিকুলারলি মেল কসমেটিকস্–এর সেল রিপোর্ট।’

কথা শুনেই স্বর্ণাভ বুঝতে পারে, সম্বোধনে ভুল হয়ে গিয়েছে।

‘ম্যাডাম, কখন যাব? কোথায় যাব?’

হৈমন্তী বলেছিল, ‘কোথায থাকেন আপনি?’

‘যাদবপুরে ম্যাডাম।’

‘তাহলে তো কোনও সমস্যা নেই, আপনি এক ঘন্টার মধ্যে চলে আসুন। আমার হোটেলের ঠিকানাটা নোট করে নিতে পারেন।’

মুম্বাইতে বসকে হৈমন্তী বলে এসেছিল, কলকাতা থেকে ফিরে নতুন দায়িত্বে হাত দেবে। কোম্পানি কেন পূর্ব ভারতে পুরুষ প্রসাধনে বাজার বাড়াতে পারছে না জানবার চেষ্টা করবে। খানিক আগে কিছু একটা ভেবে মত বদলাল। এটা কি কোনও অ্যালিবাই তৈরি হচ্ছে? হৈমন্তী জানে। মুকুরের সঙ্গে কথা শেষ করে মোবাইলের অফিস ডিরেক্টরি খুলে স্বনার্ভ রায়কে ফোন করে আসতে বলল।

একই সঙ্গে রিসেপশনে ফোন করে বলল, 'একতলার লাউঞ্জের পাশে আপনাদের যে অফিসরুমটা আছে সেটা এক ঘন্টার জন্য আমার নামে বুকিং করুন।'

'ইয়েস ম্যাম।'

হৈমন্তী বলল,'আর শুনুন স্বর্ণাভ রায় ছাড়া আর কাউকে আমার ভিজিটর হিসেবে অ্যালাও করবেন না। মিস্টার রায়কে অফিসে বসাবেন, চা কফি যেটা উনি চাইবেন সার্ভ করবেন।'

সেই মত স্বর্ণাভ এসেছেন। কথা চলছে। মিটিঙের যাবতীয় কথা হৈমন্তী মোবাইলে রেকর্ড করছে। স্বর্ণাভ রায়কে জানিয়েই করছে। অফিসে এই একটা ঝামেলা। কিছু কিছু কাজের রেকর্ড রাখতে হয়।

হৈমন্তী বলল, 'এখানে প্রোডাক্ট অ্যাডভ্যার্টাইজমেন্ট কী করে হয়?'

স্বর্ণাভ বলল, 'আমার তো আলাদা করে কিছু করি না। মুম্বাই থেকে এজেন্সি যা পাঠায়।'

স্বর্ণাভ ফাইল থেকে কতগুলো স্টিল ফটো বের করল। হৈমন্তী হাতে নিয়ে ভুরু কুঁচকে ফেলল। সবই কমবয়সীদের ফটো। হিরোর মতো মাসকিউলিন চেহারা। খালি গায়ে আন্ডারগার্মেন্টস পরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাইভেট পার্টসের আকার বিশ্রী ভাবে স্পষ্ট। ফটোর একপাশে ডিওডোরেন্টের সবুজ শিশি। পিছন থেকে দুই তরুণী কামনাভরা চোখে তাকিয়ে আছে হিরোর দিকে। ওপরে ইংরেজিতে যে ক্যাপশন লেখা আছে তার গোদা বাংলা করলে দাঁড়ায়, এই ডিওডোরেন্ট মাখলে সুন্দরীরা কাছে যাবার জন্য ঝাঁপাঝাঁপি করবে।

হৈমন্তী বিরক্ত গলায় বলল,'এই অ্যাডের মানে কী মিস্টার রায়? পৃথিবীর কোন তরুণী ডিওডোরেন্টে গন্ধে পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে? এ বিষয়ে আপনার কাছে কোনও ডেটা আছে?'

স্বর্ণাভ রায় মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। হৈমন্তী তার বস হলেও মহিলা। এই আলোচনা করা মুশকিল।

হৈমন্তী রাগের গলায় বলল, 'রাবিশ। বাঙালি বায়ারের সঙ্গে এসব যায় না। জুড়ি গাড়ি করে ময়দানে বেড়াতে যাওয়া বাঙালী বাবুর ছবি চাই। হাতে ছড়ি, পায়ে নাগরা। পকেটে গোঁজা ধুতির কোঁচা। পাশে আতরের শিশির ছবি দিতে হবে। বলতে হবে, পূর্বপুরুষের মত নিজেকে অভিজাত কর। তবে না বাঙালি নিজেকে রিলেট করবে। যাক, এটা আপনার বিষয় নয়। আমি মুম্বাই ফিরে অ্যাড এজেন্সির কথা বলব। এখন এই পর্যন্ত থাক। আমি আবার আসব। আপনাদের খবর দিয়ে আসব।'

স্বর্ণাভ রায় ফাইল গোছাতে গোছাতে সহজ হওয়ার চেষ্টা করলেন।

'ম্যাডাম, এখানে কতদিন আছেন?'

হৈমন্তী হালকা ভাবে বললেন, 'আছি কদিন।'

'ম্যাডাম, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি।'

হৈমন্তী মুখ না তুলে বলল, 'বলুন।'

স্বর্ণাভ রায় গদগদ মুখ করে বললেন, 'আমাদের ডিভিশন থেকে আপনাকে যদি একদিন লাঞ্চ বা ডিনারের আমন্ত্রণ জানাই...আপনি রাজি হবেন?'

হৈমন্তী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না। এবার সময় নেই। ভাল থাকবেন।'

হৈমন্তী নিজের ঘরে এসে সামান্য লাঞ্চের অর্ডার দিল। বেশিটাই সালাদ। রিসেপশনে ফোন করে জানাতে চাইল, কেউ এসেছিল কিনা। রিসেপনের মেয়েটি মিষ্টি গলায় জানাল, 'একজন ম্যাম।'

হৈমন্তী সহজ ভাবে বলল, 'হু ইজ হি?'

মেয়েটি বলল,' হি নয় ম্যাম, একজন লেডি এসেছিলেন। নাম বলেননি।'

মহিলা! কে এসেছিল? হৈমন্তী রিসিভার নামিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছোটো শিশিটা বের করল। চোখের সামনে তুলে দেখল। ঘন তরল রঙ সবুজ। সালফিউরিক অ্যাসিড আর কার্বলিক অ্যাসিডের নির্যাস কনসেনট্রেটেড অবস্থায় রয়েছে। বিষ হিসেবে নিজেদের পৃথক শক্তির থেকে কয়েক শো গুণ বেশি ক্ষমতা পেয়েছে সে। ঘন হয়েছে। কিন্তু এই বিষের রঙ কি সবুজ হয়? হোটেলেরক বড় জানলা দিয়ে

আসা আলোয় ভুল দেখছে? সাবধানে কাজ করতে হবে। খুব সাবধানে। এই কাজ আরও অনেক পদ্ধতিতে হতে পারত, কিন্তু হৈমন্তীর মনে হয়েছিল, এটাই সবথেকে ইন্টারেস্টিং এবং চ্যালেঞ্জিং। হৈমন্তী সেন ইন্টারেস্টিং এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ পছন্দ করে।

সুন্দরী নিজের মনেই হাসল।

26

বইয়ের নাম 'দ্য ন্যুড ইন ক্যানভাস।'

বিলেতের খুব বিখ্যাত এক প্রকাশকের বই। তবে চেহারায় বড় নয়, পেপার ব্যাক। বিশ্বের বিখ্যাত শিল্পীদের ন্যুড স্টাডি নিয়ে আলোচনা। এই ধরনের ছবি কীভাবে দেখতে হয়, বুঝতে হয় সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই অর্থে এই বই 'বিগিনারস্'দের জন্য। শিল্প রসিক তৈরি করবার প্রথম ধাপ। যারা সবে এই বিষয়ে চর্চা শুরু করেছে তারা পড়ে অনায়াসে বুঝতে পারবে।

বসন্ত সাহা ক্যাটলগ দেখে অ্যামাজন থেকে এই বই আনিয়েছেন। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এই তুখোড় গোয়েন্দা অফিসারের মাথায় রক্ত, হত্যা, রিভলভার ছাড়াও নানা ধরনের সাবজেক্ট ভর করে। তখন সেই বিষয়ের ওপর তিনি একেবারে হমড়ি খেয়ে পড়েন। কিছুদিন আগে ক্লাসিকাল সঙ্গীত নিয়ে লেখাপড়া শুরু করেছিলেন, এখন মেতেছেন শিল্পকলা নিয়ে। এই সাবজেক্টে বই, ম্যাগাজিন আনাচ্ছেন। এই শখ কিছুদিন হল হয়েছে। প্রাচীন মিশরের চিত্রকলা নিয়ে একটা প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে এই উৎসাহ তৈরি হয়। নব্য আসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় আশুরনাসির পাল ছিলেন একজন শিল্পরসিক মানুষ। যদিও সে সময়ে শিল্প নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবার কথা ভাবাই যেত না। এটা ছিল ৮৮৩ সাল থেকে ৮৫৯ খিস্ট্রপূর্বাব্দ। কত প্রাচীন তা অনুমানেরও বাইরে। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এই রাজার একটি গ্লেজড টেরাকোটার মূর্তি পাওয়া যায়। ছবির মতো। সুমেরু সভ্যতার শিল্পকলা একটি ঘটনা। ছবির বিচারে এর বিন্যাস চমকিত করে। এই প্রবন্ধটি পড়ে গোয়েন্দা অফিসার প্রথম শিল্পকলা বিষয়ে পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ বোধ

করেন। এর আগে আকাদেমি বা অন্যান্য গ্যালারিতে কিছু আর্ট একজিবিশন তিনি দেখেছেন, কিন্তু লেখাপড়ার টান অনুভব করেননি। একেই বোধহয় বলা হয়, প্র্যাকটিস থেকে থিওরি। বসন্ত সাহার পড়া শুরু হয়। এক এক করে নিও–ক্লাসিসিজম, ইম্প্রেশনিজম, কিউবিজম্, পোস্ট মর্ডানিজম্ নিয়ে বই ও লেখাপত্তর পড়ে ফলেন। এসবই বিভিন্ন ধরনের আর্টফর্ম। কিছুদিন হল 'শিল্পে নগ্নতা'র ওপর এই বইটা নিয়ে পড়েছেন। বইতে লেখাটা যেন একেবারে নতুনদের ক্লাস নেওয়ার ভঙ্গি!

আরও পড়ুন, দেবেশ রায়ের স্মৃতিকথন মনে পড়ে কী পড়ে না

বসন্ত সাহা, যিনি পুলিশ মহলে 'বি সাহা' নামে পরিচিত তিনি এই সকালে বসে আছেন তাঁর ফ্ল্যাটের বারান্দায়। এখানে বসে তিনি ভোরের চা খান। শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা বাদ যায় না। দু'কাপ চা চাই। এক কাপ খাওয়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কাপ নিয়ে স্ত্রী কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে, তিনি বুঝতেও পারেননি। কাল সন্ধের পর থেকে অনেক ঝামেলা গিয়েছে। একটা পার্টিতে গিয়েছিলেন সেখানে একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়েছে। পার্টিটা ছিল বেশ ইন্টারেস্টিং। এক পারিবারিক বন্ধু পরিবারের ফ্ল্যাটের জন্মদিন। বর্ষপূর্তি। বসন্ত সাহা পার্টি অ্যাভয়েড করেন। একেই তো পুলিশের উচ্চপদে কাজ করেন বলে সদা সর্তক থাকতে হয়, তার ওপর আজকালকার পার্টির মূল আকর্ষণ যে মদ্যপান, তাতে ভদ্রলোকের কোন আসক্তি নেই। তিনি মদ খান না। ফলে পার্টিতে যাওয়ার তেমন কোনও তাগিদ অনুভব করেন না। অফিসিয়াল যেসব পার্টিতে না গেলে নয় সেটুকুই। কিন্ত কালকের পার্টিটা ছিল পরিচিতজনের। হোস্ট ছিল পরিবারের কর্ত্রী। বয়স বেশি নয় মেয়েটির, স্কুল শিক্ষিকা। মেয়েটি প্রাণবন্ত কিন্তু সংযত, শিক্ষিত। বসন্ত সাহা পছন্দ করেন। সেই কারণেই যাওয়া। তবে গিয়ে যে এরকম মারাত্মক ঘটনা ঘটবে কে জানত? অ্যাম্বুলেন্স ডেকে, নার্সিং হোমে পাঠিয়ে কোনও রকমে সামাল দেওয়া হয়েছে। পার্টি যদিও ভেস্তে যায়।

বাড়িতে দেরিতে ফিরে ঘুমও হয়েছে দেরিতে। বসন্ত সাহা এবং তার স্ত্রীর অভ্যেস হল, রাত করে ঘুমোলেও ভোরে ঘুম ভাঙবে। মেয়ের স্কুলের জন্য তার মাকে তো উঠতেই হয়। তারও স্কুলে যাওয়ার আছে। টিচারদের লেট করবার উপায় নেই। পুলিশ অফিসারের বউ হলে তো আরও নেই। কলিগরা বলবে, ক্ষমতা আছে বলে সুবিধে নিচ্ছে।

বসন্ত সাহা ভেবেছিলেন, বিছানায় আর একটু গড়াবেন। পারলেন না। কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। উঠে পড়েছেন। মুখ টুখ ধুয়ে 'দ্য ন্যুড ইন ক্যানভাস' নিয়ে বসেছেন। কালকের ঘটনা থেকেও মনটাকে সরাতে চান।

গোয়েন্দা ডুব দিয়েছেন, শিল্পী রেনোয়ার ছবির মধ্যে।

বইয়ের ঝরঝরে ইংরেজি বাংলা করলে অনেকটা এরকম হয়—

''পাঠক, আমরা এখন যে শিল্পীর ছবি নিয়ে আলোচনা করব তাঁর নাম রেনোয়া (১৮৪১–১৯১৯)। বাঁ দিকের পাতায় যে ছবিটি আপনি দেখছেন তার নাম 'দ্য বাথার্স'। এই ছবিটি 'অতি বিখ্যাত' বললেও কম বলা হয়। শ্রেষ্ঠ ছবির একটি। বিশ্বের তাবড় শিল্পরসিকরা এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিন বছর ধরে আঁকা। ছবিতে আপনি দেখছেন, স্নানরতা চার অপরূপ সুন্দরীকে। সকলেই নগ্ন। কিন্তু সেই নগ্নতায় কোনওরকম কামত্তোজনার প্রকাশ নেই। আছে সৌন্দর্য। ছবিটিতে রয়েছে জঙ্গল এবং পাশে নদী। নগ্নিকারা কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ পাথরে বসে। আলতো, উদাসীন, অলস ভঙ্গি। কেউ কথা বলছে, কেউ শুনছে অবহেলায়, কেউ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে। একজন একটু দূরে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে প্রসাধনে ব্যস্ত। আড়াল থেকে তাদের কেউ দেখছে কিনা সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই। জলের ধারে আসা হরিণের মতো এরা সুন্দর কিন্তু সচকিত নয়। লজ্জার দায় নেই। 'দ্য বাথার্স' ক্লাসিকাল ন্যুড স্টাডির এক অমূল্য আখ্যান। আপনি যখন ছবিটির দিকে তাকান, তিন রমণীর কথা, ফিসফিসানি, হাসি শুনতে পান। সেই কূজন তাদের গ্রীবা, স্তন, কটিদেশ, জানুর মতোই পরিশীলিত। রেনোয়ার কাজ অন্যরকম। খানিকটা স্ট্রাকচারাল, খানিকটা বিমূর্ত। মনে রাখতে হবে, এই ছবি ভাস্কর্যের থ্রি ডাইমেনশন গঠনকে মাথায় রেখে আঁকা হয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে একসময় স্বাভাবিকতাবাদ ছিল একটি ধারা। রেনোয়া সেই ধারা থেকে সরলেন। প্রেক্ষাপটের স্বাভাবিক অংশটি এখানে হল গৌণ। জঙ্গল, নদী, পাথর নয়, নারীর অনাবৃত শরীর এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। শুধু শরীর নয়, এই চার রূপবতী অনায়াসে তাদের মনের আবরণ সরিয়ে রেখেছে।''

'বইটা একটু বন্ধ করবে?'

বসন্ত সাহা বই বন্ধ করতে বললেন, 'অবশ্যই করব।'

ছন্দা চায়ের কাপ বাড়িয়ে স্বামীর উলটো দিকের চেয়ারে বসলেন। সামনের বেতের টেবিলে ছবি বিষয়ক বিভিন্ন বই আর ম্যাগাজিন ছড়ানো।

বসন্ত সাহা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'মন খারাপ?'

ছন্দা চুপ করে রইলেন। বসন্ত সাহা বললেন, 'আমারও খারাপ লাগছে। এমন একটা ঘটনা ঘটবে ভাবতেও পারিনি।'

ছন্দা বলল, 'কাল রাতে মুকুর খুব কান্নাকাটি করছিল।'

বসন্ত সাহা দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'করবারই কথা। শখ করে অমন চমৎকার একটা গেট টুগেদারের আয়োজন করেছিল সেখানে যদি এরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়ে যায় সেটা তো মন খারাপই করে।'

ছন্দা বলল, 'মুকুর তো বলছিল, সব দোষ ওর।'

বসন্ত বললেন, 'এতে ওর দোষের কী হয়েছে? কোনও কারণে খাবারে বিষাক্ত কিছু পড়েছিল। ফুড পয়জন তো হতেই পারে। অনেক সময়েই তো এরকম ঘটে। টিকটিকি বা ওই জাতীয় কিছু পড়ে যায়...।'

ছন্দা দুঃখিত গলায় বলল, 'ফুড পয়জনিং তো কম হয়নি, একেবারে নার্সিং হোম পর্যন্ত ছুটতে হল, শুরুতেই পার্টিটা ভেস্তে গেল।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'একজন যদি ওভাবে বমি করতে করতে কাতরাতে থাকে, পার্টি তো বন্ধ করতেই হবে। আর যে সে তো নয়, একেবারে হোস্ট। গৃহকর্তা। সুনন্দ আছে কেমন? খবর নিয়েছো?'

ছন্দা বলল, 'এত সকালে খোঁজ কী নেব? সবে তো সাড়ে ছ'টা বাজে। মুকুর নিশ্চয় কাল সারারাত জেগেছে। স্বামীর কাছে নার্সিং হোমে ছিল হয়তো।'

বসন্ত বললেন, 'তা হবে। ফুড পয়েজনিং হলে তো বেশি কিছু হবে না। সুনন্দ নিশ্চয় আজকের মধ্যে অনেকটা রিকভার করবে। তুমি খানিকক্ষণ পরেই না হয় মুকুরকে ফোন করো।'

ছন্দা একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'জানো, মুকুর বলছিল, ওদের যে কেটারার কাজটা করছিল সে কোনও গোলমাল করেছে...'

বসন্ত সাহা মুখ স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মানে!'

'মানে আমি বলতে পারব না। লোকটার সঙ্গে নাকি সুনন্দর কী গোলমাল হয়েছিল। লোকটা নাকি টাকাপয়সা কী সব সুনন্দর কাছে ধার চেয়েছিল। সুনন্দ দেয়নি বলে... মুকুর বলছিল, ওই কেটারার নাকি পার্টি ভেস্তে দিতে খাবারে কিছু গোলমাল করছে।'

বসন্ত সাহা বললেন,'ছাড়ো তো এসব কথা। এই কারণে কেউ নিজের পায়ে কুড়ুল মারে? ব্যবসা চৌপাট করে দেয়? বাঙালির দোষ চাপানো আর সন্দেহ হল দুটো অসুখ। আমি আমার কর্মজীবনে যে কত দেখেছি। সবাই সবাইকে সন্দেহ করে।'

ছন্দা বললেন, 'কী জানি। তবে আমারও মনে হয় এটা মুকুর ঠিক বলছে না। এই ঘটনার সঙ্গে কেটারের কতটা সম্পর্ক? আমার যেতেই তো সবাইকে স্টাটার সার্ভ করা হল। কাবাব আর চিজ বল।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'সে তো আমরা সবাই খেয়েছি। কই আর কেউ তো অসুস্থ হয়ে পড়িনি।'

ছন্দা বললেন, 'ঠিক বলেছো। সুনন্দ অসুস্থ হল আর একটু পরে। ওই মেয়েটা, কী যেন নাম? মুকুরের কলেজের বান্ধবী সে–ই তো কেক কেটে বিলি করল।'

বসন্ত সাহা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেক তো আমিও খেলাম... তুমিও খাওনি?'

ছন্দা বললেন, 'খেয়েছি এবং ঠিকই তো আছি।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'এই কারণেই তো বলছি, ওখানকার খাবার টাবার নয়, সুনন্দ বাইরে থেকে কিছু খেয়েছিল।'

ঘরের ভিততে ছন্দা সাহার মোবাইল বেজে উঠল ঝন্‌ঝন্ করে। ছন্দা উঠে গিয়ে ফোন ধরল। মুহূর্তখানেক পরে আর্তনাদ করে উঠল।

'সেকী! তুমি এসব কী বলছ মুকুর!'

বসন্ত সাহা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

27

দুজনে তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠতে খুব বেশি হলে সাত –আট মিনিট সময় লাগল।

বসন্ত সাহা এই ধরনের তাড়াহুড়োয় অভ্যস্ত। তিনি পুলিশ। বেশিরভাগ সময়েই ছোটাছুটি, লাফাঝাঁপির মধ্যে থাকতে হয়। ছন্দার অসুবিধে হয়। সে স্কুলটিচার। লাফাঝাঁপির কোনও দরকার পড়ে না। স্টিয়ারিঙে বসতেই এক হাতে মোবাইলের নম্বর টিপতে শুরু করলেন বসন্ত সাহা। থানা, কন্ট্রোলরুমে। ফোন কেউ ধরছে না। এত সকালে ফোন না ধরাটা অস্বাভাবিক নয়। সারা রাত জেগে ডিউটি দেওয়ার পর, সকালে কিছুক্ষণের জন্য এমনটা হতেই পারে। তাছাড়া ডিউটি শিফটিং থাকে। কিন্তু উপায় নেই, চেষ্টা চালাতেই হবে। ইচ্ছে করলে অন্য কোনও অফিসারকে ফোন করে দায়িত্বটা দেওয়া যায়। বসন্ত সাহা চান না। তিনি নিজে যে কাজটা পারছেন না, অন্য কেউ পারবে কী করে?

ছন্দা থমথমে গলায় বললেন, ‘গাড়ি চালাতে চালাতে ফোন কোর না।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘জরুরি একটা কাজ করতে হবে।’

ছন্দা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘এখন আর জরুরি অজরুরি। যা হবার তো হয়েই গেছে। ইস্ মুকুরের জন্য এতো খারাপ লাগছে! কী করে মেয়েটা সামনে গিয়ে দাঁড়াব বুঝতে পারছি না।’

বসন্ত সাহা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন,’সুনন্দর হার্টের কোনও প্রবলেম ছিল। সামান্য একটা ফুড পয়েজনিং…ছিল কোনও হার্টের সমস্যা?’

ছন্দা একটু ভেবে বললেন, ‘দাঁড়াও মনে করি। হ্যাঁ মনে পড়ছে, কী একটা সমস্যা ছিল যেন। মুকুর একবার বলেছিল যেন, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। কী একটা হার্ট বিটের সমস্যা, ছোটো সমস্যা।’

বসন্ত সাহা গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে বললেন, ‘হতে পারে সেটাই শেষ রাতে ট্রিগার করেছে। হার্টে ধাক্কা মেরেছে, নিতে পারেনি।’

ছন্দা বললেন, 'ইস্ মুকুর মেয়েটা কত ছোটো...।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'বড় হলেও একইরকম দুঃখজনক হত। একটা বিষয় আমার খটকা লাগছে ছন্দা। কাল সুনন্দ যা খেয়েছে, আমরাও তাই খেয়েছি। এবং সেটাও খুব সামান্য। তাহলে সমস্যাট ওর একার কেন হল?'

ছন্দা বললেন, 'তুমি বলছিলে না, আগেই বাইরে হয়তো কিছু খেয়ে থাকতে পারে। তার এফেক্ট হয়েছে হয়তো।'

বসন্ত সাহা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এতো বড় এফেক্ট! একেবারে মারা যাবে!'

সিটের পাশে রাখা ফোন বেজে উঠল। দ্রুত ফোন কানে নিলেন বসন্ত।

'স্যার, থানা থেকে বলছি।'

বসন্ত সাহা দ্রুত বললেন, 'শুনুন একটা বাড়ির অ্যাড্রেস বলছি, এখনই যাবেন। ফ্ল্যাটের নাম দ্য ড্রিম। গার্ড বসান। কেউই যেন কিছুতে হাত না দেয়। বিশেষ করে কিচেন, ডাইনিং এ কেউ যেন ঢুকতে না পারে। কোনও ওয়েস্ট বিনেও যেন কেউ হাত না দেয়। ওযেস্ট বিন জানেন তো? বাসি খাবার দাবার ফেলবার জায়গা।'

ওপাশ থেকে অফিসার বললেন, 'এখনই যাচ্ছি।'

'যান। নেক্সট ইনস্ট্রাকশন পরে পাঠাচ্ছি।'

ছন্দা অবাক হয়ে বললেন, 'বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসিয়ে কী হবে!'

বসন্ত সাহা বললেন, 'জানি না কী হবে। তবে মনে হল, বসানো দরকার। বাড়ির কোনও খাবার থেকে কিছু ঘটল কিনা জানতে হবে।'

ছন্দা নিজের মনে বলল, 'সত্যি পার্টিটা খুব ভাল শুরু হয়েছিল। হাসিখুশি, আনন্দের।'

ঘটনা তাই। দ্য ড্রিমের জন্মদিনের পার্টি জমে উঠেছিল। আটটার মধ্যে গেস্টরা সবাই চলে এলে মুকুর হেসে বড় করে জিভ কেটে বলল, 'সবাই এসেছে বলে আমি ভীষন ভীষন খুশি। সকলকে ধন্যবাদ।'

উজ্বল বলল, 'তুই ধন্যবাদ দেওয়ার কে মুকুর? ধন্যবাদ তো দেবে তোর ফ্ল্যাট।'

মুকুর বলল,'অবশ্যই। আমি ফ্ল্যাটের পক্ষ থেকে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। কিন্তু একটা মস্ত ভুল করেছি।'

কিশোর বলল, 'কী ভুল মুকুরদি? খাবার বলতে ভুলে গেছ নাকি?'

মুকুর হেসে বলল, 'নানা, তা নয়। গেস্ট তালিকা আমি করছিলাম তেরোজনের। কিন্তু এখন দেখছি হিসেব ভুল করেছি। নিমন্ত্রিত আসলে পনেরো।'

কঙ্কনা, নয়নিকা, দিশা, মেহুল হই হই করে উঠল। সবথেকে বেশি হইহই করল হৈমন্তী। সে বলল,'তাহলে এক্সট্রা দুজন কে এসে পড়ল?'

মজার ব্যাপার হল, কালকের পার্টিতে মেয়েরা অনেকেই শাড়ি পরে এসেছিল। যেন শাড়ি ড্রেস কোড ছিল! একেক জন একেক কায়দায় শাড়ি পড়েছিল। সবাইকে সুন্দর লাগছিল। তবে সব থেকে সুন্দর লাগছিল হৈমন্তীকে। সে পড়েছিল লাল চওড়া পাড়ের কাতান শাড়ি। জমি অলিভ গ্রিন। লাল নেটের লং ব্লাউজ। ডান পাশ থেকে আঁচল ড্রেপ করা। পরপর সাজানো বোতাম লাগা ব্লাউজের ভিতর আলতো দুটো বুক যেন উন্মুক্ত। কব্জির কাছের একটু অংশ ছাড়া শরীরের সবটাই ঢাকা ছিল। এমনকি ব্লাউজের গলা পর্যন্ত। তারপরে তাকে লাগছিল বাড়াবাড়ি ধরনের আকর্ষণীয়। এক কানে বড় এথনিক দুল। ডান হাতের আংটিও তাই। মুখে মেকাপ সামান্য। চুল দু'পাশ থেকে পাক খেয়ে নামিয়েছিল বুকের ওপর পর্যন্ত। এসে থেকে হৈমন্তী ছিল সবথেকে উচ্ছল।

হৈমন্তীর পরেই সুন্দর লাগছিল, মেহুলকে। সে সাদা লম্বা কুর্তার সঙ্গে স্যাফ্রন রঙের শাড়ি পরেছিল। শাড়িতে স্ট্রাইপ। তার আঁচলও ড্রেপিং করা। তবে সেই আঁচল ফেলা ছিল অনেকটা লম্বা করে। ছিপছিপে চেহারা এই মেয়েকে দেখাচ্ছিল বড্ড ভাল।

আলাপ হওয়ার হৈমন্তী তো মেহুলকে বলেই ফেলল, 'তোমাকে হিংসে হচ্ছে।'

মেহুল হেসে বলল, 'আমাকে তো সাজ দেখে হিংসে হচ্ছে, আর আমার যে হিংসে হচ্ছে তোমার মাথার

ভিতরটা দেখে। ইচ্ছে করলেই তুমি আমার মতো সাজতে পারবে, তোমার মতো মাথা তো পাব না। আমি তোমার কথা মুকুরদির কাছ থেকে শুনেছি।'

উজ্জ্বলের স্ত্রী হিংসুটে নয়নিকাও শাড়ি পড়েছিল। গাজ্জি সিল্কে কচ্ছ বাঁধনি প্রিন্ট। শাড়ির রঙটাও চমৎকার। মন গ্রিন, কালো–সাদা শেডস্ রয়েছে। ছন্দা সাহা পরেছিলেন তাঁতের শাড়ি। চওড়া পাড়ে সুতোর কাজ। খুবই অভিজাত লাগছিল। তবে দিশা শাড়ি পরেনি। সে পরেছিল ড্রেস। ওয়েস্টার্ন কাট। এথনিক কায়দার এমব্র্যডারি করা। পোশাকটি অ্যাসিমেট্রিকাল কাটের। একে বলে স্লিভসে বেল স্লিভ প্যাটার্ন। হাঁটুর ওপরে গিয়ে শেষ। দিশা নিজেই পোশাকের ব্যাখ্যা দিয়েছে। কঙ্কনাও শাড়ি পরেনি। সে পরেছিল খাদি লিনেনের শিফ্ট ড্রেস। হালকা নীল। নি লেন্থের এই পোশাকে পেটের কাছে ছোটো প্যাচ পকেট। নেকলাইনে সুতোর কাজ রয়েছে। মুকুর প্রথমে শালোয়ার পরেছিল। হৈমন্তী এসে তাকে জোর করে চেঞ্জ করাল।

'যা শাড়ি পরে আয়। তুই না হোস্ট।'

মুকুর বলল, 'সেই কারণেই তো শাড়ি পরিনি, ছোটাছুটি করতে হবে না।'

হৈমন্তী বলল, 'তা হবে না। যা শাড়ি পরে আয়।'

মুকুর শাড়ি পরে এল। মুগা তসরের ওপর, শিবোরি প্রিন্ট। প্রিন্টও ভারি সুন্দর। টাই এন্ড ডাই প্রসেসে করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রঙ মেলানো ব্লাউজ।

হৈমন্তী বলল,'আজকের পার্টিতে তাহলে এটাই রহস্য। এক্সট্রা দুজনকে খুঁজে বের করতে হবে।'

পলাশ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'মনে হয় আমরা। আমি আর কঙ্কণা।'

কঙ্কণা বলল, 'একবারেই নয়। আমি কেন এক্সট্রা হতে যাব।'

মেহুল বলল, 'আর কে এক্সটা আমি জানি না, তবে আমি যে অতিরিক্ত তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

কিশোর বলল, 'কেন বাপু। আমাকে বাদ দিচ্ছ কেন?'

হৈমন্তী বলল, 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ নেই। আমাদের পার্টি উপস্থিত রয়েছেন একজন তুখোড় গোয়েন্দা অফিসার। তাকেই বরং দায়িত্ব দেওয়া হোক। পার্টি শেষে তিনি এই রহস্যের কার্টেন রেজ

করবেন।'

বসন্ত সাহা হেসে বললেন, 'এটা কোনও ব্যাপারই নয়। আমি বলে দেব।'

এই সব কথার মাঝখানেই কেটেরারের লোকেরা এসে স্টার্টার দিয়ে গেল। দু একটা করে সকলেই মুখে দিল। সুনন্দ চুপচাপ ছিল। তার নাকি শরীরটা ভাল নয়। ম্যাজ ম্যাজ করছে। এবার সে বলল, 'তাহলে বার ওপেন করা যাক?'

মুকুর হইহই করে বলল, 'নানা। বার একটু পরে। আগে নেমপ্লেটের উদ্বোধন। তারপর কেক কাটা। মাই ডিয়ার গেস্টস্, আপনার শুনে খুশি হবেন, এই ফ্ল্যাটের নামকরণ করেছেন আমার বহুদিনের বন্ধু হৈমন্তী। সে–ই কেক এনেছে। আমি চাই হৈমন্তী নেমপ্লেটেরও ওপর থেকে ফুলের পর্দা সরিয়ে দিক। তারপর কেক কাটুক।'

সবাই হাততালি দিয়ে সায় দিয়েছিল।

বসন্ত সাহা নার্সিহোমের সামনে গাড়ি পার্ক করলেন। ছন্দাও নামলেন। তখনও তিনি জানেন না, শুধু সুনন্দর মৃত্যু নয়, আরও ভংয়কর খবর তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে।

28

নার্সিংহোমের লাউঞ্জের একপাশে সারি সারি সোফা।

সেই সোফার একটায় মুকুর দু'হাতে মুখে চাপা দিয়ে বসে আছে। পাশে বসে আছে হৈমন্তী। মুখ থমথমে। সে বাঁ হাত দিয়ে মুকুরের একটা হাত শক্ত করে ধরে রয়েছে। ছন্দা এগিয়ে গিয়ে মুকুরের পিঠে হাত রাখতে মুকুর মুখ তুলল। তার দৃষ্টি শূন্য। সে কাঁদতেও পারছে না। বোঝাই যাচ্ছে, সুনন্দর মৃত্যু এখন সে বিশ্বাস করতে পারেনি। একটু দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দিশা, তন্ময়, উজ্জ্বল, কঙ্কণা, পলাশ, কিশোর। সবার চোখমুখ উদ্‌ভ্রান্ত। কিছুক্ষনের মধ্যেই স্ত্রী কাঁকনকে নিয়ে অনুকূল রায় এলেন।

বসন্ত সাহা ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

পলাশ বলল, 'স্যার এটা কী হয়ে গেল!'

বসন্ত সাহা বললেন, 'ডাক্তারের সঙ্গে আপনাদের কথা হয়েছে?'

উজ্জ্বল বলল, 'না, হয়নি। উনি এখনও নার্সিং হোমে এসে পৌছোননি। এবার আসবেন।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'কেটারার ছেলেটির কী নাম যেন?'

তন্ময় বলল, 'ওখানে ছিলেন তো। কালই তো সুনন্দ আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রতীক না কী নাম? স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'আপনাদের কারও কোনও সমস্যা হয়নি?'

দিশা বলল, 'কই না তো! আমরা সবাই তো একই খাবার খেয়েছি।'

বসন্ত সাহা চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবলেন। বললেন, 'মনে হচ্ছে, সুনন্দ বাইরের কিছু খেয়েছিল।'

উজ্জ্বল বলল, 'তার রিঅ্যাকশন এতো পরে!'

বসন্ত সাহা নিচু গলায় বললেন, 'পোস্ট মর্টেম হলে বোঝা যাবে। যাই ঘটুক খুব দুঃজনক।'

কঙ্কনা বলল, 'আমি ভাবতেও পারছি না। এখনও ছবির মতো কালেকের সন্ধ্যেট আমার চোখের সামনে ভাসছে।'

দিশা বলল, 'আমার কাছে গোটাটা ভিডিও করা রয়েছে। দ্য ড্রিমের নেমপ্লেটের ওপেন থেকে কেক কাটা পর্যন্ত এভরিথিং।'

বসন্ত সাহা ধীর পায়ে নার্সিংহোমের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ঝলমলে রোদ উঠেছে। যে কোনও ঘটনায় উতলা হওয়া তার অভ্যেসে নেই। কোনও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলেই তাকে ইনসিডেন্ট হিসেবে দেখতে হবে তার কোনও মানে নেই। দুর্ঘটনার সঙ্গে ঘটনার পার্থক্য রয়েছে। দুর্ঘটনা আকস্মিক হয়, ঘটনা ঘটানো হয়। দড়িকে সাপ ভেবে লাভ হয় না। পুলিশ যেমন ক্যাজুয়াল থাকবে না, তেমন ওভার রিঅ্যাকটিভও হবে না। সুনন্দর এই মৃত্যর ঘটনা কি শুধুই অ্যাক্সিডেন্ট? একটি দুর্ঘটনা মাত্র? বেশিটাই তাই মনে হচ্ছে। তারপরেও পয়েজনিংটা ঠিক কোথা থেকে হয়েছে জানা দরকার। অবশ্যই যদি সুনন্দর স্ত্রী এ বিষয়ে

কমপ্লেন করে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ওপরও নির্ভর করছে। তবে কোথায় একটা খচখচ করছে। কেন করছে এই মুহূর্তে বলতে পারবেন না বসন্ত সাহা, কিন্তু করছে।

নার্সিহোমের সামনে একটা সাদা গাড়ি এসে দাঁড়াল। অনুকূল রায় হন্তদন্ত হয়ে নামলেন। বসন্তবাবুকে দেখে এগিয়ে এলেন।

'কী বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়ে গেলে বলুন তো মিস্টার সাহা।'

বসন্ত সাহা বললেন,'আপনার আর মিসেসের শরীর ঠিক রয়েছে তো?'

অনুকূলবাবু বললেন, 'একেবারে ওকে। ওই ঘটনার পর আমরা তো আর কেউই কিছু মুখে দিইনি। পার্টিটাই তো ভেস্তে গেল।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'খুব আনফরচুনেট।'

অনুকূলবাবু বললেন, 'কেমন করে এতটা হল বুঝতে পারছেন কিছু?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'ডাক্তার বলতে পারবেন।'

'পোস্টমর্টেম হলে হয় তো দেখা যাবে, বিষক্রিয়াটা আসল নয়, সুনন্দর অন্য কোনও মেজর প্রবলেম...।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'ছিল। আমার মিসেস আজ সকালেই বলছিলেন। ওর হার্টের কী একটা সমস্যা ছিল।'

অনুকূলবাবু বললেন, 'ও। তাহলে তো গোলমাল অন্য জায়গায়।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'হতে পারে।'

অনুকূলবাবুর একটা কেসের কথা মনে পড়ে গেল। ল্যান্সডাউনের এক বাড়িতে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল। বৃদ্ধ একা ছিলেন। মৃতদেহ বেশ কয়েকদিন ঘরে বন্ধ অবস্থায় ছিল। দুর্গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশীরা থানায় ফোন করল। পুরনো কলকাতায়, একতলার গলির পাশের ঘর। পুলিশ গিয়ে দরজা ভাঙে। দেখা গেল, ভদ্রলোক নিজের ঘরে বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। শরীরে পচন না ধরলে কে বলবে মারা গিয়েছেন? মনে হবে ঘুমোচ্ছেন। ঘরের একটা জানলার খোলা। ভাল করে তল্লাসি চালাতে গিয়ে পুলিশ দেখতে পেল, মৃতের খাটের একপাশে দেয়ালে গুলির দাগ। একটা গুলি দেয়ালে গেঁথে রয়েছে। দেশি

রিভলভারের গুলি। অথচ মৃত মানুষের শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই। পুলিস খুনের মামলা রুজু করল। ফরেনসিক এক্সপার্ট হিসেবে অনুকূলবাবুকেও তদন্তে ডেকে নিল। তবে সকলেই পড়ল অথৈ জলে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ঘরে কেউ ঢুকেছিল, রিভলভার থেকে গুলিও চালিয়েছে, কিন্ত সেই গুলিতে বৃদ্ধ মারা যাননি। তাহলে?

পোস্টেমর্টেম রিপোর্টে জানা গেল, মৃত্যুর কারণ গুলি বা অন্য কোনও আঘাত নয়। মৃত্যুর কারণ আচমকা হার্ট অ্যাটাক। তাহলে গুলি ছুঁড়ল কে? ছুঁড়লই যদি গায়ে লাগল না কেন? জানলা থেকে খাটের দূরত্ব কিছুই নয়। টার্গেট মিস করবার কোনও কারণ নেই। যে গুলি চালাতে এসেছিল, সে নিশ্চয় এতটা আনাড়ি নয়। এই তদন্ত অনুকূলবাবুর আওতায় পড়ে না। তিনি পুলিশকে শুধু বলেছিলেন। গুলির ভুল নিশানা দেখে মনে হচ্ছে, ইটস্ মার্ডার কেস। কিন্তু মার্ডারের ধরন আলাদা। পুলিশ জানতে চাইল, কী ধরন? অনুকূলবাবু বলেছিলেন, 'সেটা জানি না। তবে ইনভেস্টিউগেশন বন্ধ করবেন না।'

কয়েকমাস পরে মৃতের এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নেকে পাকড়াও করল পুলিশ। একবারে অন্য মামলায়। অস্ত্র চোরাচালান। সেই লোককে জেরা করতে বৃদ্ধের মৃত্যু রহস্য স্পষ্ট হল। নিঃসঙ্গ মামার হার্টের অসুখের খবর জানত এই ভাগ্নে। এও জানত, ডাক্তার কোনওরকম উত্তেজনা করতে নিষেধ করছে। হঠাৎ কোনও উত্তেজনা হলে বা ভয় পেলে বড় বিপদ কিছু হয়ে যেতে পারে। ভাগ্নে ভেবেছিল জানলা থেকে ভয় দেখিয়ে মামার হার্টফেল করিয়ে দেবে। তারপর একমাত্র ওয়ারিশন হিসেবে মামার সম্পত্তির মালিক হবে। জানলার ওপাশে কালো কাপড় ঢাকে ভাগ্নেকে দেখে মামা মাঝরাতে ভয় পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভাগ্নে বুঝতে পারেনি তাড়াহুড়োয় তার হাত দিযে রিভলভারের গুলি ছিটকে যাবে। ওই গুলিতে অনুকূলবাবু সন্দেহ হয়। ফলে কজ অব ডেথ অন্য হলেও, ইনটেশনটা হত্যাই ছিল।

বসন্ত সাহা আগেই নিজের পরিচয় নার্সিংহোমে বলে রেখেছিলেন। লোকাল থানা থেকে পুলিশও চলে এসেছে। ডাক্তারবাবু এসে প্রথমেই মৃত সুনন্দকে পরীক্ষা করলেন। পোস্টমের্টেমের জন্য পাঠাতে বলে নিজের ঘরে এসে বসন্ত রায়কে ডেকে নিলেন।

'প্রাথমিক ভাবে আপনার কী মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু?'

‘এখনও ক্লিয়ার নয়। পয়জন থেকে হার্ট ফেল? নাকি স্ট্রেস না নিতে পেরে হার্টফেল? এখনই বলতে পারছি না।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘পয়জন হলে কী ধরনের পয়েজন হতে পারে বলে আপনার ধারণা ডক্টর?’

ডাক্তারবাবু বললেন, ‘সেটাও পোস্টমর্টেমে জানা যাবে। তবে কী জানেন, অনেক সময় খাবারের কোন খারাপ অংশ আমাদের পাকস্থলীতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের সঙ্গে মিশে বিষের মতো অ্যাক্ট করতে থাকে।’

বসন্ত সাহা একটু চুপ করে থেকে বললেন, ‘পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কখনও পাওয়া যাবে?’

ডাক্তারবাবু সামান্য হেসে বললেন,‘আপনারা বললে তাড়াতাড়ি হযে যাবে। আপনি কি কিছু সন্দেহগ করছেন মিস্টার সাহা?’

বসন্ত সাহা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, ‘না ঠিক সন্দেহ করছি এমন নয়, তবে কৌতূহল হচ্ছে। আসলে কী জানেন কাল একটা ছোটো পার্টি ছিল। আপনি জানেন নিশ্চয়। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সামন্য খাওয়া দাওয়া শুরু হয়েছিল। যেমন সব পার্টিতে হয়ে থাকে, এই ধরুন একটু স্টার্টার, তারপর কেক কাটা হল, সকলেই ছোটবড় টুকরো মুখে দিলাম। তারপরেই সুনন্দ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বমি করল, বলল, শরীরে বার্নিং সেনশন হচ্ছে...ডক্টর এই অসুস্থতার কারণ যদি ওখানকার কোনও ফুড হয়, তাহলে তো সকলেরই হওয়া উচিত ছিল। সেই জন্যই কেমন একটা খটকা লাগছে। তবে কী খাবার নয়, অল্য কিছু?’

ডাক্তারবাবু বললেন, ‘হতে পারে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।’

ডাক্তারবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই অনুকূল রায় এগিয়ে এলেন।

‘কিছু জানতে পারলেন?’

বসন্ত সাহা ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, ‘এখনই কী জানতে পারব?’

অনুকূলবাবু একটু চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বললেন, ‘আপনাকে একটা কথা বলবার ছিল।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘বলুন।’

অনুকূলবাবু আরও এক পা এগিয়ে এসে বললেন, ‘মিস্টার সাহা কাল সুনন্দ বমি করবার পর আমি

একধরনের মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিলাম। সুইট স্মেল। বমির রঙটাও ছিল কফি কালারের।'

বসন্ত সাহা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তার মানে?'

অনুকূলবাবু চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'তখন অত খেয়াল করিনি। ভেবেছিলাম কেকের সেন্ট। কেকের কালার। হয়তো সেটাই ঠিক। কিন্ত এই গন্ধটা আমি জানি। রঙটাও। সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া ধরনের কিছু শরীরে ঢুকলে, এই ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়। আপনি তো জানেন একজন ফরেনসিকের কর্মী হিসেবে এই ধরনের কাজ আমাকে করতে হয়। সেদিনও আমাকে এরকম একটা স্মেল ডিটেকশনে আমাকে পুলিশই ডেকেছিল। যদিও রিটায়ারমেন্টের পর আমি কাজ করতে চাই না। তারপরেও ডাকলেও না গিয়ে পারা যায়। সেদিন গিয়ে দেখি মৃতের ঘরে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ। নিরামিশাষী মানুষের ঘরে পেঁয়াজ কোথা থেকে আসবে? আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যে পয়জন দিয়ে খুনটা হয়েছে, তাতে ফসফরাস ছিল।'

বসন্ত সাহা স্থির চোখে, চাপা গলায় বললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, সুনন্দর মৃত্যুর পিছনে কোনও কড়া অ্যাসিডের ভূমিকা রয়েছে?'

অনুকূলবাবু চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'আমার ভুলও হতে পারে।'

পায়ের আওয়াজে বসন্ত সাহা মুখ ফেরালেন। করিডোর ধরে ছন্দা প্রায় ছুটে আসছেন।

'কী হল!'

ছন্দা স্বামীর কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আর একজন...আর একজন মারা গেছে...।'

29

ছন্দা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মেহুল মারা গেছে।'

বসন্ত সাহা অবাক হয়ে বললেন, 'মেহুল! হু ইজ মেহুল? সে কে?'

ছন্দা কাঁপা গলায় বললেন, 'মুকুরদের পরিচিত। কাল পার্টিতে ছিল মেয়েটি। অল্প বয়স। তুমি দেখনি?'

বসন্ত সাহা মাথা নাড়লেন। অনুকূলবাবুও মনে করতে পারলেন না। বিস্ফারিত চোখে বললেন, ‘কাল সেও পার্টিতে ছিল! কী ভাবে মারা গেল?’

ছন্দা থেমে থেমে ঘটনাটা বললেন।

মেহুল মেয়েটি একা বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে থাকে। আজ সকালে কাজের লোক গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। সে বারবার ডোরবেল টেপে। কেউ দরজা খোলে না। সাধারণত এরকম হয় না। মেহুল একদিনের জন্য বাইরে গেলেও জানিয়ে যায়। ফোন করে দেয়। এতবার বেল বাজানোর পর কাজের মাসির সন্দেহ হয়। সে দরজায় চাপ দিয়ে দেখে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। এরপর সে ভয় পায়, লোকজন ডেকে আনে। দরজা ভাঙা হয়। দেখা যায় মেহুল সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বাথরুমে সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বমিও করেছে। ওই ফ্ল্যাটে একজন ডক্টর থাকেন। তিনি আসেন। পরীক্ষা করে জানেন, মেয়েটি মারা গেছেন এবং কাল রাতেই মারা গিয়েছে। শরীরে রাইগার মর্টিস শুরু হয়ে গিয়েছে। ডক্টেরের ধারণা, কড়া ধরনের কোনও পয়েজনের কারণ মৃত্যু।’

বসন্ত সাহা থমথমে মুখে বললেন, ‘তোমায় এত কে খবর দিল?’

‘তন্ময়ের কাছে ফোন এসেছে। মেহুলের এক সময়ের হাজব্যান্ড।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘তন্ময় ছেলেটি ঠিক আছে?’

ছন্দা বললেন, ‘সে তো আমাদের সঙ্গেই ছিল। মুকুরের কাছে। একসময়ে সুনন্দর অফিসে ও আর মেহুল চাকরি করত। এখন সেপারেশনে রয়েছে।’

বসন্ত সাহা উত্তেজিত ভাবে বললেন, ‘আমাকে ওই মেয়ের ঠিকানাটা দিতে পারবে।’

ছন্দা বললেন, ‘আমি জানি না। এই অবস্থায় মুকুরকে জিজ্ঞেস করা ঠিক যাবে না। ওই এলাকার পুলিশ জানবে। নিশ্চয় ফ্ল্যাটের লোকেরা থানায় ফোন করেছে।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘আচ্ছা, আমি দেখে নিচ্ছি। বালিগঞ্জ তো? এই তো কাছেই হবে।’

ছন্দা বললেন, ‘তুমি কি ওখানে যাচ্ছ?’

বসন্ত সাহা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, ‘হ্যাঁ, যেতে হবে। তোমাকে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

‘আমাকে গাড়ি পাঠাতে হবে না। আমি ফোন করে ক্যাব ডেকে নেব।’

বসন্ত সাহা নিচু গলায় বললেন, ‘মুকুর সুনন্দর রিলেটিভরা কেউ এসেছে?’

ছন্দা একটু চুপ করে থেকে বললেন, ‘ওদের খুব কিছু আত্মীয় টাত্মীয় আসবে বলে মনে হয় না। মুকুরের কাছ থেকেই শুনেছিলাম, ও সবার সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখে না।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘কেন!’

ছন্দা বললেন, ‘অতটা জানি না। শুনেছি বাচ্চা টাচ্চা হয়নি বলে আত্মীয়রা বড্ড জ্বালাতন করে।’

অনুকূল রায় বললেন, ‘ননসেন্স। আজকের যুগেও এসব হয়!’

ছন্দা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আর কী, এখন তো সব শেষ হয়ে গেল।’

বসন্ত সাহা এবার ছটফট করে উঠলেন। অনুকূলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন ‘ওসব এখন থাক, আমার সঙ্গে চলুন।’

অনুকূল রায় হতভম্ব হয়ে বললেন, ‘আমি! আমি কোথায় যাব?’

বসন্ত সাহা অনুকূলবাবুর হাত ধরে বললেন, ‘আমার সঙ্গে যাবেন ওই মেহুল মেয়েটির ফ্ল্যাটে যাবেন।’

অনুকূল রায় আরও অবাক হয়ে বললেন, ‘আমি গিয়ে কী করব?’

বসন্ত সাহা চোয়াল শক্ত করে বললেন, ‘গন্ধ চিনবেন। আমি বলে দিচ্ছি, এই কেস দুটোতে যেন আপনাকে এক্সপার্ট হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়।’

গাড়িতে উঠে অনুকূলবাবু বললেন, ‘আপনি কি কোনওরকম ফাউল প্লের সিগন্যাল পাচ্ছেন মিস্টার সাহা?’

বসন্ত সাহা স্টিয়ারিঙে হাত রেখে বললেন, ‘বুঝতে পারছি না। সেই কারণে অস্বস্তি হচ্ছে। আপনার গন্ধের ওপর অনেকটা নির্ভর করবে।’

গাড়ি চালাতে চালাতেই পর পর ফোন করতে লাগলেন বসন্ত। প্রথম ফোনটা থানায়।

‘স্যার, আমরা খবর পেয়ে রিচ করে গিয়েছি।’

‘একজন লেডি কনস্টেবল পাঠান।’

‘পাঠিয়েছি।’

‘আমাদের ডক্টর কেউ নেই ?’

‘স্যার দরকার হবে না, পোস্টমর্টেমে হলেই বোঝা যাবে।’

‘ঠিক আছে। খবর দিয়ে দিন, আমি পৌছোবার আগে কেউ যেন কোনও জিনিসে হাত না দেয়। বিশেষ করে তন্ময় বলে একজন আছেন, ওই মহিলার এক্স হাজব্যাণ্ড। ও যেন কিছু টাচ না করে।’

বসন্ত সাহা পরের ফোনটা করলেন সাগ্নিক মুখার্জির কাছে। এই ছেলেটি বছর তিনেক হল পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে এসেছে। বয়স খুব বেশি হলে তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর। আনইম্প্রেসিভ, আনস্মার্ট চেহারার ছেলেটিকে দেখলে ভরসা করা মুশকিল। পুলিশ বলে তো মনেই হয় না। মনে হয়, এই অফিসার ক্রিমিনাল ধরবে কী! অথচ এমন বুদ্ধিমান,স্মার্ট ছেলে গোয়েন্দা বিভাগ খুব কমই পেয়েছে। অনেক বড় অফিসারের মতো বসন্ত সাহাও ছেলেটিকে পছন্দ করেন। তিনি মনে করেন, সাগ্নিকের চোখে না পড়বার মতো চেহারা, বোকাসোকা লুক, নিজেকে আড়ালে রাখবার ভঙ্গি কাজে অনেক বেশি সাহায্য করে। ও অনেক সহজে লোকের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। ক্রিমিনালরা ওকে চট করে সন্দেহ করতে পারে না।

‘সাগ্নিক, হাতে কটা ফাইল ?’

ফোনের ওপাশ থেকে সাগ্নিক বলল, ‘দুটো স্যার। একটা চুরি, একটা মার্ডার।’

বসন্ত বললেন, ‘একটা কাজে আমাকে অ্যাসিস্ট করতে পারবে?’

সাগ্নিক বলল, ‘ইটস মাই প্লেজার স্যার। আপনার সঙ্গে কাজ করবার জন্য ডিপার্টমেন্টের সবাই তো

মুখিয়ে থাকে।'

বসন্ত সাহা হেসে বললেন, 'তবে একটা শর্ত আছে সাগ্নিক।'

'বলুন স্যার। যা বলবেন, মেনে নেব।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'কেসটা কিন্তু তুমি সলভ করবে না, করব আমি। আগের একটা কেস রঞ্জনী আগেই সলভ করে আমাকে একেবারে লজ্জার মধ্যে ফেলেছিল।'

ফোনের ওপাশে সাগ্নিক হেসে বলল, 'কার সঙ্গে আমার তুলনা করছেন স্যার! রঞ্জনী ম্যাডাম ইজ ব্রিলিয়ান্ট। আমি ওঁর নখের যুগ্যি নয়। স্যার কেসটা কী জানতে পারি?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'অবশ্য পারবে। আপাতত শুনে রাখ ফুড পয়জনিং। তবে কেস এখন কেস হয়ে ওঠেনি সাগ্নিক। আমার অস্বস্তির মধ্যেই রয়েছে। মে বি আমি বেশি ভাবছি। ইটস অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।'

সাগ্নিক ওপাশ থেকে বলল, 'আপনি বেশি ভাববেন না স্যার। নিশ্চয় কিছু একটা আপনাকে প্রিক করেছি।'

'হ্যাঁ করছে। ঘটনা আমার সামনে ঘটেছে কিন্তু কিছু বুঝতে পারিনি। এটা মেনে নিতে পারছি না। যাক রেডি থেকো লাগলে ডাকব।'

বাথরুমে কাছে সাদা কাপড়ে ঢাকা নগ্ন লাশ। কে বলবে, গতকাল সন্ধ্যেবেলা এই মেয়ে চোখ ধাঁধানো পোশাকে সেজেছিল? সাদা লম্বা ঝুলের কুর্তার সঙ্গে পরেছিল শাড়ি। সেই শাড়ির রঙ ছিল স্যাফ্রন। স্ট্রাইপও ছিল। অনেকটা লম্বা করে ফেলা সেই আঁচল ছিল ড্রেপিং করা। তবে। ছিপছিপে চেহারা এই মেয়েটিকে এতই ভাল দেখাচ্ছিল যে অনেক পুরুষই আড়চোখে দেখছিল।

বাথরুম বেডরুমের একপাশে। বোঝাই যাচ্ছে, বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে যাওয়ার মুখে মেয়েটি হমড়ি খেয়ে পড়ে। অনুকূল রায়কে নিয়ে বসন্ত সাহা ডেডবডির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। লেডি কনস্টেবল, লোকাল থানার ওসি সরে দাঁড়ালেন। বসন্ত চাপা গলায় বললেন, 'গন্ধ?'

অনুকূল রায় লাশের মাথার কাছে হাঁটু মুড়ে বসলেন। হাত বাড়িয়ে মেহুলের মাথার ওপর থেকে কাপড় সরালেন। মেয়েটির মুখে যন্ত্রণার ছাপ নেই। যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

অনুকূলবাবু লম্বা করে শ্বাস নিলেন। একবার, দু'বার, তিনবার। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এক গন্ধ। যদিও গন্ধ ফিকে হয়ে গিয়েছে।'

বসন্ত সাহা মুখ শক্ত করে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে পয়জনটা সেম ?'

অনুকূলবাবু বললেন, 'পসিবিলিটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

ডেডবডি পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যেতে বলে বসন্ত সাহা ঘর ফাঁকে করতে বললেন। এমনকি তন্ময়কেও চলে যেতে হল। দ্রুত ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন। তারপর এগিয়ে এলেন বিছানার কাছে। বালিশ, চাদর পরিপাটি। দেখে মনে হচ্ছে না রাতে কেউ এখানে শুয়েছে। খাটের একপাশে সাদা লম্বা ঝুলের কুর্তা আর একটা স্যাফ্রন রঙের শাড়ি অগোছালো ভাবে পড়ে। কালো রঙের ব্রা, প্যান্টি রয়েছে। কালকের পোশাক? হতে পারে। মেয়েটি কি পোশাক খোলবার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ? শোওয়ার আগেই?

হঠাৎই অনুকূলবাবু বলেন, 'ওটা কী?'

খাটের নিচে কতগুলো কাগজের টুকরো। কাগজ নয়, কোনও ফটো কুচিকুচি করে ছেঁড়া হয়েছে।

বসন্ত সাহা হুমড়ি খেয়ে বসে পড়লেন।

30

কখন কোনটা কাজে যে লেগে যায় কে বলতে পারে? একসময়ে 'জিগ্ স্ পাজল্' করবার অভ্যেস যে এভাবে কাজে লেগে যাবে বসন্ত সাহা ভাবতে পেরেছিলেন? পিচবোর্ডের ছোট ছোট টুকরো সাজিয়ে আস্ত পশুপাখি তৈরি করায় যেমন মজা ছিল, তেমন ছিল উত্তেজনা। ধাপে ধাপে চেহারা পায়। কখনও সাজাতে ভুল হয়ে যায়। আবার নতুন করে সাজাতে হত। শিশু বয়েসে পশুপাখি দিয়ে শুরু হলেও আর একটু বড়

হতে খেলা কঠিন হয়েছিল। মা নিউমার্কেট থেকে জটিল পাজল্ খুঁজে এনে দিতেন। সেখানে টুকরো জুড়লে রোবট, স্পেশশিপ্, গাড়ি।

বসন্ত সাহা মেঝের ওপর বসেই ফটোর টুকরোগুলো দ্রুত হাতে মেলাতে লাগলেন। থুতনি, নাক, কপাল, হাত, পা। একজনের চেহারা ক্রমাগত স্পষ্ট হতে লাগল। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই বসন্ত সাহা বুঝতে পারলেন, না, একজন নয়। আরও একজনের ফটোতে আছে। সে কে?

'অনুকূলবাবু, আমি এটা একটু দেখি, দেখি জোড়াতালি কিছু লাগাতে পারি কিনা। আপনি ততক্ষণ ঘরটায় চট করে চোখ বুলিয়ে নিন।'

অনুকূলবাবু রায় ঠোঁটের কোণে একটু হেসে বললেন, 'আমি চোখে বুলিয়ে কী করব? আমি তো আর আপনার মতো ডিটেকটিভ নই। আমার কারবার হাতের ছাপ, পায়ের ধুলো নিয়ে। ঘটনার পর যত মানুষ ঘরে ঢুকেছে তাতে সেসবের দিকে নজর করবার মানেই হয় না। সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া বিষয়টা এখনও হাতের ছাপ নেওয়ার পর্যায়ে পৌছোয়নি।'

বসন্ত চাপা গলায় বললেন, 'আপনি ডিটেকটিভের থেকেও বেশি। আমরা ছোটখাটো কিছু মিস্ করলেও আপনারা ছাড়বেন না। আসলে আমি একটু সময় চাইছি, এখুনি ওরা বডি নিতে আসবে। তার আগে ফটোটা জুড়তে পারি কিনা দেখছি। জুড়তে না পারি একটা চেহারা যদি পাই তাহলেও হবে। একটার মেয়ের মৃত্যুর আগে একটা ফটোগ্রাফ এভাবে কুটিকুটি ছিঁড়েছে এটা তো কোনও স্বাভাবিক ঘটনা নয়।'

অনুকূল রায় বললেন, 'এই কাজেরও ফরেনসিক হয়। ছেঁড়া পার্ট জুড়ে ফটো চেনা যায়।'

বসন্ত সাহা গলা আরও নামিয়ে বললেন, 'জানি। এই মুহূর্তে হাতে সময় নেই। ওসব পরে করা যাবে। অবশ্য যদি প্রয়োজন হয়। স্যার, এখনও তো নিশ্চিত নই যে এটা কোনও ফাউল প্লে।'

অলুকূলবাবু বসন্ত রায়ের 'বস' নয়। চাকরিতে উঁচু পদে কাজ করেন এমন নয়। অনুকূলবাবু তো সারাসরি পুলিশের লোকই নন। তিনি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, অপরাধ মনঃস্তত্ত্বের একজন পণ্ডিত। ছাত্রদের পড়ান। সেই সম্মানে বসন্ত রায় তাকে মাঝেমধ্যে 'স্যার' ডাকেন। এই ভদ্রলোককে তিনি আগে থেকেই জানেন।

ইনি যে মুকুর–সুনন্দর পরিচিত এটা জানা ছিল না। কাল মুকুরের বাড়িতে দেখতে পেয়ে যেমন অবাক হয়েছিলেন, তেমন খুশিও হয়েছিলেন।

অনুকূলবাবু বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। আপনি কাজ চালিয়ে যান মিস্টার সাহা।'

কথা শেষ করে অনুকূলবাবু ঘরের একদিকে সরে গেলেন। তবে চট করে কিছুতে হাত দিলেন না। তাঁর কাজ নেড়েঘেঁটে দেখা নয়। কোনও কিছুতে হাত দিলে প্রমাণ নষ্ট হয় এই জ্ঞান তাঁর আছে। সঙ্গে গ্লাভস থাকলে সুবিধে হত। ফিঙ্গার প্রিন্ট নষ্ট হত না। তবে এসব ভেবে বাড়ি থেকে বের হননি। সুনন্দর ভংয়কর খবরটা শুনে হাসপাতালে ছুটে এসেছিলেন। তিনি সতর্ক নজরে বোঝবার চেষ্টা করলেন ঘরে কোনও রকম ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে কিনা। মিসেস সাহা বলছিলেন, মেয়েটি একা থাকে। কাল রাতে কেউ কি ঘরে এসেছিল? আসতেই পারে। সে নারী পুরুষ যে কেউ হতে পারে। আত্মীয়স্বজনও আসতে পারে।

অনুকূলবাবু সর্তক চোখে চারপাশ দেখতে লাগলেন। পাশের ঘরে গেলেন। সেটাও বেডরুম। আয়তনে ছোটো। একটা খাটের ওপর বিছানা পাতা। বিছানাটি পরিপাটি। কাল অন্তত কেউ ব্যবহার করেনি। এই ঘরটা কার? কে এখানে থাকে? কেউ নাও থাকতে পারে।

টু রুমের ফ্ল্যাটে মেহুল একাই থাকে। আবার গেস্টরুমও হতে পারে। সুতরাং কেউ পাকাপাকি এখানে থাকতো ভাববার এখনই কোনও কারণ নেই। আবার এও হতে পারে, সেপারেশনের আগে হাজবেন্ডের সঙ্গে এই ফ্ল্যাটেই মেয়েটা থাকত।

ঘরের একপাশে একটা টেবিল। অনুকূলবাবু টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাগজপত্র রয়েছে। একটু নাড়াচাড়া করলেন। অফিসের কাগজ। পাশে একটা বাক্স। আয়তনে ছোটো। বাক্সের ঢাকা খুললেন। ওষুধের বাক্স। যেমন আর পাঁচটা বাড়িতে থাকে। অনুকূলবাবু ওষুধের স্ট্রিপ, প্যাকেট উলটে পালটে দেখতে লাগলেন। মেয়েটা কি সেডাটিভ নিত? সুসাইড, মার্ডার এমনকি হঠাৎ হার্ট ফেলিওর ধরণের ঘটনাতেও ওষুধের বাক্স পরীক্ষা করা খুব জরুরি। মৃত মানুষটি ঘুমের ট্যাবলেটের অভ্যেস ছিল কিনা দেখতে হয়। অনুকূলবাবু এমন কেসও দেখেছেন, যেখানে সিডেটিভের অভ্যেস না থাকলে হয়তো খুনটাই হত না। ওষুধ খাওয়া গভীর ঘুমের মধ্যেই মরতে হয়েছে। ভোঁতা কোনও অস্ত্র দিয়ে মাথার পিছনে

মেরেছে। যদি ঘুমের ওষুধ না খেত, সরে গিয়ে বা পাল্টা আক্রমণ করে হয়তো বাঁচতে পারত। এক্ষেত্রেও শরীর খারাপ বুঝতে পেরে মেহুল হয়তো ডাক্তারকে খবর দিতে পারত। পরিচিত কাউকে ফোন করতে পারত। তবে সিডেটিভ ধরণের কোনও ওষুধ দেখা গেল না। ওষুধের বাক্স বন্ধ করবার মুখে, ছোটো একটা রঙচঙে প্যাকেটে চোখ পড়ল অনুকূল রায়ের। প্যাকেটটা তুলে নিলেন। ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ। ভুরু কোঁচকালেন অনুকূল রায়। প্যাকেট উলটে তারিখ দেখলেন। দশদিন আগের। প্যাকেটটা পকেটে রাখলেন অনুকূল বাবু। বসন্ত সাহাকে দিতে হবে।

এদিকে অন্য ঘরে খুব বেশিক্ষণ লাগল না, বসন্ত সাহা ছেঁড়া ফটোর একটা অংশ জুড়ে ফেলেছেন। মেয়েটির মুখ। চমকে উঠলেন। এ কী! এতো মুকুর! চোখ আর ভুরু দেখেই চেনা যাচ্ছে। সবটা জুড়লে হয়তো একটা পোস্ট কার্ডের মাপ হবে। মুকুরের এই রঙিন ফটোটা এখানে এলো কী করে? আরও টুকরোগুলো জুড়তে লাগলেন উত্তেজিত বসন্ত সাহা। ধীরে ধীরে পুরুষ মানুষটি 'চেহারা' পেতে লাগল। পায়জামা পাঞ্জাবি পরা পুরুষ। কে এটা? মুখের অংশ তৈরিতে আরও চমকে গেলেন বসন্ত সাহা। সুনন্দ না? হ্যাঁ সুনন্দই তো। মুকুর আর সুনন্দ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কোনও একটা সী বিচ। মুকুর পড়ে রয়েছে নীল রঙের শালোয়ার কামিজ। সাদা ওড়না উড়ছে। সুনন্দর পাঞ্জাবিও উড়ছে। সে ডান হাত দিয়ে বউকে জড়িয়ে রয়েছে। ফটোর রঙ এবং ফ্রেমিং দেখে বোঝা যাচ্ছে, ট্যুরিস্ট স্পটে ঘুরে বেড়ানো কোনও পেশাদার ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি। সী বিচ, পাহাড়ে গলায় ঝোলানো ক্যামেরা নিয়ে এরা ঘুরে বেড়ান। ফটো তুলে তিন ঘন্টা বাদে হোটেলে ডেলিভারি দিয়ে আসেন। এই ধরনের ফটোর মাপ সাধারণত পোস্টোকার্ড মাপেরই হয়। এটা কোথায়? পুরী? দিঘা? নাকি সাউথ ইন্ডিয়ার কোনও সী বিচ? যেখানেই হোক, এই ফটো এখানে এল কী করে? মেহুলি নামের মেয়েটা সেই ফটো এভাবে ছিঁড়লই বা কেন? তবে কী...?

বসন্ত সাহা ধড়্ফড়্ করে উঠে বলল, 'এখনই চলুন অনুকূলবাবু। এক মিনিটও দেরি নয়।'

মেহুলির ফ্ল্যাট থেকে বেরতেই তন্ময় এগিয়ে এল। তার চোখে মুখে উদ্বেগ। সে বলল, 'স্যার, কী হয়েছে?'

বসন্ত সাহা এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, 'আমি বলে দিয়েছি ডেডবডি পোস্টেমর্টেমের জন্য নিয়ে যাবে।' তারপর লোকাল থানার অফিসারকে কাছে ডাকলেন। নিচু গলায় বললেন, 'আপাতত কাউকে ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেবেন না। ডেডবডি নিয়ে যাওয়ার সময়েও নয়। তারপর ভাল করে সার্চ করুন। দুটো জিনিসের ওপর খেয়াল রাখবেন। শিশি আর কোনও রকম ফটো। সেন্টের শিশি হলেও গুরুত্ব দেবেন।'

অনুকূলবাবু বললেন, 'কোনও কিছুতে হাতে দেবার আগে গ্লাভস ইউজ করবেন। যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন যাতে কোনওরকম ছাপ নষ্ট না হয়। পরে দরকার হতে পারে।'

অফিসার বললেন, 'স্যার, এটা কি কোন ক্রাইম বলে মনে করছেন? মার্ডার? ডক্টর যে বললেন, ফুড পয়জনিং।'

বসন্ত সাহা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'পয়জন তো বটেই, কিন্ত সেটা খাবারে এলো কী করে? এখনই ক্রাইম বলা যাবে না, তবে পসিবিলিটিস উড়িয়ে দেওয়ারও কিছু নেই। একটা একটা করে সন্দেহ নেগেট করতে করতে এগোতে হবে। যাক, গতকাল এই মেয়েটির কাছে কেউ এসেছিল কিনা জানবার চেষ্টা করুন।'

অফিসার বললেন, 'সেটা সমস্যা হবে না। সিকিউরিটির কাছে ভিজিটরস্ রেজিস্টার আছে মনে হয়।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'গুড। দেখুন ভাল করে।'

31

গাড়িতে উঠে অনুকূল রায় বললেন, 'এবার কোথায়?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'প্লেস অব অকার্ন্স। যাকে বলে অকুস্থল।'

'দ্য ড্রিম' ফ্ল্যাটের নেমেপ্লেটে ওপর রজনীগন্ধার মালা। মুকুর নিউমার্কেটের ফুলের দোকানে যখন অর্ডার দিতে গিয়েছিল, তারা গাঁদা ফুল দিতে চেয়েছিল।

'ম্যাডাম, এই ধরনের প্লেকে গাঁদা ফুলের পর্দাই দেওয়া হয়। ভিআইপিরা এসে ফলক উন্মোচন করেন।'

মুকুর বলল, 'এটা তো কোনও ফলক নয়, নেমপ্লেট। তাও বাড়ির নয়, ফ্ল্যাটের। আর আমার এই নেমপ্লেট কোনও ভিআইপি ওপেন করবে না। আমার বন্ধু করবে। অতএব এখানে নো গাঁদাফুল।'

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুনন্দ বলেছিল, 'তাহলে গোলাপের।'

দোকানদার বলন, 'তাই ভাল। সুতো দিয়ে করে দেব। একেবারে পর্দার মতো। নেমপ্লেট দেখা যাবে না। পর্দা সরালে তবে সবাই দেখতে পাবে।'

মুকুর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, গোলাপ নয়। আমার বন্ধুর গোলাপ ফুল পছন্দ নয়।'

সুনন্দ অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার এই বন্ধুটি কে বলও তো! গোলাপও পছন্দ করে না! বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না মুকুর?'

মুকুর হেসে বলল, 'বলেছি তো, এখন নাম বলব না। সারপ্রাইজ। তবে ওই মেয়ে গোলাপের থেকে রজনীগন্ধা বেশি পছন্দ করে। কলেজে কোনও অকেশন হলেই রজনীগন্ধার মালা মাথায় দিয়ে আসত। এমনকি কোথাও গেলেও রজনীগন্ধার স্টিক হাতে।'

সুনন্দ বলল, 'ও ইনি তাহলে তোমার কলেজের বান্ধবী?'

মুকুর কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'এই রে ধরা খানিকটা পড়ে গেলাম। যাক, ভাই, আপনি রজনীগন্ধা দিয়ে জিনিসটা বানিয়ে দিন। সামনে পর্দার মতো ঝুলবে। হোয়াইট কার্টেন।'

সেই রজনীগন্ধার পর্দা সরিয়ে সেই ফ্ল্যাটের নাম উদ্বোধন করেছিল হৈমন্তী। সবাই হাততালি দিয়েছে। তারপর 'দ্য ড্রিম' এর সামনে দাঁড়িয়ে ফটো সেশনও হয়েছে। সবাই মোবাইলের বাগিয়ে ধরে। জন্মদিন অনেক হয়, ফ্ল্যাটের জন্মদিন আবার কবে পাওয়া যাবে ঠিক আছে? ফটো তুলে সবাইকে দেখানো যাবে। নেমপ্লেটের মালা শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু ফেলা হয়নি। সেই শুকনো মালা যেন নিয়তির মতো হাসছে। বাড়ির নিচে পুলিশের ভ্যান। বসন্ত সাহার গাড়ি থামতে লোকাল থানার একজন সাব ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে স্যালুট করলেন।

বসন্ত সাহা বললেন, 'কেউ ঢোকেনি তো?'

অল্প বয়সী ইন্সপেক্টর বলল, 'না স্যার, সেই যে বাড়ির সবাই বেরিয়ে গিয়েছে আর ফেরেনি। শুধু কয়েকজন মহিলা এসেছিলেন। বললেন,ওই ফ্ল্যাটের ম্যাডামের সঙ্গে স্কুলে পড়ান। কলিগ। হাসপাতালের

নাম জানতে চাইছিলেন। বলতে পারিনি। স্যার, ওসি সাহেব একটু পরেই আসেছেন। আজ কোর্টে একটা মামলা ওঠবার আছে, কাগজপত্র রেডি করছেন।' গলায় কৈফিয়তের সুর। কৈফিয়ত তো দিতেই হবে। বসন্ত সাহা অনেক উঁচু পদে রয়েছেন। পুলিসের ভাষায় 'বড়সাহেব'। 'বড়সাহেব' নিজের এলাকায় কোনও কাজে এলে থাকাটা জরুরি।

বসন্ত সাহা ফ্ল্যাটে উঠে এলেন। ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। ইন্সপেক্টরকে বললেন, 'আপনি বাইরে থাকুন। আমারা যতক্ষণ ভিতরে থাকব, কাউকে ঢুকতে দেবেন না। আসুন অনুকূলবাবু।'

ঘরে ঢুকে বললেন, 'প্রথমেই কিচেনে যাব। সেটা যেন কোন দিকে?'

অনুকূল রায় বললেন, 'কিচেনের খবর তো রাখি না। কাল এই ড্রইংরুমে বলেছিলাম এটুকু মনে আছে। আচ্ছা তাও চলুন দেখা যাক। তবে কাল শুনেছিলাম যেন ছাদে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। কেটারারের লোকের তো ওখান থেকেই ওঠা নামা করছিল।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'ছাদে হোক, আমি রান্না দেখতে চাই না। গতকাল রাতের রেসিডিউ আর ওয়েস্ট কোথায় গেল সেটা দেখতে চাই। আসুন কিচেন উঁকি মারি। আপনি স্যার নাক রেডি রাখবেন। কোনও গন্ধ পেলেই বলবেন।'

অনুকূল রায় বললেন, 'বাসি, পচা স্মেল ছাড়া কীই বা পাবে? তাও চলুল।'

রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন। বাসি খাবার তো দূরের কথা, কাপ প্লেটও সব পরিস্কার। এমনকী এক কোনায় রাখা গারবেজ বিনটা পর্যন্ত পরিস্কার। বসন্ত সাহা দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বললেন, 'এটাই ভয় পাচ্ছিলাম। সব ওয়াশ হয়ে গেলে প্রমাণ বলে কিছু থাকবে না। কোন খাবারের সঙ্গে পয়জন বোঝবার উপায় নেই।'

অনুকূলবাবু বললেন, 'এটাই তো স্বাভাবিক। কাল পুরো খাবারটাই তো ওয়েস্ট হয়েছে। সুনন্দ অসুস্থ হয়ে পড়বার পর পার্টি বন্ধ হয়ে গেল। কেউই খাবার মুখে দেয়নি। কেটেরারের লোকেরা নিশ্চয় অনেকটা নিয়ে গিয়েছে। বাকিটা বাইরে ফেলে দিয়েছে।'

বসন্ত সাহা মাথা নেড়ে খানিকটা নিজের মনেই বললেন, 'সেটাই ঠিক। দ্যাট ইজ ট্রু... দ্যাট ইজ ট্রু। তারা তো জানত না এরকম একটা ভংয়কর ঘটনা ঘটবে। আসুন আমরা বরং ঘরগুলো যতটা সম্ভব দেখে নিই। আমি এদিকটা দেখি, আপনি ওদিকের ঘরে ঢুকুন।'

অনুকূলবাবু একটু হেসে বললেন, 'মিস্টার সাহা আমাকে আপনি বারবার অ্যাসিটেন্ট হিসেবে সঙ্গে নিচ্ছেন বটে কিন্ত তাতে লাভ কিছু হচ্ছে না।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'ছিছি, অ্যাসিস্টেন্ট বলছেন কেন? আপনি একজন বিচক্ষণ মানুষ বলেই খাটাচ্ছি। আপনি তো প্রথম, যিনি আমাকে ইঙ্গিত ঘটনাটা অ্যাক্সিডেন্ট নাও হতে পারে। আপনিই তো গন্ধের কথা বলেছেন। একবার নয়, দু'বার। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। সাধারণ খাবার থেকে সালফিউরিকের গন্ধ কোথা থেকে আসবে ? নিশ্চয় সামথিং রঙ। নইলে হয়তো স্ট্রং ফুড পয়েজনিং বলে আমি কেসটা ইগনোর করতাম।'

অনুকূল রায় বললেন, 'থ্যাঙ্কিউ। আমি সেভাবে কিছু বলিনি। বুড়ো বয়েসে আমি কতটা আপনাকে হেল্প করতে পারব সেটাই ভাবছিলাম। তাছাড়া ইফ দেয়ার ইজ এনি ফাউল প্লে, আমি চাই সত্যটা প্রকাশ পাক। ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক। মুকুর মেয়েটিকে আমি এবং আমার ওয়াইফ খুবই পছন্দ করি। তার জীবনে এরকম একটা ডিজাস্টার ঘটে যাবে আমরা ভাবতেও পারছি না।'

বসন্ত সাহা বললে, 'আমরা আপাতত একটা অ্যালবাম খোঁজবার চেষ্টা করব। বা ফটোর খাম।'

অনুকূল রায় মাথা নেড়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

বসন্ত সাহা বেডরুম দিয়ে শুরু করলেন। যতটা সম্ভব না ঘাঁটাঘাটি করে তল্লাশি চালানো যায়। মুকুর ফিরে এসে যেন বুঝতে না পারে। যদিও বোঝাবুঝির মেন্টাল স্টেজে সে নেই। তারপরেও ঘর তল্লাশি হয়েছে সেটা এখনই না জানা ভাল। বিছানার চাদর, গদি অল্প নেড়ে চেড়ে দেখলেন। তারপর দেরাজ, ড্রেসিং টেবিল, হোয়াটনটে যেকটা ড্রয়ার দেখতে পেলেন খুলে দেখতে দেখতে ড্রেসিং টেবিলের নিচের ড্রয়ারে রাখা একটা ফাইল চোখে পড়ল। ওপরে বড় বড় করে মুকুরের নাম লেখা। তারওপরে লেখা 'প্রাইভেট'। 'প্রাইভেট' লেখা দেখে ফাইলটা তুলে পিছন দিক থেকে ফর্‌ফর্‌ করে ওলটাতে শুরু করলেন বসন্ত সাহা।

মুকুরের ডাক্তারি ফাইল। অজস্র রিপোর্ট আর প্রেসক্রিপশন। বসন্ত সাহা ওপর ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন। তারিখ দু'বছর আগে থেকে। বেশি বোঝা যাচ্ছে না, শুধু বোঝা যাচ্ছে, মেয়েলি বিষয়। মেয়েদের বাচ্চাকাচ্চা হওয়া নিয়ে ট্রিটমেন্ট, ডক্টারের পরামর্শ রয়েছে। বসন্ত সাহা ভুরু কোঁচকালেন। আচ্ছা, ছন্দা এরকম একটা কী যেন বলছিল না?

মুকুর মেয়েটি মা হতে পারছে না— ধরনের কিছু কি বলেছিল? তাই হবে। পিছন থেকে পাতা উলটে একবারে প্রথম পাতায় পৌঁছে ফাইলটা রাখতে গিয়ে থমকে গেলেন বসন্ত সাহা। একী শেষ পাতায় এটা কী রিপোর্ট! ক্লিনিকের রিপোর্ট। রিপোর্টের ওপরে তারিখের দিকে তাকালেন বসন্ত সাহা। তিন দিন আগের তারিখ।

অনুকূল রায় ঘরে ঢুকে বললেন, 'এই ডায়েরিটা দেখুন তো কাজে লাগবে কিনা। মনে হচ্ছে, মুকুর কিছু ব্যক্তিগত কথা লিখে রেখেছে। নোটসও আছে। ড্রইংরুমে পেলাম। আর একটা কথা ফ্রিজেও দেখলাম খাবার টাবার কিছু নেই। শুধু ট্রেতে খানিকটা কেক পড়ে রয়েছে। কাল কেকটা কাটা হয়েছিল।'বসন্ত সাহা হাত বাড়িয়ে মুকুরের সিক্রেট ডায়েরিটা নিয়ে বললেন, 'ওই কেক তো আমার সবাই খেয়েছিলাম।'অনুকূল রায় বললেন, 'হ্যাঁ, আর যাতেই হোক ওতে কোনও বিষ নেই।'

32

'ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের ভিতর সবথেকে পরিচিতি, স্বীকৃতি ও সাফল্য পেয়েছিলেন ফরাসি শিল্পী পিয়ের অগুস্ত র‍্যনোয়ার। কী আঁকব এবং কেমন করে আঁকব এই বিষয় দুটিতে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র ও অনন্য। অথচ তাঁর ছবিগুলি ছিল যথেষ্ট জটিল। নতুন ভাবনাকে গ্রহন করবার জন্য সর্বদা তাগিদ অনুভব করতেন র‍্যনোয়ার। আবার পূর্বসুরীদের কাজকে আত্মস্থ করে, অনুভব করে, ধারা অনুসরণ করতে কখনও দ্বিধাবোধ করেননি। ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পী ক্লোদ মনে, আলফ্রেড সিসলি, এদগার দেগা, এদুয়ার মানে, ফ্রেদরিক বাজির কাজ তিনি ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন। নিবিষ্ট ভাবে দেখেছেন তাদের ড্রইং এর প্যাটার্ন, রঙের পদ্ধতি, আলো ফেলবার কৌশল, ব্রাশ স্ট্রোক। ছবিগুলি দেখতে দেখতে তিনি ছবির অন্তরে প্রবেশ করে যেতেন। বিষয় বাছাইয়ের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পী ফ্রাঁসোয়া বুশের, আঁতোয়ান ওয়াতো, , জাঁ ওনারো ফ্রাগোনার, ইউজিন দোলাক্লোয়ারের মতো শিল্পীদের কাজেও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শিল্পরসিকরা বলেছেন, অগুস্ত র‍্যনোয়ার চিত্রকলায় আধুনিক মন এবং ঐতিহ্যের মিলন ঘটিয়েছেন। আর তিনি নিজে কী বলেছেন? বলেছেন, আমি তো নতুন কিছু করিনি, আমার পূর্বসুরীরা যে কাজ করেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করেছি।'

'স্যার, এই যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট।'

হাতের ম্যাগাজিন সরিয়ে মুখ তুললেন বসন্ত সাহা। মনে মনে ভাবলেন, এই এক বিপত্তি। যখন যেটা ঘাড়ে চাপে, কিছুতেই নামতে চায় না। একেবারে সিন্দ্‌বাদের ভূতের মতো বসে থাকে। কিছুদিন আগে চেপে বসেছিল ক্লাসিকাল মিউজিক, এবার এসেছে চিত্রকলা। সুযোগ পেলেই বই, ম্যাগাজিন ঘেঁটে জেনে নেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে, পেইনটিং ব্যাপরটা ঠিক কী? এখন যেমন র‍্যনোয়ার ওপর একটা প্রবন্ধ পড়ছিলেন। কিছুদিন আগে র‍্যনোয়ার কিছু ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান বসন্ত সাহা। তারপর থেকেই যেখানে এই শিল্পীর ওপর কিছু লেখা দেখছেন আগে পড়ে নিচ্ছেন। আজও অফিসে এসে টেবিলে পড়ে থাকা একটা ম্যাগাজিনে চোখ পড়ল। চিত্রকলার ওপর ম্যাগাজিন। অফিসে এসে ফাইল টেনে নেওয়ার কথা। সাধারণত সেটাই করেন বসন্ত সাহা। আজ ফাইলের বদলে ম্যাগাজিনটা টেনে নিলেন। চিত্রকলার ম্যাগাজিন বলেই টানলেন। দু'পাতা ওলটাতেই র‍্যনোয়ার লেখাটা চোখে পড়ল। ইদানিং এ ধরনের ম্যাগাজিন সংগ্রহ করছেন বসন্ত সাহা।

সাগ্নিক আবার বলল, 'স্যার, এই যে রিপোর্ট। সুনন্দ রায় এবং মেহুল সেন দুজনেরই রিপোর্ট রয়েছে।'

বসন্ত সাহা এবার একটু লজ্জা পেলেন। গোয়েন্দা বিভাগের বস সকালে অফিসে এসে আর্ট নিয়ে প্রবন্ধ পড়ছেন এটা কিঞ্চিৎ লজ্জারই কথা। গোয়েন্দা অফিসার অফিসে ঢুকে খুন, জখম, রাহাজানি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তা না করে গান, ছবি নিয়ে সময় নষ্ট! নেহাত অফিসের সবাই 'স্যার' এর এসব খেপামির কথা জানে তাই কিছু ভাবে না।

সাগ্নিক একটু আগেই ফোনে কথা বলে নিয়েছে। বসন্ত সাহা তখন গাড়িতে।

'স্যার, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছি।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'ভেরি গুড। আমি অফিসে ঢুকছি। তুমি এস।'

সাগ্নিক বলল, 'স্যার, একটু দেরি হলে অসুবিধে হবে? একটা ফাইল ছেড়ে দিতে হবে। মার্ডার কেস। ফাইলটা আগে না ছাড়লে হোম ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট পাঠাতে পারছে না। অ্যাসম্বেলিতে কোয়েশ্চন আছে।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'নো প্রবলেম। টেক ইওর টাইম। তারপর চলে এসো।'

সাগ্নিক বলল, 'যাওয়ার আগে আপনাকে ইন্টারকমে বলে নেব স্যার।'
বসন্ত সাহা বললেন, 'কিচ্ছু করতে হবে না। সোজা চলে আসবে।'
সাগ্নিক এসে দেখে, বস ম্যাগাজিনে মগ্ন। একবারে ডুবে গিয়েছে। কভার দেখে বোঝা যাচ্ছে, ম্যাগাজিনের বিষয় ছবি টবি কিছু একটা হবে। আর যাই হোক, পুলিশি কোনও বিষয় নয়। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে ডাকে।
বসন্ত সাহা লজ্জা পাওয়া হেসে বললেন, 'বসো। আসলে একটা ইন্টারেস্টিং লেখা হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। আমার এই এক সমস্যা তোমরা তো জানও সাগ্নিক। কোনও সাবজেক্টে একবার ঢুকে পড়লে চট কর বেরোতে পারিনা। যেখানে পাই নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। এখন যেমন ছবি আঁকা নিয়ে পড়েছি। অভ্যেস খুবই লজ্জার। পুলিশ হয়ে গানবাজনা, ছবি, সায়েরি নিয়ে ব্যস্ত হওয়া মোটে কাজের কথা নয়।'

সাগ্নিক চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'কোনটা কাজে লাগবে তা কি স্যার আগে থেকে বলা যায়?'
বসন্ত সাহা বললেন, 'এইটা ঠিক বলেছ। আমাদের পেশায় কোনটা কাজের কোনটা ফেলে দেওয়ার কেউ বলতে পারে না। আমি তখন একেবারেই জুনিয়র, পোস্টিং হয়েছে নর্থ বেঙ্গলে। দশটা থানা এলাকা জুড়ে কাজ করতে হয়। এর মধ্যে একটা থানায় ওসি সাহেব খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারতেন। আমি তো একাট খুনের কেসে ওখানে গিয়ে হাজির। পাবলিক দেখি খুব খেপে রয়েছে, আমাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাল। তাদের বক্তব্য হল, পুলিশ যদি বাঁশি বাজায় তাহলে এরকম খুনখারাবি নাকি চলতেই থাকবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। শুধু পাবলিক নয়, ওপরতলা থেকেও আমাকে বলা হল, ওসির বাঁশি বিষয়টা একবার খোঁজ নিয়ে আসবে। আমি তো পড়লাম অথৈ জলে। খুনের তদন্ত করতে এসে বাঁশি নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হবে আমি ভাবতেও পারি। বাঁশির তো আমি কিছুই জানি নারে বাবা। শেষ পর্যন্ত কী হল জানো?'
কথা থামিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসলেন বসন্ত সাহা। সাগ্নিক উৎসুক হয়ে বলল, 'কী হল?'
বসন্ত সাহা বললেন, 'শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে সাগ্নিক, সেবার বাঁশিই মার্ডার কেসটা সলভ করে দিয়েছিল।'
সাগ্নিক বলল, 'বাঁশি! বাঁশি দিয়ে খুনী ধরলেন?'
বসন্ত সাহা বললেন, 'ধরিনি, তবে বুঝতে পেরেছি। তোমাকে একটু বাঁশির স্বরগমটা একটু বলে নিই। বাঁশির ছটা ছিদ্র দিয়ে সংগীতের সাতটি স্বর, সা, রে গ, ম, প, ধ ও নি বাজানো হয়। বাঁশিতে সমস্ত ছিদ্র যখন বন্ধ করা থাকে, তখন তার মূলসুর নির্গত হয়। এটা ''প''। বাঁশির বন্ধ দিকের প্রান্ত থেকে সবচেয়ে দূরের ছিদ্রটি শুধু খোলা রাখলে, "ধ" সুরটি বের হয়। একই ভাবে ওই ধারেরই দুটো ছিদ্র খুললে "নি", ধারের তিনটি ছিদ্র খুললে "সা" আর যদি চারটেই খুলে দাও তুমি, "রে" শুনতে পাবে। আর পাঁচ নম্বর ছিদ্র উন্মুক্ত

হলে "গ" শুনবে। আর যদি সব ছিদ্র খোলা হয়? বেরোবে "ম" সুর। প্রত্যেক বাঁশিরই একটি মাত্রা বা স্কেল থাকে। বাঁশির দৈর্ঘ্য, ভিতরের ব্যাস এবং ছিদ্রের মাপের ওপর এই মাত্রা ঠিক হবে। বংশীবাদক তাঁর পছন্দমতো বাঁশি বেছে নানা মাত্রায় সুর তৈরি করতে পারেন। যে বাঁশি দৈর্ঘ্যে ছোট, তার সবগুলি ছিদ্রই প্রায় সমান আকৃতির। এগুলি হল জি স্কেলের। আবার তুলনায় লম্বা বাঁশি সি স্কেলের। যিনি বাঁশি বাজান তিনি ঠোঁট থেকে বের করা বাতাসের বেগ কমিয়ে বা বাড়িয়ে যথাক্রমে মন্দ্র সপ্তক অথবা তার সপ্তক সৃষ্টি করতে পারে।'

সাগ্নিক অবাক হয়ে বলল, 'এসবের সঙ্গে মার্ডার কেসের সম্পর্ক কী ছিল?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'মার্ডারটা হয়েছিল একটা ঘরের ভিতর। লম্বা সরু একটা গোডাউনের ঘর। আমাদের দেখে মনে হল, ঘরের একপ্রান্তে শুধু একটা দরজাই রয়েছে। সেই দরজাটা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। তাহলে খুনি ঢুকল কোন পথে? বেরোলই বা কী করে? এদিকে কে খুন করেছে মোটামুটি আমাদের কাছে পরিষ্কার। ওই গোডাউনেরই এক কর্মীর কীর্তি। কিন্তু তাকে ধরব কী করে? লোকাল পুলিশ অথৈ জলে পড়েছে বলেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি অনেক কষ্ট করে একজন সাক্ষীকে খুঁজে বের করি। সেই লোক ওই গোডাউনের পিছন থেকে খানিকটা তীক্ষ্ণ, খানিকটা আর্তনাদের আওয়াজ পেয়েছে। দরজা বন্ধ ঘর থেকে এই আওয়াজ এলও কীভাবে? সেই বংশীবাদক ওসি সাহেব আমাকে পথ দেখাল। তার লম্বা আড় বাঁশিটি এনে তিনি আমাকে সরগম শোনালেন। আমিও মজা দেখছিলাম। এই ওসি সাহেব কি তবে বাঁশি নিয়েই তদন্ত করে বেড়ান! কিন্তু মজা বেশিক্ষণ করতে পারলাম না। তিনি দেখালেন, বাঁশির বন্ধ দিকের প্রান্ত থেকে সবচেয়ে দূরের ছিদ্রটি শুধু খোলা রাখলে, সরগমের 'ধ' সুরটি বের হয়। তার মানে গোডাউন ঘরের পিছনে কোনও ছিদ্র রয়েছে। আওয়াজ বের হওয়ার কোনও পথ। তখনই আমরা গোডাউনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। চারটে বড় বড় আলকাতরার ড্রাম সরিয়ে আমার একটা ছোট জানলা খুঁজে পাই। গরাদবিহীন সেই জানলা দিয়ে অনায়াসে কেউ যাতায়াত করতে পারে। সেই রাতেই আমার খুনিকে অ্যারেস্ট করি।'

সাগ্নিক বলে, 'ইউনিক ডিটেকশন।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'অবশ্যই। বাঁশি না থাকলে আমি বুঝতেও পারতাম। এবার পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা দাও।'

বসন্ত সাহা হাতে রিপোর্ট নিয়ে ওল্টাতে ওল্টাতে মুখ শক্ত করে ফেললেন। রিপোর্ট বলেছে, দুজনের মৃত্যু একই বিষে হয়েছে। সেই বিষ খাবার বা জল থেকে আসেনি, আলাদা করে ঢুকেছে শরীরে। বিষে যেসব কেমিক্যালস্ ছিল তিনরকম। ডি.স্ট্র্যামেনিয়াম, ওপিয়ম এবং সালফিউরিক অ্যাসিড। তিন কেমিক্যালসই কনসেনট্রেটেড অবস্থায় ছিল। ফলে পরিমান খুব অল্প হওয়ায় কাজ করতে সময় নিয়েছে। একে অপরের

সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক বা মালটিপিল্ ফাংশন করেছে। নার্ভাস সিস্টেমে ধাক্কা দিয়েছে, ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধিয়েছে, হার্ট অকেজো করেছে।

বসন্ত সাহা থমথমে মুখে বললেন, 'রিপোর্ট দেখে কী মনে হল সাগ্নিক?'

সাগ্নিক বলল, 'স্যার দিজ পয়েজন ওয়াজ মেড। বানানো হয়েছে। স্যার, এটা একটা পরিকল্পিত মার্ডার।'

বসন্ত সাহা চিন্তা ঘন মুখে বিড়বিড় করে বললেন, 'একটা না দুটো? নাকি একটা করতে গিয়ে দুটো খুন হয়েছে? হু ওয়াজ দ্য টার্গেট? কে লক্ষ্য ছিল? তার থেকে বড় কথা কীভাবে বিষ দিল?'

33

চারদিন ধরে বসন্ত সাহা একটা নোট তৈরি করেছেন। মুকুরের সিক্রেট ডায়েরিতে পাওয়া বিভিন্ন কথা, পুলিশের খোঁজ খবর এবং অল্প কিছু জিজ্ঞাসাবাদ থেকে এই নোট তৈরি হয়েছে। সবসময়ই এই নোটটা চোখের সামনে খুলে রেখেছেন বসন্ত সাহা। কখনও একটা পয়েন্ট কাটছেন, কখনও দুটো পয়েন্ট জুড়ছেন।

সুনন্দ এবং মেহুল দুজনের মোবাইল ফোনই সিজ্ করা হয়েছে। সেদিন যারা আমন্ত্রিত ছিল, তাদের সকলকেই বারণ করা হয়েছে শহর ছাড়তে। কাজটা জটিল। পুলিশ যখন কাউকে শহর ছাড়তে বা এলাকা ছাড়তে বারণ করে, তার মানে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। কারও পক্ষেই এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ধাক্কার মতো লাগে। রাগ, ভয়, অপমান অনেকরকম রিঅ্যাকশন হতে পারে। এই রিঅ্যাকশনকে প্রায় কোনও পুলিশ অফিসারই গুরুত্ব দেয় না। রুটিন কাজ মনে করে। বসন্ত সাহা তা করেন না, গুরুত্ব দেন। বিশেষ করে যেসব ক্রাইমের পিছনে তথাকথিত ভদ্রলোকেরা থাকেন, তাদেরবেলায় তো বটেই। এখানে এই কাজটা করেছে সাগ্নিক। সকলের রিঅ্যাকশন রেকর্ড করা হয়েছে। কেউই জানতে পারেনি। মোবাইলে কথা বলার সময় রেকর্ডার অন করা হয়েছে। একমাত্র মুকুরের কাছে সারসরি বসন্ত গিয়েছিল। তার সঙ্গে শান্ত ভাবে কথা বলতে হয়েছে। শুধু পারিবারিক ভাবে পরিচিত বলে নয়, সে একজন সদ্য স্বামী হারানো একজ মহিলা। স্বামীর মৃত্যুটাও মর্মান্তিক।

ছন্দা জিগ্যেস করেছিল, 'আমি কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি?'

বসন্ত সাহা বলেছিলেন, 'না। এটা অফিসিয়াল। তুমি আলাদা যেও।'

ছন্দা বলেছিল, 'মুকুরের সঙ্গে তুমি অফিসিয়াল হতে পারবে?'

বসন্ত সাহা বলেছিলেন, 'তুমি তো জানো ছন্দা এই ঘটনায় আমি কত বড় আঘাত পেয়েছি। মুকুর একজন চমৎকার মেয়ে। খুব লাইভলি। যেটুকু মিশেছি ওকে তোমার মতোই পছন্দ হয়েছে। তবে কী জানও মানুষের চরিত্র অত সহজে বোঝা যায় না।'

ছন্দা চমকে উঠে বলে, 'তুমি কি মুকুরকেও সন্দেহ করছো নাকি?'

বসন্ত সাহা শান্ত ভাবে বললেন, 'সন্দেহ সকলকেই করছি। আমাদের কাজের সেটাই যে নিয়ম তা তো তুমি জানো ছন্দা। মানুষের মন খুব জটিল। পুলিশি কায়দা কানুন দিয়ে তাকে চেনা খুব শক্ত। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, এভিডেন্স, ক্লু, চেজ, সার্চ, ইন্টারোগেশন এসব দিয়ে কি আর সেই জটিল মন চেনা সহজ? তারপরেও চেষ্টা করি।'

ছন্দা বলল, 'তুমি সত্যি মনে করো মুকুরও বিষ মেশাতে পারে?'

'এখনই বিশ্বাস করছি না। তবে এই কাজ করবার জন্য ওর পক্ষে যুক্তি আছে।'

ছন্দা কঠিন গলায় বলল, 'কী সেই যুক্তি জানতে পারি?'

বসন্ত সাহা সামান্য হেসে বললেন, 'জেনে কী করবে? যুক্তি খণ্ডন করবে?'

'চেষ্টা তো করব। অমন ভাল একটা মেয়ে, শান্ত ভদ্র প্রানবন্ত, তাকে তোমরা পুলিশি নিয়মে সন্দেহের তালিকায় রাখবে আর আমি মেনে নেব তা তো হয় না। পুলিশ না হতে পারি আমাদেরও তো কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। তোমাদের মতো গায়ের জোর না থাকুক, মাথার জোর তো রয়েছে।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'বুঝতে পারছি রেগে গেছ, আমি মুকুরকে সন্দেহের তালিকায় রাখায় বিরক্ত হয়েছ। কিন্তু কোনও উপায় নেই যে ম্যাডাম। তুমি শুনলে আরও রেগে যাবে, এখন পর্যন্ত তার ওপর আমার সন্দেহ সব থেকে বেশি।'

ছন্দা বলল, 'সেকী! কী বলছো এসব!'

বসন্ত সাহা গম্ভীর মুখে বললেন, 'খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, কিন্তু সন্দেহ থেকে তো বেরোতে পারছি না। ছন্দা, সুনন্দর এই মৃত্যু আমাকে নাড়া দিয়েছে খুব বেশি। মেহুল মেয়েটিকে আমি পারসোনালি চিনি না। তাই তার দুঃখজনক মৃত্যুকে প্রফেশনালি দেখছি। একজন গোয়েন্দা অফিসার হিসেবে। কিন্তু সুনন্দকে তো চিনতাম। আমাকে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না। বই পড়ছি, ছবি দেখছি, গান শুনছি ঠিকই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুবই ডিসটার্বড। আবার মনে মনে শক্তও হচ্ছি। সবথেকে বড় আপশোসের বিষয় কী জানো ছন্দা?'

ছন্দা ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'কী ?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'ঘটনাটা আমার সামনে ঘটল। বারবার মনে হচ্ছে, যে কাজ করেছে তার কাছে এটাই অ্যালিবাই ছিল। একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারের সামনে কী করে খুন হবে? এত বড় বোকামি কে করবে? সুতরাং এটা কোনও ক্রাইম নয়, নিছকই একটা দুর্ঘটনা। একথাটাই সে বোঝাতে চেয়েছে। ফুড পয়েজনিং তো হতেই পারে। কতই তো হয়। সুনন্দর হার্ট উইক ছিল বলে সামলাতে পারেনি। এই যুক্তি সাজাবে বলেই খুনি এই পার্টিকে বেছে নিয়েছিল। যদি অনুকূলবাবুর সঙ্গে আমার দেখা না হত, যদি উনি

সালফিউরিক অ্যাসিডের গন্ধের কথা না বলতেন, আমি কোনও সন্দেহই করতাম না। অটপসি রিপোর্টের কথা ভাবতামও না। রুটিন চেক হয়ে বেরিয়ে যেত। তারপরে মেহুল নামের মেয়েটির মৃত্যুও আমাকে অ্যালার্ট করত। তাও করত না যদি সেদিনের গেস্টদের মধ্যে আরও কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ত। জেনারেল ফুড পয়েজনিং। তা হয়নি। তবে? একটাই উত্তর। খুনি ভেবেচিন্তে জায়গাটা বেছেছিল। সেটা ভেস্তে গেছে। আর...আর, ভাবতে খারাপ লাগছে, এই কাজটি করবার সবথেকে বেশি চান্স মুকুরের। সে নেমন্তন্ন করেছে। গেস্টদের তালিকায় আমাকে রেখেছে। '

ছন্দা বলল, 'মোটিভ কী?'

বসন্ত সাহা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'অনেক। সম্পত্তি থেকে প্রেম সব কিছু হতে পারে। আর একটা তো রয়েছেই। মুকুরের মা হওয়া নিয়ে সমস্যা ছিল।'

ছন্দা খানিকটা অবাক হয়ে বলল, 'ছিল বলছো কেন? এখনও তো রয়েছে।'

বসন্ত সাহা থমথমে মুখে বললেন, 'না, এখন আর সমস্যা নেই।'

ছন্দা বলল, 'মানে!'

বসন্ত সাহা বললেন,' মুকুর ইজ প্রেগন্যান্ট। আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো ছন্দা? সন্দেহ হচ্ছে, ফ্ল্যাটের ওয়ান ইয়ার সেলিব্রেশন নয়, এই সুখবরটাই সেলিব্রেট করতে চেয়েছিল মুকুর।'

ছন্দা বলল, 'কী বলছো এসব? তাহলে তো ঘোষণা করত।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'আর যদি এমন হয় ঘোষণা করা না যায়। সন্তানের পিতাটি কে তাই নিয়ে যদি সংশয় থাকে?'

ছন্দা খানিকটা গলা চড়িয়ে বলল, 'চুপ করো, চুপ করো। আমি এসব বিশ্বাস করি না। মুকুর একটা সুন্দর স্বভাব চরিত্রের মেয়ে। বাচ্চা হওয়ার জন্য ও চিকিৎসা করছিল। নিশ্চয় সেটার রেজাল্ট পেয়েছে।'

বসন্ত সাহা সামান্য হেসে বললেন, 'বিশ্বাস করছো না করতে চাইছ না? আমিও করতে চাইছি না। নিজের সন্দেহ আমাকে নিজেই নিরসন করতে হবে। সেই কারণেই আমি মুকুরের কাছে যাচ্ছি। ওর সঙ্গে কথা বলব।'

মুকুর বিধ্বস্ত, কিন্তু নিজেকে বাইরে থেকে শক্ত করে রেখেছে। নিজের হাতে কফি করে নিয়ে এল। বসন্ত সাহা একবার ভাবলেন, বারণ করি। তারপর ভাবলেন, না থাক। যতটা স্বাভাবিক ভাবে থাকতে চায় থাকুক। মুকুর কারও সঙ্গেই দেখা করছে না। কোনও ফোনও ধরছে না। আত্মীয়স্বজন কয়েকজন এসে থাকতে চেয়েছিল, অ্যালাও করেনি। শুধু স্কুলের কলিগরা এসেছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলেছে।

বসন্ত সাহা কফির মগে হাতে নিয়ে একবার থমকালেন। বিষের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়তেই দ্রুত চুমুক দিলেন।

'তোমার বউদিও আসতে চাইছিল। আমিই বারণ করেছি। মুকুর, আমি এসেছি ডিউটিতে।'

মুকর একটা হলুদ রঙের সুতির শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ পরেছে। প্রসাধনহীন মুখে বিষণ্ন, খানিকটা ক্লান্তও। চুলে তেল শ্যাম্পু কিছু দেয়নি। বসেছে সোফার এক কোনায়।

'বসন্তদা, আমি জানি আপনি ডিউটিতে এসেছেন। ঘটনার দিন আমরা যখন হাসপাতালে, আপনি এসে বাড়ি সার্চ করেছেন।'

বসন্ত সাহা চমকে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামালেন। এই মেয়ে বুদ্ধিমতী। সাধারণ বুদ্ধি নয়, বেশি বুদ্ধি। একে কিছু লুকিয়ে লাভ নেই।

'প্লেস অব্ অকারেন্স তো এটাই মুকুর। যত তাড়াতাড়ি একবার দেখে নেওয়া যায় তত ভাল। তাও তো খাবারের কোনও নমুনা সংগ্রহ করতে পারা যায়নি।'

মুকুর বলল, 'সেদিন রাতে কেটারারকে সব খাবার নিয়ে যেতে বলি।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'স্বাভাবিক। আমিও তাই করতাম। আচ্ছা, মুকুর এই অকেশনটা তুমি কেন অ্যারেঞ্জ করেছিলে? শুধুই কি ফ্ল্যাটের এক বছর উপলক্ষে?'

মুকুর নিচু গলায় বলল, 'না। এই ফ্ল্যাটে যখন আসি তখন অনেককে বলতে পারিনি। তাদের নিয়ে একটা গেটটুগেদার করবার জন্যই এটা করি। এখন মনে হচ্ছে, সব কিছুর দায়ী আমি। আমি যদি এই অকেশনটা না করতাম, কিছুই হত না।'

কথা শেষ করে নিচু হয়ে মুখে হাত চাপা দিল মুকুর। আর তখনই মাথার ঠিক পিছনের দেয়ানে নজর পড়ল বসন্ত সাহার। দেয়ালে কিউরিও সাজানোর তিনটে তাক। মাঝের তাকে একটা শূন্য ফটোফ্রেম। পোস্টকার্ড মাপের একটা ফটো ঢুকে যাওয়ার মতো ফ্রেম। চমকে উঠলেন বসন্ত সাহা। সেদিন তো ফ্রেমটা নজরে পড়েনি! মেহুল মেয়েটি কি এখান থেকেই ফটোটা চুরি করে নিয়ে যায়?

34

বসন্ত সাহা মুকুরের শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এ ধরনের ঘটনায় তিনি অভ্যস্ত। পুলিসের জেরার মুখে যেমন অনেকে ভেঙে পড়ে, তেমন হল না। মুকুর নিজেই নিজেকে সামলায়। মিনিট খানেক পরে নিজেই মুখ তোলে। চোখ মুছে শক্ত গলায় বলে, 'বলুন, আপনার কী প্রশ্ন রয়েছে।'

বসন্ত সাহা সরাসরি এবার কোনওরকম ভনিতা না করে সরাসরি শুরু করেন।

'আমার খুব খারাপ লাগছে, এরকম একটা সময়ে তোমাকে ডিসটার্ব করছি। কিন্তু কিছু করার নেই। আমার মতো নিশ্চয় তুমিও চাও সুনন্দ হত্যাকারী ধরা পড়ুক। অনেক বড় দুঃখ তুমি পেয়েছো, এইটুকুও তোমাকে সহ্য করতে হবে। তোমার কোঅপারেশন জরুরি।'

মুকুর বলল, 'বলুন।'

তার গলা শুনেই বোঝা যায়, যে বসন্ত সাহাকে সে পছন্দ করে, এই মুর্হূতে তার সামনে বসা মানুষটি সে নয়। বসন্ত সাহা এই মনোভাবকে ইগনোর করলেন। বললেন, 'তুমি কি কাউকে সন্দেহ করো?'

মুকুর চোয়াল শক্ত করে বলল, 'আপনারা কি নিশ্চিত এটা মার্ডার?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'হ্যাঁ। অন্তত একজনের বেলাতে তো বটেই।'

'সেটা সুনন্দ না হয়ে মেহুলও তো হতে পারে? হয়তো ওর খাবারে বিষ মেশাতে গিয়ে সুনন্দকে ভুল করে...।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'হতে পারে। তবে সেটাও মার্ডারই হবে। তুমি কি মনে করো মেহুলকে মারবার মতো কেউ রয়েছে?'

মুকুর বলল, 'মনে করি না। তন্ময়ের সঙ্গে তার সেপারেশন চললেও, সেটা খুনোখুনির পর্যায়ে যাবে না।'

'সুনন্দর কোনও শত্রুর খবর তুমি জানো? এমল কোনও শত্রু যে এই পার্টিতে ছিল?'

মুকুর মাথা নামিয়ে একটু ভাবল। তারপরর বলল, 'আমি কেমন করে জানব? তবে কেটারার প্রতীকের সঙ্গে কদিন আগে একটা মন কষাকষি হয়েছিল। সে এই অকেশনে কাজ করবে না বলেছিল।'

বসন্ত সাহা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী নিয়ে মন কষাকষি?'

মুকুর বলল, 'প্রতীক ওর ছোটোবেলার বন্ধু। টাকা ধার চেয়েছিল। সুনন্দ দিতে রাজি হয়নি। তবে তার জন্য বিষ খাইয়ে মারবে এমনটা ভাবা অসম্ভব।'

বসন্ত সাহা একট চুপ করে রইলেন, তারপর দুম করে বললেন, 'আচ্ছা মুকুর, তুমি ছাড়া গেস্ট লিস্টটা আর কে জানত?'

মুকুর বলল, 'মানে!'

বসন্ত সাহা বললেন, 'পার্টিতে কে আসবে তার নাম কার জানা ছিল?'

মুকুর অবাক গলায় বলল, 'আর কে জানবে?'

বসন্ত সাহা নরম গলায় বললেন, 'সেটাই তো জানতে চাইছি। কাকে তুমি আমাদের কথা বলেছিলে?'

মুকুর ভুরু কঁুচকে ভাবল। বলল, 'কাউকে বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না।' তারপর নিজের মনেই

বলল, 'সুনন্দকেও তো বলিনি। পুরোটা জানে না। সারপ্রাইজের জন্য গোপন রেখেছিলাম।'
'সারপ্রাইজ!'
মুকুর বলল, 'হ্যাঁ, সারপ্রাইজ। আমার কলেজের এক সহপাঠী পুনেতে থাকে। সে এই ফ্ল্যাটের নাম দিয়েছে, আমি সুনন্দকে বলিনি সে আসছে। বলেছিলাম 'দ্য ড্রিম' নামটা যে দিয়েছে সে আসবে।'
'সে কি এসেছিল?'
মুকুর শান্ত ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, এসেছিল। হৈমন্তীর সঙ্গে আপনাদের আলাপও করিয়ে দিই। ও, মেহুল আর দিশা, কঙ্কনা মিলে কেক ডিসট্রিবিউট করল। ও, শেষের দিকে দিশাও জয়েন করল। কত হই চই! কত আনন্দ! ওফ্ আমি ভাবতে পারছি না। মনে হচ্ছে এটা একটা দুঃস্বপ্ন। এই দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে।'
কথা বলতে বলতে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকল মুকর।
বসন্ত সাহা চুপ করে থাকলেন। এরকম পরিস্থিতিতে তিনি কখনও পড়েননি। মনে মনে অভিযুক্ত করে যে মেয়েটিকে তিনি আসলে জেরাই করছেন তাকে তিনি অল্পদিনের পরিচয়তে পছন্দ করে ফেলেছেন। মুকুরও সে কথা জানে। সাগ্নিক এই কাজটা করতে পারত। কিন্তু কেন জানি বসন্ত সাহার মনে হয়েছে, এই রহস্য সমাধানের প্রথম চাবিটি রয়েছে মুকুরের হাতে। সেই জন্য তিনি নিজে এসেছেন। এই ধরনের জেরার সময় সঙ্গে একজন লেডি অফিসার নিয়ে আসা নিয়ম। সেই নিয়ম তিনি আজ মানেননি। চাননি মুকুরকে এখনই নিয়মের মধ্যে ফেলতে।

মোবাইল বেজে উঠল। বসন্ত সাহা ফোন তুললেন। সাগ্নিক।
বসন্ত সাহা চাপা গলায় বললেন, 'কী হয়েছে সাগ্নিক?'
সাগ্নিক ওপাশ থেকে নিচু অথচ উত্তেজিত গলায় বলল, 'স্যার, একটা অদ্ভুত ব্যাপার।'
সাগ্নিক ঠান্ডা মাথার অফিসার। সহজে উত্তেজিত হয় না। তারওপর সে জানে 'স্যার' মুকুরের কাছে এসেছে। বসন্ত সাহা ভুরু কুঁচকে বললেন,. 'কী হয়েছে?'
সাগ্নিক বলল, 'আপনি মিসেস মুকুরের যে সিক্রেট ডায়েরিটা আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন, তার একটা পাতা ছেঁড়া।'
বসন্ত ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তার মানে! কই আমার তো চোখে পড়েনি।'
সানে মুকুর বসে, তাঁকে খুব সাবধানে হয়ে কথা বলতে হচ্ছে। এমন কোনও শব্দ এখনই ব্যবহারক করা যাবে না যাতে মুকুর বুঝতে পারে।
সাগ্নিক বলল, 'স্যার, খুব কেয়ারফুলি ছেঁড়া হয়েছে। ডায়েরির বাইন্ডিং থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে মনে হচ্ছে।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'তুমি বুঝলে কী করে?'

'পরের পাতায় ইম্প্রেসন পড়েছে। এই মাত্র কার্বন পেপার দিয়ে ঘষে সেই ইম্প্রেসন আমি উদ্ধার করেছি। ওপরে লেখা 'গেস্ট লিস্ট'। দ্য ফার্স্ট নেম ইজ ইওরস্।'

'এরকম কটা নাম তুমি পড়তে পারলে?'

সাগ্নিক বলল, 'প্রায় সবই স্যার। স্যার, আমি সিওর কেউ একজন এই লিস্ট ওই খাতা থেকে চুরি করেছে।'

বসন্ত সাহা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সাগ্নিক খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফর্মেশন দিল। তার মানে মুকুর নয়। অন্য কেউ? সে কে?

মুকুর আবার নিজেকে সামলে নিয়েছে। মুখ তুলেছে। ফোন রেখে বসন্ত সাহা নরম গলায় বললেন, 'মুকুর, তুমি কি তোমার ডায়েরির পাতা ছেঁড়?'

মুকুর অবাক হয়ে বলল, 'ডায়েরির পাতা কি কেউ ছেঁড়ে বসন্তদা?'

'যাক নিশ্চিন্ত করলে। এই অকেশন ফাইনাল করবার পর তোমার এই ফ্ল্যাটে কে কে এসেছে। অবশ্যই তুমি আর সুনন্দ ছাড়া।'

মুকুর বলল, 'ফাইনাল তো শেষদিন পর্যন্ত হয়েছে। অনেকেই এসেছে। মেহুল, কঙ্কনা এসেছে। একদি সন্ধেবেলা দিশা আর কিশোরও এসেছিল মনে পড়ছ। পুনে থেকে হৈমন্তীও এসেছে। আর আর...। প্রতীক বেশ কয়েকবার এসেছে মেনু ফাইনাল করতে। ও একদিন কঙ্কনাও এসেছিল।'

বসন্ত সাহা খানিকটা নিজের মনেই বললেন,'ও। তাহলে যেকেউ করতে পারে।'

মুকুর অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, 'কী করতে পারে?'

বসন্ত সাহা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার সিক্রেট ডায়েরি থেকে পাতা চুরি। তোমার ওই ডায়েরিটা পেয়ে আমাদের খুব সুবিধে হয়েছে। সেদিনের গেস্টদের সবার সম্পর্কেই আমাদের একটা ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তোমাকে প্রশ্ন করে ব্যস্ত করতে হল না। আর দুটো কথা। এক নম্বর সুনন্দর ইনসিওরেন্সের কাগজগুলো একটু রেডি করে রাখবে। দরকার হলে আমার দেখব। দুই, তুমি যে এক্সপেক্ট করছ সেটা সুনন্দ জানত?'

মুকুর একটু যেন চমকে উঠল। বলল, 'আপনি জানলেন কী করে ? আমি তো বৌদিকেও বলিনি।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'আমি সেদিন তোমার রিপোর্ট দেখেছি মুকুর।'

মুকুর মাথা নামিয়ে বলল, 'ও। হ্যাঁ, সুনন্দ জানত সে বাবা হতে চলেছে। দীর্ঘ চিকিৎসার ফল। ওই পার্টিতে তার ঘোষণা করবার কথা ছিল। এই উপলক্ষে সে পুনে থেকে আমার জন্য একটা আংটিও নিয়ে এসেছিল।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'ও পার্টি তাহলে শুধু ফ্ল্যাটের কারণে ছিল না। আমিএ এরকম একটা কিছু ভেবেছিলাম। যাক, আমি আজ চললাম। তোমার বসন্তদাকে ভুল বুঝো না। তুমি আমাকে আর তোমার বৌদিকে নিশ্চিন্ত করলে। শুধু একটাই অনুরোধ, কদিন কলকাতা ছেড়ে কোথাও না গেলে ভাল হয়, পুলিশের কাজ করতে সুবিধে হয়।'

'আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন? আমি সুনন্দকে বিষ খাইয়েছি?'

বসন্ত সাহা সামান হেসে বললেন, 'এতক্ষণ করছিলাম। আর করছি না।'

মুকুরের বাড়ি থেকে বেরিযে অফিসে গেলেন বসন্ত সাহা। সাগ্নিক ঘরে এল।

'স্যার, কিছু পাওয়া গেল?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'পাওয়া গেল। আর যেই হোক, মুকুর খুন করেনি। শর্ট লিস্ট করেছো।'

সাগ্নিক বলল, 'হ্যাঁ স্যার। কঙ্কণ–পলাশ, উজ্জ্বল– নয়নিকা, প্রতীক, দিশা–কিশোর, তন্ময় আর মেহুল। আর হ্যাঁ, হৈমন্তী।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'তার মানে ন'জন? এর মধ্যে খুনি যে কেউ হতে পারে।'

সাগ্নিক বলল, 'মোটিভটা ধরতে পারলে অনেকটা ক্লিয়ার হবে।'

বসন্ত সাহা ধীর স্থির ভাবে বললেন, 'না সাগ্নিক, ওট ক্লাসিকাল পদ্ধতি। এই কেসে আমাদের এগোতে হবে উলটো পথে। আগে জানতে হবে, খুনি কাকে খুন করতে চেয়েছিল? তারপর কীভাবে খুন করেছে। তারপর মোটিভ। সাগ্নিক, এটা একটা জটিল এবং ইউনিক কেস।'

বসন্ত সাহা কথা শেষ করতেই টেবিলে রাখা মোবাইল বেজে উঠল। বসন্ত সাহা ফোন ধরে বললেন, 'বল মুকুর।'

ওপাশ থেকে মুকুর ভাঙা গলায় বলল, 'বসন্তদা, একটা কথা মনে পড়েছে।'

35

প্রথম ফোন

মোবাইল যখন বাজল, তখনও তার ঘুম কাটেনি। এমনিতেই ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। বেলা হয়ে যায়। কদিন হল রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে। কাল একটায় হয়নি। আড়াইটে পর্যন্ত ছটফট করে, দ্বিতীয়টা খেতে হয়েছে। সে হাত বাড়িয়ে বালিশের তলা থেকে ফোন বের করল।

'বসন্ত সাহা লোকটা গোলমাল শুরু করেছে।'

ঘুমের ঘোরে বসন্ত সাহা নামটা মাথায় স্ট্রাইক করল না।

'হু ইজ বসন্ত সাহা!'

‘চিনতে পারছো না? সেদিনের পুলিশ অফিসার। পার্টিতে ছিল। ওই লোকটাই তো ঘটনাকে অ্যাক্সিডেন্ট না বলে মার্ডার বলতে চাইছে। ইনভেস্টিগেশন শুরুও করেছে।’

‘ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ও মার্ডার বললেই তো হবে না। প্রমাণ করতে হবে।’

‘লোকটা বুদ্ধিমান।’

‘আমার থেকেও?’

‘তোমার কতটা বুদ্ধি পরে বোঝা যাবে। যাক, ওর এক অফিসার ফোন করে বলেছে, কোথাও যাওয়া যাবে না। কলকাতাতেই থাকতে হবে।’

‘আমাকে তো বলেছে। সেদিন পার্টিতে যারা ছিল, সবাইকে বলেছে।’

‘শুধু তাই নয়, আমাকে ওর অফিসে দেখা করতে বলেছে।’

‘তাই নাকি!’

সে উঠে বসল। ঘরের এয়ারকন্ডিশনার বিজ্‌বিজ্‌ করে চলছে। যদিও ঠান্ডা কম করা আছে, তারপরেও শীত করে। বিছানার পাশে সাউড টেবিল থেকে রিমোর্টটা তুলে এসি মেশিন বন্ধ করল।

‘এখন কী কর্তব্য?’

‘কী আবার, ডেকেছে যখন যাবে। সাবধানে উত্তর দেবে।’

‘পুলিশ খুব ঝানু হয়। আমাকে অসাবধান করতে মোটে সময় নেবে না।’

‘তাহলে কী করবে ভাবছো?’

‘এতে ভাবাভাবির কী আছে? যা হবে ফেস করতে হবে।’

‘তোমার সঙ্গে আর একবার দেখা করা যাবে?’

‘খেপেছো। তোমার ওই বসন্ত সাহা সবার পিছনে লোক লাগিয়ে রেখেছে।’

‘লোক লাগালে কী এসে যায়? খুন তো আমরা করিনি। আমাদের অপরাধ কোথায়?’

‘আমাদের সমস্যা, অন্য জায়গায়।’

‘কোন জায়গায়!’

‘তুমি জানো না? বুঝতে পারছো না? আমাদের রিলেশন জানাজানি হয়ে যাবে।’

‘একদিন তো হবেই।’

‘সময় নিতে হবে। তাছাড়া এরকম একটা গোলমালের সময়ে যদি সবাই জেনে যায় কী হবে ভাবতে পারছো?’

‘না পারছি না, তবে তোমার ভয়টা আন্দাজ করছি। তোমার সাহস আসলে বিছানায়, দরজা লক করে।’

‘এমন ভাবে বলছো যেন বিছানা শুধু আমার লাগে।’

‘তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ফোন করছো?’

‘আমি পুলিশের কাছে যাব না। ওরা জেরা করে সব বের করে নেব।’

‘তাহলে পালিয়ে যাও। কোনও অপরাধ না করে পালাতে চাইলে পালাও।’

‘খুন না করলেও অন্য অপরাধ তো করছি।’

‘কী অপরাধ? পরকীয়া?’

‘নিশ্চয়।’

‘বোকার মতো কথা বলও না। পরকীয়া এখন আর কোনও অপরাধ নয়। সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্ট হয়ে গিয়েছে। তুমি জানো।’

‘কথাটা তুমি বোকার মতো বললে। আমি আইনের চোখে অপরাধের কথা বলছি না।’

‘তাহলে?’

‘তুমি বুঝতে চাইছো না।’

‘অনেকদিন ধরেই তোমাকে বলছি। ’

‘কী বলছো সোনা? তুমি দাম্পত্যও চালাবে আবার আমার সঙ্গে শোবেও এই কথা?’

‘তোমার সঙ্গে কথা বলার কোনও মানে হয় না।’

‘আহা রেগে যাচ্ছো কেন! শোয়ার কথা বললাম বলে? তুমি সকালে ঘুম ভাঙিয়ে পুলিশের কথা বলবে, আর আমি একটু শোওয়াশুয়ির কথা বললেই রেগে যাবে?’

‘কী বলতে চাইছ?’

‘বলতে চাইছি, পুলিশের প্রবলেম তোমার সোনা, আমার নয়।’

‘এসব কী বলছো!’

‘ঠিকই বলছি। এবার ফোন রাখো। আমি ঘুমোব।’

‘ঘুমোতে পারো কিন্ত আমি তোমাকে ছাড়ব না। এই মার্ডার তুমি করো নি তার কী প্রমাণ? একসময়ে তুমি মুকুরকে মেরে ফেলবার প্ল্যান করতে। বলো করতে কিনা? সুনন্দর সম্পত্তির ওপর তোমার লোভ ছিল।’

‘বাজে কথা।’

‘আমাকে লুকোতে যেও না। আমি পুলিশকে সব বলে দেব।’

‘সুনন্দর কী এমন সম্পত্তি রয়েছে যে তার বউকে মেরে তাকে বিয়ে করতে হবে?’

‘সে তুমি জানো ডার্লিং। বাবার এক ছেলে যে জমিদারবংশের একমার উত্তরাধিকারী সে খবর অনেকে না রাখলেও তুমি রাখ। টাকির কাছে প্রাসাদের মতো বাড়িটির যে তার, সেটিকে বিক্রি করলে রিসর্ট বানালে যে কয়েক কোটি টাকার মুনাফা যে হিসেবে তোমার করা হয়ে গিয়েছিল।’

‘শাট আপ্।’

‘আহা সোনা চিৎকার করে না। তুমি এও জানতে মুকুর সুনন্দকে বিশ্বাস করত না। তার আগে বিয়ে ছিল। সে মেয়েটিকেও তুমি চেনো। আমিও চিনি। সেদিন পার্টিতে এসেছিল। মুকুর তাই ডিভোর্সের বিষয় প্যাঁচ মেরে রেখেছিল। ঝামেলা পাকাতে হলে সুনন্দকে খেসারত দিতে হত। তার থেকে সরিয়ে দেওয়াই ভাল।’

‘মুখ সামলে কথা বল।’

‘আহা, চটছো কেন? মুখ সামলে কথা তুমি বলবে। আমাকে নয়, পুলিশকে। পুলিশকে বলবে মেহুলকে কীভাবে বিষ খাইয়েছিলে। জলে মিশিয়ে?’

‘শাট আপ ইউ বিচ। এটা তোমার ক্রাইম থ্রিলার নয়। যাও পুলিশকে যা খুশি বল গিয়ে। আই ডোন্ট কেয়ার।’

দ্বিতীয় ফোন

বাথটাবের পাশে রাখা মোবাইল ফোনটা মিহি সুরে বাজচ্ছে। খুব বিখ্যাত গানের লাইন। গানটে চেনা লাগলেও চেনা যাচ্ছে না।

সে বাথটাবে আধশোয়া। একদিকে ব্যাক রেস্ট রয়েছে। সেখানে মাথা। একরাশ চুল ছড়িয়ে রয়েছে বাথটাবের গা বেয়ে। তার হাতে একটা বই। বইটি একটি অটোবায়োগ্রাফি। গাব্রিয়েল রেঁয়াদ্ নামে এক মহিলার লেখা। পুরোনো দিনের হলেও ইংরেজিটা সুখপাঠ্য। ভাষার থেকে বড় কথা, বইটা খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয়। রেঁয়াদ্ ছিলেন একজন মডেল। ন্যুড মডেল। শিল্পীর সামনে নগ্ন হতেন। তাও আমার যে সে শিল্পী নয়, দুনিয়া কাঁপানো শিল্পী। তিনি কৈশোর থেকে শুরু করে দীর্ঘ কুড়ি বছর এই কাজ করেছেন। তিনি ফরাসি শিল্পী পিয়ের অগুস্ত র‍্যনোয়ারের মডেল। বিশ্বের সেরা শিল্পদের একজন র‍্যনোয়ার। একসময়ে বাইসাইকেল থেকে রিউম্যাটিজমে আক্রান্ত হয়েছিলেন র‍্যনোয়ার। তারপরে তিনি বহু বিখ্যাত সব ছবি এঁকে গিয়েছেন। আজও সেসব ছবি বিস্ময়কর। শিল্পরসিকরা বারবার সেই সব ছবি দেখেন নিয়ে কাটাছেঁড়া করেন। অন্তর্গত অর্থ তো বটেই, এমনকী রঙ, ব্রাশ, স্ট্রোক নিয়ে চর্চার শেষ নেই।

নিজে শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়েও র‍্যনোয়ার একটার পর একটা ন্যুড এঁকেছেন। স্পর্শকাতর, কামোদ্দীপক নগ্ন নারী। কখনও কোচে শোওয়া, কখনও বসে রয়েছে চেয়ারে। তাদের ভঙ্গিমায় কখনও অপেক্ষা, কখনও রতি–ক্লান্তি, কখন উত্তেজনা, কখনও একাকী বিষণ্ণ। র‍্যনোয়ার বিশ্বখ্যাত ন্যুড পেইনটিংসের মধ্যে রয়েছে ‘ন্যুড ইন আ চেয়ার,’ ‘লার্জ ন্যুড’, ‘রিক্লাইনিং ফর্ম দি ব্যাক’। আর্ট ক্রিটিকরা

লিখেছেন ,'এই সব ছবিতে নারীর গড়ন সুঠাম, সুডৌল। ভারি নিতম্ব ও গভীর স্তন। কোনও কোনও ছবিতে নরম উজ্জ্বল ত্বকে নারী ক্লান্তি ও বিষাদ মুক্ত। চরম ব্যক্তিগত অংশটি উদ্ভাসিত, প্রস্ফুটিত। সব মিলিয়ে সতেজ ও লাবন্যময়ী। ক্রিটিকরা মনে করেছেন, নারীর এই কামোদ্দীপক রূপ শুদ্ধ প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতিকে ছড়িয়ে গাছ, লতা–পাতার মতোই উন্মুখ। 'বেদার ড্রায়িং হার লেগ' ছবিটি গভীর যৌন সম্পর্কযুক্ত, গোপন অভিব্যক্তি সংকোচনহীন ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

গাব্রিয়েল রেঁয়াদ্ নিখছেন, 'পনেরো বছর বয়স থেকে এই মহামানবের সঙ্গে কাজ করছি। নগ্ন হয়েছি বারবার। আগে জানতাম শুধুমাত্র মানবের জন্ম আছে, তাঁর কাছে জানলাম জন্ম আছে শরীরেরও। আমার শরীর জন্ম ধন্য হল। আমার শরীর দেখে কখনও খুশি হয়েছেন, কখনও বিরক্ত। দূর থেকে দেখেছেন। তবু মনে হয়েছে আমার খুব কাছে। যখনই পেনসিলে, তুলি আঁচড় দিয়েছেন ক্যানভাসে, মনে হয়েছে আমাকে স্পর্শ করছে। সে স্পর্শ কোনও পুরুষের নয়, সে স্পর্শ আমাকে নিয়ে যেত এক অনির্বচনীয় সুখ যাত্রায়। একদিন মঁসিয়ে স্টুডিওতে এসে আমাকে বললেন...'

এই সময়ে মোবাইল বেজে উঠল। ফেনার মধ্যে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে বসেছিল সে। হাতের পেপারব্যাক সরিয়ে একটু উঠল সে। ফটফটে সাদা ফেনায় আলতো ভাবে ভেসে উঠল তার বাদামী দুটি স্তন। সে মুগ্ধ হল। আহা, অগুস্ত র‍্যনোয়ারের মডেল যদি সে হত?

মোবাইল কানে নিয়ে বলল, 'আমাকে ফোন করতে তোমায় বারণ করেছি তো। বসন্ত সাহা আমার ফোন ট্যাপ করেছে।'

36

বসন্ত সাহা বারান্দায় বসে রয়েছেন।

আজ বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছে। এদিকটায় বাড়িঘর কম, তাই বাইরের অন্ধকার এখনও দূষণহীন, নির্মল। শহরের মাত্রতিরিক্ত আলো দূষণ ছাড়া আর কী? শুধু মানুষের পক্ষে পীড়াদায়ক নয়, গাছে, পথের ধারে, পার্কের ভিতরে তীব্র আলো থাকলে পশুপাখি, কীটপতঙ্গের জন্যও তা কষ্টের। বসন্ত সাহা অনেকদিন ভেবেছেন, এই বিষয় আবেদন করে একটি চিঠি লিখবেন।

গোয়ান্দা অফিসার বসে রয়েছেন ইজি চেয়ারে। বেতের ইজি চেয়ার। খুবই আরামের এই চেয়ার ছন্দা কিনেছেন কলকাতার হ্যান্ডিক্রাফট মেলা থেকে। ছন্দা প্রতি বছরই এই মেলাতে গিয়ে আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং প্রচুর জিনিস কিনে নেন। সব যে প্রয়োজনের এমন নয়। বছর জুড়ে তার সব গিফট আইটেমই এই মেলা থেকে নেওয়া। অ্যানিভারসরি, জন্মদিন, দোল, পয়লা বৈশাখ সব ধরনের অকেশনেই এখানকার জিনিস নিয়ে যান। এটাই রেওয়াজ করে নিয়েছেন। মাটি, কাঠে, বেত, কাপড়ে

তিনি স্বচ্ছন্দ। স্কুলে গিয়ে কলিগদের এইসব মেলায় গিয়ে কেনাকাটা করবার জন্য উৎসাহ দেন। গ্রামের গরিব মানুষের শিল্পকর্ম দেখে গোয়েন্দা ঘরণী এতটাই মুগ্ধ হন যে নিজেকে সামলাতে পারেন না। সবথেকে বড় কথা, হ্যান্ডিক্রাফট মেলায় গিয়ে ছন্দা দেখেছেন, পুরুষের থেকে মহিলারা কাজ বেশি করছে। আঁকা, বোনা, সেলাই, খোদাই নিয়ে বসে রয়েছে। ছোটো ছোটো মেয়েরা যেভাবে রঙ–তুলি ধরে আঁকছে, পুতুল বানাচ্ছে দেখে অবাক হতে হয়। ক্যামেরা বাগিয়ে অনেকে দাঁড়িযে পড়ে। এই তো পরশুদিন স্বামীকে বলছিলেন। বসন্ত সাহা সেদিন সকালে স্নানে ঢোকবার আগে ছবির বই উলটোচ্ছিলেন। একটু ফাঁক পেলেই বই টেনে নেওয়ার অভ্যেস তাঁর অনেকদিনের।

ছন্দা বলল, 'আবার ছবি! অফিস যাবে না?'

বসন্ত সাহা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'এই তো যাচ্ছি। এই বইটা খুব ভাল। বিশ্বশিল্পের রূপরেখা। লেখক ছবির কথা, বড় বড় শিল্পীর কথা খুব সহজ ভাবে লিখেছেন।'

ছন্দা খানিকটা অভিমানের গলাতেই বললেন, 'সবাই বড় বড় আর্টিস্টদের নিয়ে লাফালাফি করে, আর গ্রামের হস্তশিল্পের কারিগররা সামান্য সম্মানটুকুও পান না। বড় আর্টিস্টদের কাজ, জীবন নিয়ে বই রয়েছে, এই সব আড়ালে থাকা আর্টিস্টদের কথা আমার কতটা জানতে পারি?'

বসন্ত সাহা হেসে বললেন, 'সে কথা বোল না ছন্দা। বড় আর্টিস্টদের সঙ্গে এঁদের তুলনা চলে না। তাঁদের ছবি, ভাস্কর্য, ইনস্টলেশন এক একটা দর্শন। কল্পনার এক্সট্রিম প্রকাশ। মানুষের বোধ, শিল্পচেতনাকে তারা প্রভাবিত করে। বাজারের জন্য তাঁরা কাজ করেননি। পরবর্তী কালে বাজার তাকে ব্যবহার করেছে। আর তুমি যে ধরনের লোকাল আর্ট ওয়ার্কের কথা বলছো ছন্দা, তার বেশিটাই এলাকাভিত্তিক এবং স্কিল নির্ভর। ধর পুরুলিয়ার মুখোশ, বাঁকুড়ার ঘোড়া। বংশপরম্পরায় এই শিল্প রয়ে গিয়েছে। যাঁরা এই কাজ করছেন তাঁদের আমি কোনওভাবেই ছোটো করছি না। এঁরাও এক একজন গুণী। শিল্পগুণ না থাকলে, এই স্কিল রপ্ত করা যায় না। আমি এঁদের শিল্পী হিসেবে সম্মান জানাই। আগের থেকে এখন এরা অনেক বেশি নজরে এসেছেন। গোটা পৃথিবী জুড়েই এসেছে। এই তো এত মেলা হচ্ছে, একজিবিশন হচ্ছে, তোমরা গিয়ে কেনাকাটা করছো। পার্মানেন্ট দোকানও রয়েছে।'

ছন্দা বললেন, 'এটুকুই কি এনাফ?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'না এনাফ নয়, আরও হলে আরও ভাল হত। এধরনের আর্ট ওয়ার্ক দেখতে দেখতে সেন্স ডেভেলপ করে। আমি তোমারে সঙ্গে একমত ছন্দা যতটা পাওয়া উচিত ছিল, এরা ততটা পায় না।'

ছন্দা বললেন, 'আমি মেলায় দেখেছি, এক একজন ক্রেতা দু–পাঁচ টাকা কমানোর জন্য যা দরদাম করে দেখলেও লজ্জা লাগে। অথচ বেড়াতে গিয়ে, হোটেলে খেয়ে, গাড়িতে ঘুরে হাজার হাজার টাকা খরচ করে বসতে তাদের কোনও সমস্যা নেই। যত সমস্যা ওই দশ টাকায়।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'সে আর কী করবে, সবার কি মাইন্ড সেট একরকম? সবাই শিল্প আর শিল্পীকে বুঝতে পারলে দুনিয়া চলত? এই ধর না, সুনন্দ আর মেহুলের হত্যা রহস্যের মধ্যে কোথাও একটা শিল্প লুকিয়ে রয়েছে, অথচ আমি ধরতে পারছি না।'

ছন্দা অবাক হয়ে বললেন, 'হত্যা রহস্যে শিল্প? মানে কী?'

বসন্ত সাহা আপনমনে বললেন, 'সেই মানেটাই তো খুঁজছি ছন্দা।'

ছন্দা উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'কী করে জানলে?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'মুকুরের সিক্রেট ডায়েরি পড়তে গিয়ে পেয়েছি।'

ছন্দা অবাক হয়ে বললেন, 'ছবি! মুকুর আবার ছবি নিয়ে ইন্টারেস্টেড হল নাকি?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'না তা নয়। ও হয়নি। ও ডায়েরিতে এক জায়গায় লিখেছে।'

ছন্দা বললেন, 'কী লিখেছে?'

বসন্ত সাহা এবার হেসে বললেন, 'পুলিশের সিক্রেট বলা যায়? ইনভেস্টিগেশন চলেছে না?'

ছন্দা বললেন, 'সরি।'

ছন্দা তাঁর স্বামীকে জানেন। প্রফেশনাল গোপনীয়তা ভাঙবার মানুষ তিনি নন। তিনি উৎসাহও দেখান না। নেহাত এই ভয়ংকর ঘটনার সঙ্গে মুকুর জড়িত তাই।

বসন্ত সাহা স্ত্রীর কাছে গোপন করলেও, সিক্রেট ডায়েরিতে লেখা মুকুরের কতাগুলো নিয়ে তিনি ভেবেই চলেছেন। মুকুরের ছেঁড়া ছেঁড়া লেখাটা এরকম—

'যে ছবি টবি নিয়ে থাকছে তাকেই নামকরণের জন্য বলব ঠিক করেছি... একটা আর্টিস্টিক কিছু নাম ভেবে ঠিক করবে। ওকে টেলিফোনে বললামও। বলল, বাড়িতে নাকি আর্টস্ট ডেকে ছবি আঁকাচ্ছে... খ্যাপা একটা...সেদিন আবার বলে, হ্যাঁরে মুকুর, স্বামীকে বেঁধে রাখবার উপায় কী? জানিস কিছু? সব প্রপার্টি নিজের নামে করে রাখা? বাড়ি, গাড়ি ব্যাঙ্ক ব্যালান্স...বোঝো ঠেলা! আমি বললাম, জানিনে বাপু। তখন বলল, টাকা পয়সা গোছানোর ব্যাপারে তোর অ্যারেঞ্জমেন্ট কী? বললাম, আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। সব সুনন্দ জানে। যেখানে সই করতে বলে করে দিই। মনে হচ্ছে, এই খ্যাপা মেয়ে আবার বিয়ে করবে।'

ব্যস্ এইটুকুই লেখা। কীসের নামকরণ, কে ছবি নিয়ে থাকছে সেসব কিছুই লেখেনি। মেয়েটি স্বামীকে বেঁধে রাখবার কথা বলছে কেন ? সম্পত্তির প্রশ্নই বা আসছে কোথা থেকে? এই লেখা কি কোনওভাবে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত? না হলেও ইন্টারেস্টিং। মেয়েটি কে এবং সে মুকুরের পার্টিতে এসেছিল কিনা জানতে মন চাইছে। হয়তো বিষয়টা কিছুই নয়। একেবারে বাইরের কিছু। তারপরেও অকারণে মাথায় খচখচ করছে। ছবির প্রসঙ্গ আছে বলেই হয়তো করছে।

বসন্ত সাহা ভেবেছিলেন, মুকুরকে জিগ্যেস করবেন। সাগ্নিক বারণ করল।

'স্যার মুকুরদেবীকে আমরা সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু উনি তো জানেন না অপরাধী কে বা কারা। আমাদের এই সব প্রশ্ন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলে তদন্তের অসুবিধে হবে?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'দ্যাটস ট্রু। কিন্তু এই মনের অবস্থা নিয়ে মুকুর কি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবে? এতো ডিটেইলসে কথা বলব এখন?'

সাগ্নিক বলল, 'উনি হয়তো ভেবে বলবেন না। এখন তো এলোমেলো হয়ে রয়েছেন। ভেবে কথা বলবেন না। আমার বেলায় স্যার এরকম কয়েকবার হয়েছে। সে অবশ্য চাকরি পাবার গোড়ার দিকে। একটা রবারির কেসে গিয়ে যাকে যে কথাই জিগ্যেস করেছি, সবাইকে বলে বেড়িয়েছে। টিপার যে ছিল, ডাকাতদের খোঁজখবর দিত, সে এই সব শুনে বুঝে গেল, আমি ডাকাতদের নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করছি না, যে খবর দিয়ে তাদের ডেকে এনেছে তাকে খুঁজছি, সে পালাল। সেই থেকে আমি অ্যালার্ট থাকি স্যার। তার থেকে খানিকটা জানবার পর জিগ্যেস করাটা ঠিক হবে মনে হয়।'

বসন্ত সাহা মেনে নিয়েছেন। তবে আর দেরি করা যাবে না। যা করবার দ্রুত করতে হবে। সময় কমে আসছে। গেস্টদের সবাইকে কলকাতায় আটকে রাখা হয়েছে। এটা বেশিদিন করা যায় না। কাউকে ডিটেন করতে কোর্টের পারমিশন লাগে। এরা কেউ কোর্টে চলে গেলে মুশকিল।

বারান্দার আলো নেভানো। বসন্ত সাহা চোখ বুঁজে রয়েছেন। ঘটনাটা দেখবার চেষ্টা করছেন। কখনও সামনে অস্পষ্ট ফুটে উঠছে, কখনও মিলিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই সকলকেই কমবেশি এক রাউন্ড জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গিয়েছে। পনেরোজনের মধ্যে সুনন্দ, মেহুল আর নেই। এছাড়া বাদ গিয়েছে বসন্ত সাহা নিজে এবং ছন্দা। ধরা হয়নি অনুকূলবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে। মুকুরকে প্রথমে সন্দেহ করলেও পরে লিস্টের বাইরেই রাখা হয়েছে। তাহলে বাকি রইল, চার কাপল। পলাশ–কঙ্কণা, উজ্জ্বল– নয়নিকা, প্রতীক–মন্দার, দিশা–কিশোর। আর মেহুলের সেপারেশনে থাকা স্বামী তন্ময়। মোট ন'জন।

আজ দুপুরে সাগ্নিক বলেছিল, 'স্যার মেহুল নামের মেয়েটি খুন করবার পর সুসাইড করতে পারে না? নিজে বাড়ি গিয়ে হয়তো বিষ খেয়েছে।'

বসন্ত সাহা মুখ তুলে তাকালেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'মোটিভ?'
সাগ্নিক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হতে পারে বিট্রে। হতে পারে, পুরোনো কোন রাগ।'
বসন্ত সাহা নিজের মনে বললেন, 'তাহলে তো রহস্য ভেদ হয়ে গেল।'

37

সাগ্নিক বলল, 'হতেও তো পারে স্যার।'
বসন্ত সাহা বললেন, 'না পারে না। তাহলে বিষ বা বিষের কনটেনার পেতাম। ঘরে সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। লুকিয়ে কোথায় রাখবে? ঘর সার্চ হয়েছে। পারফিউম, লোশন, ক্রিমের শিশি চেক করা হয়েছে। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন। যেভাবে দুটো জিনিস মিশিয়ে এই বিষ তৈরি হয়েছে, তাতে কার কখন অ্যাকশন হবে বলা মুশকিল। কারও সঙ্গে সঙ্গে কারও তিন–চার ঘন্টা পরেও হতে পারে। দ্য মিকসচার অব ডি. স্ট্র্যামোনিয়াম অ্যান্ড ওপিয়াম ইজ কমপ্লিটলি আনপ্রেডিকটবল্। ইট হ্যাজ নো স্পেশিফিক অ্যান্টিডোট অলসো। তুমি তো জানো সাগ্নিক বিভিন্ন ধরনের পয়েজনের বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিডোট থাকে। ক্যারেক্টর, কম্পোজিশন ধরে ধরে তাদের লিস্ট করা আছে। সেভাবে ট্রিটমেন্ট হয়।'
সাগ্নিক বলল, 'তাহলে মেহুলকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ রাখতে হয়।'
বসন্ত সাহা বলেছিলেন, 'নতুন কোনও ইনফরমেশন না পাওয়া পর্যন্ত। যদি পাওয়া যায় তখন মত বদলাতে হবে। ইনভেস্টিগেশন তো কখনও রিজিড হয় না।'
দুজনেই একমত হয়েছে, বাকিদের মধ্যে থেকে একজন বা একাধিকজন এই জোড়া খুনের সঙ্গে জড়িত। ভেবেচিন্তে বিষ তৈরি করা হয়েছে। যাতে মৃত্যু অবধারিত হয়। চট করে এর কোনও অ্যান্টিডোট দিয়ে চিকিৎসা করা না যায়। সেই বিষ কায়দা করে দুজনকে খাওয়ানো হয়েছে। ফলে এদের কথা থেকেই বুঝতে হবে। সন্দেহ হলে চেপে ধরতে হবে।
জিজ্ঞাসাবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো মাথায় গেঁথে নিয়েছেন বসন্ত সাহা। আজ সারাদিন ধরে অফিসে বারবার পড়েছেন। মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এখন আবার পুরোটা মনে করবার চেষ্টা করছেন। যেটুকু মনে পড়ছে না, সেটুকু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। নিশ্চয় সেটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, হলে মনে থাকত। এদের কথার ফাঁকে ফোকরে কোথাও কি কোনও কাঁটা রয়েছে? যে কাঁটা মাথার ভিতর খচ্‌খচ্ করবে?
বসন্ত সাহা ইজি চেয়ার ছেড়ে স্টাডিতে গেলেন। টেবিলে বসে অফিসের কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করলেন। ইন্টারগশেনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আবার পড়তে হবে। কাঁটা নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে।

হঠাৎই তাঁর মনে পড়ে গেল এমন একটা কথা, যার সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কোনও সম্পর্ক নেই। শিল্পী অগুস্ত র‍্যনোয়ার বলেছিলেন, 'আমি তো নতুন কিছু করিনি, আমার পূর্বসূরীরা যে কাজ করেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করেছি।'

এই কথা এই সময় মনে হওয়ার কারণ কী! বসন্ত সাহা নিজের ওপর বিরক্ত হলেন। তিনি একজন দায়িত্ব সম্পন্ন পুলিশ অফিসার। সঙ্গীত, শিল্পকলা ধরনের বিষয়ে মন দিয়ে ফোকাস নষ্ট করে ফেলছেন না তো? তিনি পিঠ সোজা করে বসে কাগজপত্র টেনে নিলেন। তখনও তিনি জানেন না, জোড়া হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে শিল্পী র‍্যানোয়ার এই কথা কত কাজে লাগবে। তিনি জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম পাতা খুললেন।

কঙ্কণা—মুকুরদি আর সুনন্দদার সম্পর্ক খুব ট্রান্সপারেন্ট নয়। মুকুরদিকে কেউ বেশি পছন্দ করুক সুনন্দদা মেনে নিতে পারত না। আমার হাজব্যান্ড পলাশ ওয়াজ লিটল সফট অ্যাবাউট মুকুরদি। সুনন্দদা আমাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সে কথা জানিয়ে দিয়েছিল।

পলাশ—আমার সুনন্দকে কোনওদিনই পছন্দ নয়। মুকুরদিকে আমার ভাল লাগে। তবে সম্পর্ক করবার মতো কিছু নয়। আলাদা করে যোগাযোগ নেই। আমি ইনড্রাস্টিয়াল কেমিক্যালসের বিজনেস করি। বিভিন্ন কারখানায় সাপ্লাই দিই। স্পেশালি রাবার ফ্যাক্টরিতে। বাবার মোল্ড করতে লাগে। যদিও আমার স্ত্রী বলে, আমি নাকি বিষের ব্যবসা করি। সুনন্দদার স্টমাকে যে বিষ পাওয়া গিয়েছে তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

উজ্জ্বল- ছেলেবেলায় মুকুরের প্রতি আমার একটা ক্রাশ হয়েছিল। এমন ঘটনা সবার জীবনেই আছে। বাট এখন সে সব থেকে আমি অনেক দূরে। আর হ্যাঁ, এই বিষয়টা নিয়ে আমি সেদিনও মুকুরের সঙ্গে মজা করেছি। বলেছিলাম, তোর বরের জন্য বিষ নিয়ে যাব। জানি না, সে পুলিশের কাছে একথা বলেছে কিনা। আমি বলে রাখলাম। ইট ওয়াজ আ ফান। একেবারে নির্ভেজাল মজা। আপনার নিশ্চয় বুঝবেন। এত বছর পর ঘোষণা করে কাউকে খুন করবার মতো মানুষ আমি নই।

নয়নিকা— আমার বর এমনই একজন পুরুষ, যার সঙ্গে মেয়েদের প্রেম করতে চাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে সে আমার প্রতি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেয়ারিং এণ্ড রেসপনসিবল্। মুকুরদির প্রতি জেলাস হলে সুনন্দদাকে নিশ্চয় খুন করতে যাব না।

প্রতীক— আমি জানি, আমার ওপর আপনাদের সন্দেহ সবথেকে বেশি। সেটাই স্বাভাবিক। আমি পুলিশ হলে, আমিও সেই সন্দেহ করতাম। কারণ দু–দুটো মৃত্যুর বিষ ছিল খাবারের মধ্যে। যদিও সামান্য কটা টাকা ধার পাইনি বলে খাবারে বিষ মিশিয়ে দুটো মানুষকে মেরে ফেলব এমন উন্মাদ বলে কি আমাকে আপনাদের মনে হচ্ছে? টাকার পরিমাণটা শুনলে আপনারা অবাক হবেন। মাত্র দু' লক্ষ। দু' লক্ষ টাকার

জন্য সারাজীবন জেলে পচব? আর একটা তথ্য আপানাদের জানি রাখি। আপনারা হয়তো মনে করছেন, পার্টি ভেস্তে যাওয়ার পর আমি খাবারগুলো সরিয়ে ফেলি এবং ফেলে দিই যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে ওতে বিষ মেশানো ছিল। এই তথ্য ঠিক নয়। খাবারগুলো আমাদের স্টাফেরা ভাগাভাগি করে নিয়ে যায়। তারা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খেয়েওছে। কারও শরীর খারাপ হয়নি। বদহজমটুকু পর্যন্ত নয়। আপনার খোঁজ নিন। স্যার, সামান্য কিছু স্টার্টার ছাড়া আমাদের সার্ভ করা কোনও খাবার তো কেউ খায়নি। পনির পকোড়া আর চিকেন ড্রামস্টিকে কি আমার নুনের বদলে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিলাম? জানি ম্যাডাম আমাদের নামে কনপ্লেন করেছেন। ওর এখনও মাথার ঠিক নেই।

এখানে এসে থমকালেন বসন্ত সাহা। এই লোককে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে ঠিক কাজই হয়েছে। এই জিজ্ঞাসাবাদের আগে মুকুরেরে সিক্রেট ডায়েরি এবং সাগ্নিকের হোমওয়ার্কে কাজে দিয়েছে। তবে এখন সবথেকে জরুরি কাজটা চলছে। সাগ্নিক সকলের মোবাইল নম্বর থেকে তাদের কললিস্ট জোগাড় করছে। নম্বর গেছে মুকুরের কাছ থেকে। গেস্টদের মধ্যে কেউ কি কারও সঙ্গে কথা বলে? সেটা দেখাই মূল উদ্দেশ্য। এই লিস্ট থেকে বোঝা যাবে হত্যার কাজটা কারও একার নাকি? সঙ্গে আরও কেউ ছিল। এটা জানতে পারলে রহস্য অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। তবে কল লিস্ট বানাতে গিয়ে সবথেকে বড় সমস্যা হল কারও যদি দুটো বা তার বেশি সিম থাকে। ফোন করে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কেউ দিয়েছে তার আরেকটা নম্বর দিয়েছে, কেউ বলেছে নেই। কেউ গোপন করল সেটা ধরবার জন্য সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা মোবাইল নেট ওয়ার্কের সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। দু একদিনের মধ্যে বলে দেবে। সেই কারণেই সময় লাগছে। যে গোপন করেছে তাকে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

বসন্ত সাহা সাগ্নিকের সঙ্গে কথা বলে ইতিমধ্যে দুটো লিস্ট বানিয়ে ফেলেছেন। সন্দেহ আর সন্দেহের বাইরের লিস্ট। পাশে প্রয়োজন মতো কারণও লেখা হয়েছে। খানিকটা কল্পনা দিয়ে, খানিকটা যুক্তি দিয়ে। জেরা আর খোঁজ খবরের ভিত্তিও রয়েছে। ফোনের কল লিস্ট পেলে এই দুটো তালিকাই চুড়ান্ত হবে।

ছন্দা ঘরে এলেন।

‘একটা জিনিস দেখবে?’

বসন্ত সাহা চোখ খুলে বললেন, ‘কী জিনিস?’

ছন্দা চেয়ারের কাছে এগিয়ে এলেন। স্বামীর কাঁধের পাশ দিয়ে হাতের মোবাইলটা এগিয়ে ধরলেন।

‘এই ছবিটা দেখো। সেদিন মুকুরের পার্টিতে তুলেছিলাম। টেবিলের ওপর এই যে লাল সেডের বাঁশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে, ওটা আমার দেওয়া। হস্তশিল্প মেলা থেকে কেনা। কী সুন্দর না! বাঁকুড়ার একটি মেয়েটি তৈরি করছিল।’

বসন্ত সাহা অস্ফুটে বললেন, 'বাঃ।'
ছন্দা বলল, 'ছবিটা হঠাৎ চোখে পড়ল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মুকুর সেদিনই আলোটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ইস ওর জীবনের আসল আলোটাই নিভে গেল।'

বসন্ত সাহা মোবাইলটা হাতে নিলেন। ভারি স্বরে বললেন, 'তখনও কেক কাটা হয়নি। এই যে ট্রের ওপর সাজানো রয়েছে। ওপরে লেখাটাও পড়া যাচ্ছে। হ্যাপি বার্থ ডে। পাশে ওটা কী দেখা যাচ্ছে? কাঠের মতো...কেকের ট্রে থেকে উঁকি দিচ্ছে... '
ছন্দাও মোবাইল হাতে নিয়ে ভাল করে বললেন, 'আরে ওটা তো ছুরির হাতল। বাট। কাঠের সুন্দর কাজ করা। সেদিনই খেয়াল করেছিলাম। এটা দিয়েই তো কেক কাটা হল। হৈমন্তী মেয়েটা কাটল।'
বসন্ত সাহা বললেন, 'ও।'
ছুরিতে তাঁর ইন্টারেস্ট নেই। এই হত্যা রহস্যের সঙ্গে ছুরির কোনও সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক রয়েছে বিষের।

38

বসন্ত সাহা আবার কাগজপত্রে মন দিলেন। এবার প্রতীকের স্ত্রী। এই মেয়েটির জবানবন্দির একটি অংশ গোলমেলে। তবে গোলমালটা সরালে মজাই পাওয়া যাবে।
মন্দার— আমি আমার স্বামীকে বিশ্বাস করি না। ও বিজনেসের জন্য সবকিছু করতে পারে। পুরীতে পার্টনারশিপে হোটেল কেনবার চেষ্টায় আছে। সবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে বেড়ায়। আমার বাবার কাছ থেকেও নিয়েছে। হাড় কঞ্জুস। একটা পয়সা আমাকে দেয় না। খুন করতে পারে কিনা জানিনা। ফ্রিতে হলে একটা কথা ছিন, খরচাপাতি বেশি হয়ে গেলে করবে না।
হৈমন্তী— মুকুর আমার কলেজ জীবনের সহপাঠিনী। চমৎকার মেয়ে। কলেজে পড়বার সময় সে আমার কিছু উপকারও করেছে। মাঝখানে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ ছিল না। পরে আবার হয়। বেশিরভাগ সময়ে তার সঙ্গে ফোনে, হোয়াটস্অ্যাপে বা ফেসবুকের ইনবক্সে কথা হয়েছে। আমি কলকাতায় এসে তার নতুন ফ্ল্যাটে গিয়েছি। সে আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। সুনন্দর সঙ্গে আমার পুনেতে দেখা হয়েছে। সাকুল্যে দু'বার। মৃত্যুর পর বলা ঠিক নয়, তারপরেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই লোকটি সম্পর্কে আমার এক্সপিরিয়েন্স বিটার। যে সব পুরুষ একা থাকা মহিলাদের সহজলভ্য বলে মনে করে আমি তাদের পছন্দ করিনা। এই বিষয়ে আমি অবশ্য মুকুরকে কিছু বলিনি। গোপনই রেখেছি। এরপর থেকে আমি সুনন্দকে অ্যাভয়েড করি। পুরুষমানুষ নিয়ে এর আগেও আমার বিটার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। সম্ভবত সেটা আমার রূপের কারণে। আমি একজন কেমিস্ট। আমি ল্যাবরেটরিতে কাজ করি সেখানে কেমিক্যালস্ সব সময় লাগে।

তবে মানুষ মারবার জন্য নয়, কসমেটিকস্ তৈরির জন্য। আমি রিসার্চ করি। মুকুর আমাকে যখন ওর ফ্ল্যাটের জন্য একটা নাম ভাবতে বলে, আমার মজা লাগে। এরকম সচরাচর হয় না। ফ্ল্যাটে নম্বর থাকে। নাম থাকে এই প্রথম শুনলান। আমি তখন ওর পার্টতে নিজে থেকেই আসব বলি। তবে সঙ্গে অফিসের কাজও ছিল। ইস্টার্ন জোনের মার্কেটিং হেডের সঙ্গে কথা হয়েছে। হোটেলেই মিটিং করেছি। চাইলে ম্যানেজারের ফোন নম্বরও দিতে পারি। মুকুরকে একটা ক্রকারি সেট দিয়েছি। ঠিক ক্রকারি নয়, স্পুন, ফর্ক, নাইফ। নতুন ফ্ল্যাটে এগুলো খুব দরকার হয়। একবার পুনের ফ্ল্যাটে হাতের কাছে ছুরি না পেয়ে একটা ডাঁশা পেয়ারা কামড়ে খেতে যাই। আমার দাঁত ইনজিওরড্ হয়েছিল। আর হ্যাঁ, কেকটা আমার। তবে আমি হাতে করে নিয়ে যায়নি। ওদের ঠিকানায় অর্ডার দিয়েছি।

দিশা—ওদের সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না। বেড়াতে গিয়ে সুনন্দদা আর মুকুরদির সঙ্গে আলাপ। ঘনিষ্ঠতা কিছু হয়নি। মাঝেমধ্যে মুকুরদি টেলিফোন বা হোয়াটস্অ্যাপে যোগাযোগ রাখত। তবে মুকুরদি সঙ্গে ওর হাজব্যান্ডের রিলেশন খুব ইজি ছিল না। সুনন্দদার নাকি আগে একটা বিয়ে ছিল। মুকুরদি সেই কারণে নানা ভাবে উইল টুইল করে রেখেছে প্রোটেকশন নিয়ে রেখেছিল। আবার এটা সত্যি নাও হতে পারে। পলাশ বলেছে। সে ওদের খবর বেশি রাখে। একসময় এক পাড়ায় থাকত কিনা। তবে আমি এসব জানি না। পুনেতে চলে যাবার পর কলকাতায় আমার বেশি আসা হয় না।
কিশোর—সুনন্দদার সঙ্গে আমার খুবই অল্প আলাপ। ওরা যে আমাকে নেমন্তন্ন করেছে এটাই একটা সারপ্রাইজ। দিশা আর আমার সম্পর্কটা ভেরি সফট। যখন একসঙ্গে থাকি তো থাকলাম, যখন থাকলাম না কেউ কাউকে মনেও রাখি না। কারও স্পেসে এন্ট্রি নেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। উই আর ফ্রি বার্ড। এর মধ্যে কারও অন্য কোনও রিলেশন হল কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। উই ডোন্ট বদার। বদার করব না বলেই তো বিয়ের মতো পাকাপোক্ত কোনও রিলেশনে যাইনি। যাবও না। দিশা যদি অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্কে যায় তো যাবে। যাই হোক, সুনন্দদা এবং দ্যাট লেডি, কী যেন নাম? ওনাদের মৃত্যু খুব শকিং। মনে হচ্ছে, আমাকে এই পার্টিতে কেন নেমন্তন্ন করা হল? না হলেই ভাল হত।
তন্ময়- মেহুলের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদের কারণ তো আপনারা জানেন। আমাদের কনজুগাল লাইফ স্যাটিসফ্যাক্টরি ছিল না। আমরা দুজনেই মনে করেছিলাম, দিস্ ইজ নট ফেয়ার। যে কোনও কাপলের কাছে সেক্স ইজ ইমপর্টান্ট। সেটা যদি মনের মতো এবং শরীরের মতো না হয়, তাহলে একসঙ্গে থাকবার কোনও মানে হয়
না। আমার বলতে কোনও দ্বিধা নেই, আমি মেহুলতে বাদ দিয়ে একাধিক নারীর কাছে গিয়ে স্যাটিসফায়েড হয়েছি। চরিত্রহীন বা লম্পট এই দুটি শব্দ আমার ডিকশনারিতে একটু অন্যরকম স্যার।

আমার কাছে তারাই চরিত্রহীন বা লম্পট যারা শরীর খুশি না হলেও দাম্পত্য জীবনকে টিঁকিয়ে রাখবার ভান করে। হিপোক্র্যাট। মেহুলের মৃত্যুতে আমি খুবই ধাক্কা খেয়েছি। আমাদের ভালবেসে বিয়ে হয়েছিল। তাছাড়া একটি মানুষের সব পরিচয়টাই তো আর শরীর নয়। মেহুলের অনেকগুলো ভাল জিনিস ছিল। আমি তাকে বেড পার্টনার হিসেবে মেনে নিতে না পারলেও বন্ধু হিসেবে পছন্দ করতাম। সেপারেশনে থাকবার পরও দুজনে মিলে আমরা শপিং মল, সিনেমা, পার্টি অ্যাটেন্ড করেছি। মেহুলকে খুন করবার কোনও মোটিভ আমার নেই। ওর প্রতি আমার কোনও রিভেঞ্জ অ্যাটিটিইড নেই। সে আর আমি একমত হয়েই আলাদা হয়েছি। সেপারেশনের পর স্ত্রীর সম্পত্তির ওপর আমার কোনও দাবি নেই। করে লাভ হয় না। মনে হয় আইন পারমিট করে। তবে হ্যাঁ, যে ফ্ল্যাটটায় মেহুল থাকত, সেটা এখনও আমার নামেই করা।

বসন্ত সাহা এবার পাতা উলটে উপহারের তালিকায চোখ বোলালেন—

কঙ্কণা এবং পলাশ— মাইক্রোভেন এবং এতে ব্যবহার করা যায় এমন বাসনপত্র

উজ্জ্বল এবং নয়নিকা—মুকুর এবং সুনন্দর জন্য পারফিউম, আফটার সেভ লোশনের সেট। একাট মিনের কাজ কার বক্সের মধ্যে অনেকেগুলো শিশি

প্রতীক এবং মন্দার— পর্দা এবং বেডকভার।

দিশা—একটা ওয়াইনের বোতল সঙ্গে একটা মেটাল ওয়াইন র‍্যাক। ওয়াইনের বোতলটা খোলবার কথা ছিল।

কিশোর— ওয়াল ক্লক। ঘড়িটা দেখলে মনে হবে অ্যান্টিক।

অনুকূলবাবু এবং তাঁর স্ত্রী— কাপডিশের সেট।

তন্ময়—ফুলের তোড়া

মেহুল— মুকুরের জন্য একটা হাউজকোট। যার অনেকগুলো পকেট।

হৈমন্তী— ছুরি কাঁটার সেট। আর কেক।

বসন্ত সাহা এবং তাঁর স্ত্রী— টেবিল ল্যাম্প।

তালিকার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বসন্ত সাহা। শিশি বোতল এনেছে দুজন। একজন পারফিউম, একজন শ্যাম্পেন। অবশ্য বিষ উপহার হিসেবে আনতে হবে তার কোনও মানে নেই। একটা ছোটো শিশি শার্ট প্যান্টের পকেটে বা শাড়ির ভাঁজে রাখা যাবে অনায়াসে। তবে ওইদিক থেকে ভাবলে হবে না। অন্যভাবে দেখতে হবে। এতজনের মধ্যে কার কার বয়ানে অসংগতি রয়েছে? আজ আবার নতুন করে একটা–দুটো পাওয়া গেল। ছোটোখাটো গোলমাল। সেসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে চলবে না। রোজ একবার করে পড়লে এরকম ছোটোখাটো গোলমাল একটা না একটা পাওয়া যাবে। তবে একজন বেশি

গোলমাল করেছে। সে কে? গোলমালটাই বা কী? গলায় বিঁধে যাওয়া কাঁটার মতো খচখচ করছে কিন্ত তাকে দেখা যাচ্ছে না।

মোবাইল তুলে সাগ্নিকের নম্বর ধরলেন বসন্ত সাহা।

'হ্যাঁ স্যার।'

'রাত কি খুব বেশি সাগ্নিক?'

'না স্যার, মোটে সাড়ে ন'টা।'

'তুমি একটা কাজ করচতে পারবে।'

'পারব স্যার। কোথাও যেতে হবে?

'না কোথাও যেতে হবে না। টেলিফোনে করবে। গেস্টদের সকলকে জিজ্ঞাসা করবে। অবশ্যই আমাদের এবং অলুকূলবাবুদের বাদ দিয়ে। অগুস্ত র‍্যনোয়ার নামে কাউকে চেনে কিনা?'

'কী নাম বললেন স্যার?'

'অগুস্ত র‍্যনোয়ার'

'স্যার, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আপনি কি ফরাসি শিল্পীর কথা বলছেন?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'গুড। আমি জানতাম, এবার জানতে মুকুরের গেস্টেদের মধ্যে কে কে জানে?'

'স্যার, শুধু এইটুকই প্রশ্ন?'

'হ্যাঁ, আগে পিছে বলে তৈরি হবার সময় দেবে না। প্রশ্নটা হবে সাডেন। যেন তুমি পাড়ার মন্টুর কথা জানাতে চাইছো। গলার আওয়াজও খেয়াল করবে।'

সাগ্নিক বলল, 'ওকে স্যার। আপনাকে আধঘন্টার মধ্যে জানাচ্ছি।'

আধঘন্টা লাগল না। বাইশ মিনিটের মাথায় ফোন এলো।

বসন্ত সাহা আগ্রহ নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী হল সাগ্নিক ?'

সাগ্নিক বলল, 'তন্ময় বাদ দিয়ে সবাই ফোন ধরেছে স্যার। বেশিরভাগই অবাক হয়েছে। নামটা বুঝতেই পারেনি। একজন তো আমাকে রীতিমত ধমক দিল। পুলিশ বলে নাকি ঠাট্টা করছি।'

'কেউ পারল না? র‍্যনোয়ার যে একজন আর্টিস্ট সেটুকুও না!'

সাগ্নিক একটু থেমে বলল, 'না স্যার, একজন পেরেছেন। তিনি শুধু চিনতে পারেননি, হেসে বলেছেন, ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের মধ্যে হি ওয়াজড মোস্ট সাকসেসফুল ওয়ান। পুরো নাম পিয়ের অগুস্ত র‍্যনোয়ার। তার ছবির সবথেকে বড় দিক, জীবনের সেলিব্রেশন। প্রাণশক্তি আর উজ্বল আলোয় ভরা পৃথিবী। ও আরও বলেছে স্যার। বলেছে, এই শিল্পীর আঁকা ন্যুড নাকি অ্যামেজিং। তার নাম স্যার...।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'গুড। ওয়েল ডান সাগ্নিক। এই কাজ সবাইকে দিয়ে হত না। তোমাকে এবার যা বলছি মন দিয়ে শোনো।'

ডিনারে বসে চুপচাপ খাচ্ছিলেন বসন্ত সাহা। ঠিক খাচ্ছিলেন না, খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। খুব অন্যমনস্ক।

ছন্দা সাহা স্বামীর খাবার নাড়াচাড়া দেখে নিচু গলায় বললেন, 'তুমি শরীরের দিকে নজর দিচ্ছো না। কদিন অফিসে দই পর্যন্ত নিচ্ছো না। ফল খাওয়ার ব্যাপারে নেগলেক্ট করছো। টেবিলে যেমন ভাবে রেখে দিই, সেভাবেই পড়ে থাকে। জানি, মুকুরের পার্টির ঘটনা তোমাকে খুব আঘাত দিয়েছে। তোমার মতো পুলিশ অফিসারের সামনে খুন হয়ে গেল... আমারও খারাপ লাগছে। তাবলে শরীরের দিকেও তো খেয়াল করতে হবে। ফলটা অন্তত খেও।'

বসন্ত সাহা মুখ তুলে বললেন, 'আচ্ছা, ছন্দা পাকা পেয়ারা ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়া যায়, কিন্তু ডাঁসা পেয়ারা? যাকে আমার আধপাকা বা কাঁচা বলি, সেটা কি কখনও ছুরি দিয়ে কাটা যায়? শুনেছো কখনও?'

ছন্দা হেসে বললেন, 'কেন? তুমি ডাঁসা পেয়ারা খাবে? ছুরি দিয়ে কেন ওই ফল করাত দিয়েও কাটা যাবে না। খেতে হয় কামড় দিয়ে। দাঁতে জোর লাগে। এই বয়সে আর পারবে না। এই ঠাট্টা তোমার সঙ্গে কে করল?'

বসন্ত সাহা খাওয়ায় মন ফিরিয়ে খানিকটা নিজের মনেই বললেন, 'একজন করেছে। কিন্তু কেন করল? কথাটা চেপে গেলেই তো হত।'

ছন্দা বললেন, 'মনে হচ্ছে, রহস্য সমাধানের কাছাকাছি চলে এসেছো।'

বসন্ত সাহা খানিকটা আপনমনেই যেন বললেন, 'খুন কে করছে সেটা বড় কথা নয়...কীভাবে করেছে সেটাই! হাউ ডান ইট। সেটা বুঝতে পারলে সব স্পষ্ট হবে। এতক্ষণ বিষ নিয়ে ভাবছিলাম, এবার একটা ছুরি সমস্যায় ফেলছে।'

39

ফাইলের নাম 'মার্ডার ইন দ্য ড্রিম'। স্বপ্নের ভিতর হত্যা। সুনন্দ আর মেহুল হত্যার ফাইল।

আজ সকাল সকাল অফিসে এসেছেন বসন্ত সাহা। এসেই 'মার্ডার ইন দ্য ড্রিম' ফাইল নিয়ে পড়েছেন। সাগ্নিক গেস্টদের মধ্যে ফোনে কার সঙ্গে কার যোগাযোগ ছিল এবং এখনও রয়েছে সে ব্যাপারে একটা নোট তৈরি করেছে। যাদের একাধিক সিম কার্ড আছে অথচ সেই কার্ডের খবর দেয়নি, তাদের নামও পাওয়া গিয়েছে। সেই সংখ্যা মাত্র দু'জন। গেস্টদের ফেসবুক ঘেঁটেও অনেকটা প্রোফাইল মিলেছে। এই নোট সকালেই বসন্ত সাহাকে মেলে পাঠিয়ে দিয়েছে সাগ্নিক। আগের কাগজপত্র এবং এই নোট মিলিয়ে

গতকাল রাতের থেকেও সাসপেক্ট লিস্ট ছোটো করেছেন বসন্ত সাহা। গোড়া থেকে মনে হচ্ছিল এখনও মনে হচ্ছে, কে খুনি, কেন খুন তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কী ভাবে খুনটা হয়েছে। সেটা জানতে পারলে বাকি সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। দোষীকে ধরতে পারলেই জানা যাবে। খানিকটা সে নিজে বলবে, বাকিটা তদন্ত করলে জানা যাবে। আর সেটা জানতে হলে জানতে হবে, বিষ না ছুরি? হত্যাকাণ্ডের অস্ত্র কী?
বসন্ত সাহা তাঁর তৈরি করা লিস্টের দিকে তাকালেন। নামের পাশে টিক এবং কাটা দিয়ে রেখেছেন-
প্রতীক—সহজ লোক। ব্যবসা বাড়াতে চায়। সকলের কাছ থেকে টাকা চায় ঠিকই, তবে সেটা নিজের জন্য নয়, বিজনেসের জন্য। সে বিজনেস বড় করতে চাইছে। বিজনেসের গুড উইল নষ্ট হতে দেয় না। ওর কেটারিং–এর কাজে পার্টিরা খুশি। সুনন্দও অফিসে কাজ দিত। তরুণ বয়েসে পালিয়ে বিয়ে। মদ্যপান, মহিলার কোনও দোষ নেই। সে আরও অজস্র লোকের মতো সুনন্দর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে। কললিস্ট তাই বলেছে। টাকা না পাবার রাগে খুন করতে হলে, এই লোককে অনেককে খুন করতে হবে। খাবারে, জলে বিষ মেশানো এই লোকের পক্ষে সবথেকে সুবিধেজনক হলেও সে এই ধরনের কাজ করবার লোক নয়।

মন্দার—প্রতীকের স্ত্রী। খরুচে। স্বামী কঞ্জুস। এই নিয়ে নিত্য ঝামেলা। স্বামীর ওপর মাঝেমধ্যে এমন রেগে থাকে যে তার সম্পর্কে মুখে যা আসে বলে দেয়। মেয়েটি বোকাসোকা। তবে মন্দ নয়। সন্দেহের তালিকা থেকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে। মন্দারের ফোনকলে এই পার্টিতে আসা কোনও গেস্টদের নম্বর নেই।
কঙ্কণা— মুকুর সুনন্দর প্রাক্তন প্রতিবেশী। সন্দেহবাতিক। চরিত্রে গোলমালের খবর নেই। যদি কষ্টকল্পনায় খুনের কথা ধরতেই হয়, তাহলে এই মহিলা সুনন্দকে খুন না করে মুকুরকে খুন করত। কঙ্কণার সঙ্গে মুকুরের ফোনে কথা হত। এখনও একবার হয়েছে। একে সন্দেহ করা অর্থহীন।
হৈমন্তী—কম বয়সে বিয়ে। স্বামী সিনেমায় নামনোর লোভ দেখিয়ে মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করত। মেয়েরাও সুযোগের লোভে রাজি হয়ে যেত। শুধু চরিত্র খারাপ নয়, সিনেমার নাম করে স্ত্রীর কাছ থেকে টাকাও নিতে থাকে। বিয়ে ভেঙে যায়। এরপরে আবার প্রেম। সেটা বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে সম্পর্ক টেঁকেনি। মেয়েটি পড়াশোনায় অতিরিক্ত ভাল। বিদেশি কোম্পানিতে বড় চাকরি করে। পুনেতে ফ্ল্যাট কিনে একা থাকে। কাজে যোগ্য। যে কোনওদিন দেশের বাইরে চলে যাবে। পার্সোনালিটি অতিরিক্ত বেশি। একবার নাকি তার পুরোনো অফিসের বস ইন্‌ডিসেন্ট প্রোপোসাল দিলে সেই লোককে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছিল। রূপবতী এবং গুণবতী এই মেয়ে পুরুষের কাছ থেকে বারবার ধাক্কা খেয়েছে। তারপরেও আজ তার অনেক বয়ফ্রেন্ড। চেনাদের মধ্যে রয়েছে সুনন্দ,

কিশোর, তন্ময়। এছাড়া পুনেতে রয়েছে সুশান্ত, রোহিত। এসব ইনফরমেশন হৈমন্তীর ফোনের কললিস্ট আর পুনের পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া। সাগ্নিক যোগাযোগ করেছিল। হৈমন্তী কলকাতায় এসে সত্যি অফিসের কাজ করেছে। একে সন্দেহের তালিকায় রাখার কারণ তার উপহারের তালিকায় ছিল ছুরি এবং ছুরি দিয়ে ডাঁসা পেয়ারা কাটা নিয়ে মিথ্যে বলেছে। পলাশের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের কোম্পানির রেজিস্ট্রি হওয়া যে নম্বরটির প্রায়ই কথা হত, সেই কোম্পানির নাম 'বন উইদা'। এই কোম্পানিতে কেমিস্ট হিসেবে কাজ করে হৈমন্তী। তার কাজ কেমিকালস্ নিয়ে। কোম্পানির নাম এবং তার কাজ সম্পর্কে ইনফরমেশন হৈমন্তী নিজেই পুলিশকে দিয়েছে। এই মেয়েকে সন্দেহের তালিকায় রেখে পাশে একটা স্টার দিয়েছেন বসন্ত সাহা।

তন্ময়—মেহুলের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে। তারপরেও দেদার নারীসঙ্গ। গেস্টহাউসে, হোটেলে যাতায়াত। মেহুলের সঙ্গে তো বটেই, এই পার্টিতে গেস্ট ছিল এমন আরও একটি মেয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। সেই মেয়ে দিশা। কললিস্টে দিশার নম্বর পাওয়া গিয়েছে। দিশার দুটো নম্বর। যে নম্বর সে পুলিশকে দিয়েছে সেখানে যেমন তন্ময়ের নম্বর পাওয়া গেছে, যে নম্বর দেয়নি, সেখানেও পাওয়া গেছে। এই লোক অবশ্যই সন্দেহের মধ্যে থাকছে।

পলাশ—সহজ ছেলে। মুকুরকে পছন্দ করত। সেটা শুধু 'পছন্দ'ই, অন্য কিছু নয়। ফোনকল বলছে দুজনের ন'মাসে, ছ'মাসে যোগাযোগ ছিল। পলাশ পুলিশকে প্রথমদিনই জানায় তার দুটো ফোন নম্বর। দুটোই সে দিয়েছে। একসময়ে মুকুরকে নিয়ে বউয়ের সঙ্গে অল্পস্বল্প মনোমানিল্য হত। এখন সেসব অতীত। সমস্যা দুটো। পলাশ বিজনেসের কাজে মুম্বাই–পুনেতে নিত্য যাতায়াত করে এবং তার দুটো নয়, তিনটে ফোন নম্বর। তিন নম্বর সিমকার্ডটি তার কোম্পানির নামে করা। এই নম্বর থেকে এমন একটি ফোন নম্বরে মাঝেমধ্যেই কথা হয়েছে যেটি মহারাষ্ট্রে রেজিস্টার করা। নম্বরে ফোন করে যাকে পাওয়া গিয়েছে ট্রু কলার তার নাম দেখায়নি। দেখিয়েছে একট বিদেশির কোম্পানির নাম।

পলাশের নামের পাশে দুটো 'স্টার' চিহ্ন দিয়েছেন বসন্ত সাহা।

উজ্জ্বল- খুব ছোটোবেলায় মুকুরের প্রতি ক্রাশ। স্কুলজীবন। এখনও কথা হলে মজা করে। অতীত এবং বর্তমান বলছে ছেলেটি মোটের ওপর 'গুডবয়' ছবি আঁকতে পারত, পরে ছেড়েছুড়ে দেয়। এমনকী র‍্যানোয়ার নামও জানে না। ফোনকলে সেদিনের গেস্টদের কারও নাম নেই। একে লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

নয়নিকা—একটু হিংসুটে প্রকৃতির সহজ মেয়ে। দুটো মোবাইল নম্বর পুলিশকে দিয়েছে। একটায় শুধু ফেসবুকের জন্য ব্যবহার হয়। সন্দেহের লিস্ট থেকে বাদ।

দিশা—দুটো ফোন, দুটো নম্বরই পুলিশকে দিয়েছে। তন্ময়ের সঙ্গে ছাড়াও তার ফোনে কথা হয় পলাশের সঙ্গে। সুনন্দ মেহুলের মৃত্যুর পরও কথা হয়েছে। এই মেয়েকে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে। আরও একজনকে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে। সে খুন করেনি, কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত কিনা দেখতে হবে। সুনন্দকে কেন সন্দেহ?

সুনন্দ—তার সঙ্গে বিভিন্ন পুরুষ এবং মহিলার সম্পর্ক ছিল যারা মুকুরের পার্টিতে সেদিন এসেছিল। এই ছেলের অতীতেও বেশ বড় দাগ। আগে একটা বিয়ে করেছিল। সেই মেয়েটি সুইসাইড করে। সুইসাইড নোটে লিখে যায়, তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। মেয়েটির বাড়ির লোকেরা অভিযোগ করে, এই নোট জাল। প্রমাণ করা যায়নি। পুলিশের রেকর্ড বলছে, সন্দেহ থাকলেও কিছু করা যায়নি। মুকুরের সঙ্গে সুন্দর আলাপ হয়েছিল এই ঘটনার তিনবছর পর। এক অনাথ আশ্রমের অনুষ্ঠানে। মুকুরের স্কুল ছিল উদ্যোক্তা। একজন স্পনসর ছিল সুনন্দ। আলাপ গভীর হয় এবং বিয়েও হয়। মুকুর পুলিশকে জানিয়েছে, তার স্বামী অতীত গোপন করেনি। বলেছিল, তার স্ত্রীর আত্মহত্যার কারণ নাকি পুরোনো প্রণয়। এই কেলেঙ্কারি চাপা দিতেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার ঘাড়ে দোষ চাপায়। মুকুর এও জানিয়েছে, তার স্বামী তার প্রতি ছিল অত্যন্ত কেয়ারিং। বাচ্চাকাচ্চা না থাকায় যত্ন যেন বেশি করত। শুধু মুখে নয়, যাবতীয় বিমা, গাড়ি বাড়ি সবই মুকুরের নামে লিখে দিয়েছিল। অনেকে বলেছে, মুকুরই নাকি এই কাজ জোর করে করেছে, কথাটা ঠিক নয়।

বসন্ত সাহা চেয়ারে হেলান দিলেন। লিস্ট যতই ছোটো হোক, সন্দেহভাজনের সংখ্যা একেবারে কম নয়। পলাশ, দিশা, হৈমন্তী, তন্ময়। এদের সঙ্গে তালিকায় রয়েছে সুনন্দ নিজেও। মুকুর এবং মেহুলকে গোড়ায় সন্দেহ করলেও, এখন তারা বাদ পড়েছে। একজন বা দুজন মিলে খুন করেছে। দুজন যদি হয় তাহলে কম্বিনেশনগুলো নানা রকম হতে পারে। ছেলেতে মেয়েতে যেমন হতে পারে, তেমন ছেলেতে ছেলেতে বা মেয়েতে মেয়েতে হতে পারে। সুনন্দ যেভাবে নারীসঙ্গ করেছে, তাতে দু'জন মিলে এককাট্টা হয়ে খুন করাটা অসম্ভব নয়। আবার হতে পারে, সুনন্দর আগের স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতিশোধ। পুলিশ, আইন পারেনি, তাই অপরাধীর শাস্তির দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়া হয়েছে। সিনেমার ঢঙে। বসন্ত সাহা সোজা হয়ে বসে সামনের কাগজে লিখলেন—

১) কেন খুন?

উত্তর—মুকুরকে পাওয়ার লোভ? না, তাহলে মেহুলকে মরতে হত না। প্রতিশোধ? সুনন্দর আগের স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতিশোধ? হতে পারে। তবে সম্ভাবনা ক্ষীণ। আগেই হতো। বিশ্বাসঘাতকতা? সুনন্দর অন্য সম্পর্ক কারও ক্রোধের কারণ? এমন কেউ যে মুকুর–সুনন্দ ফটো রাগে ছিঁড়ে ফেলে। মেহুল? তবে কি সাগ্নিকের কথাই ঠিক? সুনন্দকে মেরে নিজে আত্মহত্যা করেছে? এটাও খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেক্ষেত্রে আত্মহত্যা

কেন? কেনই বা পার্টিতে হত্যাকাণ্ড ঘটানো। মেহুল তো সুনন্দকে অনেকে জায়গাতেই পেত। তার কাছে বিষের প্রমাণও মেলেনি। তবে কি খুনের পিছনে অর্থের লোভ। সুনন্দ মারা গেলে তার টাকা কে পাবে? তবে কি মুকুরকে আবার সন্দেহের তালিকায় পাঠাতে হবে? মুকুরের নিজেরে নামেই তো সম্পত্তির বেশিটা। তারওপর সে মা হতে চলেছে। এই সময়ে সে এই ভয়ংকর অপরাধ করবে কেন?

২) খুন পার্টিতে কেন?

উত্তর—সবার সামনে ঘটলে 'খুন' বলে বোঝা যাবে না। মনে হবে 'ফুড পয়জন'। তারওপর একসময় সুনন্দর হার্টের সমস্যাও হয়েছিল। সবথেকে বড় কথা, পার্টিতে একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার থাকায় সন্দেহ হওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠত না। উঠলেও দায় বর্তাবে যারা খাবার দিয়েছে তাদের ওপর। কেটারিং সার্ভিসকে ধরা হবে।

৩) গেস্টদের লিস্ট কে পেল?

উত্তর—এই কাজে এক নম্বর সন্দেহভাজন মুকুর, দু'নম্বর সুনন্দ। মুকুরের বাড়িতে কাদের যাতায়াত ছিল এটা দেখলে হবে না। সে তো মহুলও ছবি চুরি করেছে। দেখতে হবে, লিস্ট তৈরির পর কে গিয়েছিল?

৪) কেমন ভাবে খুন?

উত্তর—কেটারারের দেওয়া পকৌড়া, চিকেন ড্রামস্টিকে বিষ ছিল না। সবাই খেয়েছে। আর কী খাবার ছিল? কেক। কেকও সবাই খেয়েছে। বড় কেক কেটে খাওয়া হয়েছে। সব খাবারই সামনে ছিল। কীভাবে বিষ মেশানো হবে? শুধু সুনন্দ আর মেহুলের খাবারে বিষ মেশানো কী করে সম্ভব?

সাগ্নিক ঘরে এসে ঢুকল। সে উত্তেজিত।

'স্যার, জরুরি কথা ছিল।'

40

সাগ্নিকের উত্তেজনা দেখে বসন্ত সাহা একটু অবাকই হলেন। বললেন, 'আগে বোস। তারপর বল।'

সাগ্নিক বলল, 'স্যার, হৈমন্তীর ফোনের কললিস্টে কলকাতার দুটো ল্যান্ডলাইনের নম্বর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার দিন সকালে এই ফোন নম্বরগুলো থেকে তাকে ধরা হয়। হৈমন্তী তখন কলকাতার হোটেলে পৌঁছে গিয়েছে। ল্যান্ডলাইন বলে আমি ইগনোর করি। আজ একটু আগে আবার সেগুলো চেক করতে গিয়ে থমকে যাই। কাছাকাছি সময়ের মধ্যে ফোনগুলো এসেছে। একটা নম্বর পোস্টাপিসের, অন্য একটা এসেছে জেরক্সের দোকান থেকে। এরকম অদ্ভুত দুটো জায়গা থেকে ফোন আসবার কারণ কী হতে পারে স্যার ঠিক ধরতে পারছি না। খটকা লাগল। আজকের দিনে ল্যান্ডলাইন থেকে কে ফোন করবে?

তাও যদি কোনও বাড়ি বা অফিস থেকে হত। যিনি কলকাতার বাইরে থেকেন, শহরে এসছেন, তাকে ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন কেন? আপনার কি কিছু মনে হচ্ছে?'

বসন্ত সাহা সোজা হয়ে বসে চাপা গলায় বললেন, 'ওয়ান্ডারফুল! একটা কাজ করলে সাগ্নিক। একজনই ফোন করেছে... একজনই...।'

সাগ্নিক বলল, 'ঘুরে ঘুরে ল্যান্ডলাইন থেকে!'

বসন্ত সাহার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। হিসহিসে গলায় বললেন, 'যে ফোন করেছিল, সে মোবাইল নম্বর গোপন করতে চেয়েছে। শুধু মোবাইল নম্বর নয়, সে দুটো আলাদা জায়গা থেকে ফোন করে একধরনের বিভ্রম তৈরি করতে চেয়েছে। ধরেই নিয়েছিল, বিষয়টা একসময়ে পুলিশের কাছে আসবেই অথবা যদি আসে পুলিশ যেন বুঝতে না পারে। গুড, ভেরি গুড। আমরা ঠিক জায়গায় চলে এসেছি সাগ্নিক। এবার আমাদের দেখতে হবে, এই লোকটি কে? আমাদের সন্দেহের লিস্টের একজন কি?'

সাগ্নিক বলল, 'কী করে বুঝব ?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'এবার আর শুধু মাথায় হবে না, ফিজিকালি চেষ্টা করতে হবে। গায়ে গতরে খেটে। গিয়ে দেখতে হবে। পোস্টাফিসে হবে না, সেখানে কেউ বলতে পারবে না। ওই জেরক্সের দোকানে যেতে হবে। সেদিনের গেস্টদের ফটো তোমার কাছে রয়েছে না? ওই ছবি নিয়ে জেরক্সের দোকানে যে থাকবে দেখাতে হবে। জিগ্যেস করতে হবে চিনতে পারছে কিনা। বেশি নয়, পাঁচজনের ছবি। যদি চিনতে পারে, তাহলে কিছু করবার নেই, যদি না পারে... আমাদের চান্স নিতে হবে।'

সাগ্নিক বলল, 'স্যার, আমার কাছে ফটো নেই।'

বসন্ত সাহা একটু ভেবে বললেন, 'দাঁড়াও আমি দেখছি।'

বসন্ত সাহা মোবাইল টেনে নিয়ে নম্বর টিপলেন। ওপাশ থেকে ছন্দা বিরক্ত গলায় বললেন, 'আজও তুমি ফল খাওনি! এতো করে বললাম। দই নিয়ে যেতেও ভুলে গিয়েছ। আগে তো কখনও এরকম করওনি। খুনের তদন্ত তো আগেও বহু করেছো।'

স্ত্রীর ধমক খেয়ে বসন্ত সাহা আমতা আমতা করে মাথা চুলকে বললেন, 'সেই জন্যই তো তোমাকে ফোন করলাম। আমি ফল আনিয়ে খেয়ে নিচ্ছি।'

ছন্দা একটু শান্ত হয়ে বললেন,'রোজ রোজ এরকম কোর না।'

বসন্ত সাহা স্বস্তির গলায় বললেন, 'নানা, আর ভুল হবে না। ছন্দা তোমার কাছে মুকুরের পার্টির কিছু ফটো আছে না? সেদিন আমাকে দেখাচ্ছিলে।'

ছন্দা বললেন, ‘আছে কয়েকটা। একটা ভিডিও ক্লিপিংসও রয়েছে। দিশা মেয়েটি সেদিনই পাঠিয়েছিল। নেমপ্লেট উদ্বোধন, কেক কাটা সব আছে। সুনন্দ অসুস্থ হবার আগে পর্যন্ত। হোয়াটস্‌অ্যাপে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

বসন্ত সাহা তাড়াতাড়ি বললেন, ‘ওসব ভিডিও টিডিও লাগবে না। তুমি আমাকে একটা গ্রুপ ফটো পাঠাও। যেখানে সবাই থাকবে। এখনই পাঠাও।’

তিন মিনিটের মধ্যে ফটো চলে আসে। সেই ফটো সাগ্নিকের মোবাইলে পাঠিয়ে দেন বসন্ত সাহা। সাগ্নিক উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ‘আমি যাচ্ছি স্যার। খুব চেষ্টা করব। আর একটা কথা। হৈমন্তীর মোবাইলে আরও দুটো নম্বর ফ্রিকোয়েন্টলি পেয়েছি স্যার। দুজনেই মেয়ে। একজনের নাম পূরবী মাথুর। সে পুনের বন উইদো কোম্পানির ল্যাবরেটরিতে কাজ করে। পরিচয় গোপন করে এই নম্বরে আমি ফোন করেছিলাম। ভান করেছিলাম, ভুল নম্বর হয়ে গিয়েছে। ততক্ষণে মেয়েটির নিজের নাম আর পরিচয় বলে ফেলে। অ্যাপারেন্টলি সরল মনে হয়েছে। আর একজনের নাম রায়না। সেও পুনের মেয়ে। জানতে পেরেছি শি ইজ অ্যান আর্টিস্ট। স্যার, আমার বিশ্বাস এই রহস্যের জট যেমন কলকাতায় তেমন পুনেতেও রয়েছে। সুনন্দ প্রায়ই পুনেতে যেত।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘আমিও তাই মনে করি।’

সাগ্নিক বলল, ‘মেহুলও ফ্রিকোয়েন্টলি মুম্বাই যেত। পুনে যেত কিনা জানি না। তবে পুনেতে ওর ঘন ঘন ফোন কল হয়েছে। মোবাইলের সার্ভিস প্রোভাইডার গতকাল এই ইনফরমেশন দিয়েছে। তন্ময়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর সে কলকাতার বাইরে কাজ খুঁজছিল।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘পুনেতে যেতে পারলে হত। কিন্তু সে সময় হাতে নেই। পুনের লিঙ্ক কাদের রয়েছে তোমার মনে আছে?’

সাগ্নিক বলল, ‘অবশ্যই স্যার।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘আমি পুনের পুলিশের সঙ্গে কথা বলব। এই অ্যাড্রেসগুলোতে গিয়ে একবারে দেখলে হত। কোনও না কোনও ক্লু বের হতো। তোমার কাছে হৈমন্তী আর সুনন্দর অ্যাড্রেস আছে?’

সাগ্নিক বলল, ‘আছে স্যার। তবে কোর্টের অর্ডার ছাড়া সার্চ কী করে হবে?’

বসন্ত সাহা হেসে বললেন, ‘সব আইন মেনে চললে আইনরক্ষক হওয়া যায়, গোয়েন্দাগিরি করা যায় না। এই যে আমরা সবাইকে কলকাতায় ডিটেন করিয়েছি, এটা কি আইন মেনে? এই যে সকলের পিছনে লোক লাগানো রয়েছে এটা কি আইন মেনে?’

সাগ্নিক বলল, ‘সরি, এটা ভাবিনি স্যার। অ্যাড্রেসদুটো মেলে দেওয়া রয়েছে।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘দেখি আমি ওখানকার পুলিশের সঙ্গে কথা বলে কী করতে পারি। তুমি আর দেরি

কোর না। ফোনবুথের দোকানের ইনফর্মেশন খুব জরুরি হয়ে যেতে পারে। অবশ্য যদি পাওয়া যায়। হৈমন্তী সঙ্গে কে লুকিয়ে কথা বলেছে?'

সাগ্নিক বলল, 'পূরবী এবং রায়ানের ফোন নম্বর দুটো কাগজে লিখে আপনার কাছে রেখে গেলাম। যদি প্রয়োজন মনে করেন।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'রেখে যাও। তুমি কিছু পেলে আমাকে জানিও।'

সাগ্নিক বেরিয়ে যাওয়ার পর কন্ট্রোলরুমকে দিয়ে পুনের পুলিশ হেড কোয়ার্টারে কথা বললেন বসন্ত সাহা। 'তালা ভেঙে ঢুকতে না চাইলে বাইরে থেকে যতটা পারেন খবর জোগাড় করে দিন। আর অবশ্যই এই দুই জায়গাতেই পুলিশ পোস্টিং করবেন। মেইলে অফিসিয়াল চিঠি আর ঠিকানাগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

এখন অপেক্ষা করতে হবে। সাগ্নিক খবর পাঠাক। যদি না পারে, তাহলে চারজনকে আবার জেরায় বসাতে হবে। আর সেটা আজই করতে হবে। দরকার হলে গোটা রাত নিতে হবে। হার্ড হতে হবে। হাতে আরও কিছু প্রমাণ নিয়ে হার্ড হলে সুবিধে।

বসন্ত সাহা বাড়ি থেকে যখন বেরোন, অফিসের কাগজপত্রের সঙ্গে বই রাখেন। আজও রেখেছেন। এতদিন রাখছিলেন ছবি বিষয়ে, বিষয় আজ বদলেছে। আজকের বিষয় খুবই ইন্টারেস্টিং। 'বিষ'। বিষের সঙ্গে রোমান্সও জড়িয়ে আছে। চটি বই। আজ সকালে নিজের লাইব্রেরির তাকে বই খুঁজতে গিয়ে জীর্ণ মলাটের বইটি চোখে পড়ে। হয়তো চিত্রকলা থেকে একবারে উলটো দিকে থাকবেন বলেই আজ 'বিষ' বেছে নিয়েছেন বসন্ত। আবার এমনও হতে পারে, সুনন্দ–মেহুল রহস্য তাকে অবচেতনে এই বই নিতে বলেছে। হতে পারে না?

লাইব্রেরিতে দাঁড়িয়েই বইটা খুলে উলটেপালটে দেখেছিলেন। বইটা তো আগে পড়াই হয়নি! নিশ্চয় আলমারিতে গা ঢাকা দিয়েছিল। এরকম কত বই কেনবার পর গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তবে এই বই কারও লেখা নয়। 'মেমোরিয়াল লেকচার' বই হিসেবে ছাপানো হয়েছে। নাম 'পয়েজন এন্ড পয়েজনিং—দেয়ার হিস্ট্রি এন্ড রোমান্স এন্ড দেয়ার ডিটেকশন ইন ক্রাইম।' বাংলা করলে দাঁড়ায় 'বিষ এবং বিষ প্রয়োগে প্রণয়, ইতিহাস এবং অপরাধের ঘটনায় তাকে খুঁজে পাওয়া।' একটু বড়, তবে অনুবাদ হিসেবে মন্দ নয়। ১৯৬৪ সালে কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছ'দিন ধরে একটি 'নামাঙ্কিত ভাষণ' –এর আয়োজন হয়েছিল। 'ক্ষান্তমণি–নগেন্দ্রলাল মেমোরিয়াল লেকচার'। ১৯৬৪ অক্টোবরের তিন অক্টোবর থেকে আট অক্টোবর ধরে এই ভাষণ দেন প্রফেসর কে.এন. বাগচী। তিনি ছিলেন বায়োকেমিস্ট্রির অধ্যাপক। একসময়ে 'ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট'–এর প্রিন্সিপাল ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাসায়নিক পরীক্ষকও হন। ১৯৬৯ সালে এই ছ'দিনের ভাষণ বই আকারে প্রকাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সকালেই অনুকূলবাবুকে ফোন করেন বসন্ত সাহা।

'স্যার, আপনাদের সাবজেক্টের ওপর একটা বই পড়ছি।'

বইটার কথা শুনে অনুকূলবাবু তো অবাক।

'আরে! এই বই পেলেন কোথায়! আমিও পড়েছি। তবে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে।'

বসন্ত সাহা হেসে বললেন, 'তবে বলুন স্যার। শুধু গান আর ছবি নয়, এইধরনের বইও আমার নিজের স্টকেও থাকে। মনে হয় কোনও সময় ফুটপাথ থেকে কিনেছিলাম। পড়া হয়ে ওঠেনি।'

অনুকূলবাবু উৎসাহ বললেন,'এক্সেলেন্ট বই। মনে আছে। বিষের কী নেই ওখানে? সব আছে। ইতিহাস, প্রেম, প্রয়োগ, অ্যানাটমি। ধুতরো, আর্সেনিক, মতো নানা ধরনের বিষের কথাও পাবেন। যতদূর মনে পড়ছে, এই প্রফেসর বাগচী লেকচারে মেয়েদের বিষ ব্যবহার নিয়ে অনেকটা বলেছিলেন। একটা সময় তো মেয়েরা বিষ দিয়েই খুন করত। অস্ত্র যেমন গোপন করা যেত, আবার বল প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয় না। পড়ে ফেলুন। গোয়েন্দা গল্পের মতো।'

বসন্ত সাহা খুশি হয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ। এই জন্যই আপনাকে ফোন করে জানালাম।'

বসন্ত সাহা সুনন্দ হত্যা রহস্যের কাগজ সরিয়ে বই খুললেন।

41

গাড়িতে আসতে আসতেই বইটার ছ'টা পাতা পড়া হয়ে গিয়েছে বসন্ত সাহার। সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং। এরকম একটা রহস্যের মধ্যে থেকেও বইটা ধরে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। বসন্ত সাহা মনে মনে ভাবলেন, না, চিত্রকলা থেকে একটু সরে এসে ভালই হয়েছে।

মেমোরিয়াল লেকচারে প্রফেসর বলেছেন, প্রাচীন এবং মধ্যযুগে ধনী, অভিজাত ঘরের মহিলারা কড়া বিষ বানাতে পারত। হত্যার জন্য ব্যবহার করত সেই বিষ। অপরাধ গোপন রাখতে বিষের জুড়ি নেই। এই ধরনের হত্যার কারণ বেশিরভাগই ছিল হিংসে নয়তো প্রতিশোধ।

বই থেকে মুখ তুললেন বসন্ত সাহা। ভুরু কুঁচকে তাকলেন সামনের শূন্য দেওয়ালের দিকে। মাথার ভিতর যেন একটু একটু করে আলো জ্বলে উঠছে। সুনন্দ হত্যার কারণ কী? হিংসা? নাকি প্রতিশোধ? বই সরিয়ে বসন্ত সাহা সাগ্নিকের দুটো ফোন নম্বর লেখা কাগজটা টেনে নিলেন।

পূরবী মাথুর ফোন ধরতে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আশা করি ট্রু কলারে আপনি আমার কলকাতা অফিসের পরিচয় ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছেন। বুঝতে পারছেন, আমি ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ফোন করছি না। পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে আমি চাকরি করি।'

কাঁপা গলায় পূরবী বলল, 'কী হয়েছে স্যার। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। ম্যাডাম কলকাতায়। ওঁর কি

কিছু হয়েছে?'

বসন্ত সাহা এই উৎকণ্ঠার জবাব না দিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আমি একটি বিষয়েই প্রশ্ন করব। ঠিক উত্তর দেবেন। আশাকরি, আপনার কাছ থেকে ঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য আমাকে পুনের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে না। সেটা আমাদের দুজনের জন্যই আনফরচুনেট হবে।'

পূরবী আরও কাঁপা গলায় বলল, 'বলুন স্যার।'

'ডি. স্ট্র্যামোনিয়াম, ওপিয়াম এবং সালফিউরিক অ্যাসিড এই তিন কেমিক্যাল কি আপনাদের কাজে কোনও প্রয়োজন হয়?'

পূরবী বলল, 'অবশ্যই হয়। ল্যাবরেটরি সব সময় রাখতে হয়।'

'সাপ্লায়ার রয়েছে?'

পূরবী বলল,'হ্যাঁ। এগুলো হেভি পয়েজনাস। মিশে গেলে আরও ডেনজারাস। লাইসেন্সড্ সাপ্লায়ার ছাড়া পাওয়া যায় না।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'আপনাদের কি এগুলো মেশাতে হয়?'

পূরবী বলল, 'কখনও কখনও হয়। কদিন আগে দুটো শিশি মিসপ্লেসড্ হয়েছিল।'

বসন্ত সাহা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'মিসপ্লেস হয়েছিল! হারিয়ে গিয়েছিল?'

পূরবী বলল, 'ভুল জায়গায় রাখা হয়েছিল। ম্যাডাম আমাদের অ্যালার্ট থাকতে বলেছেন।'

'ম্যাডাম কে?'

পূরবী বলল, 'আমাদের বস। কোম্পানির চিফ কেমিস্ট। হৈমন্তী সেন।'

বসন্ত সাহা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'থ্যাঙ্কু পূরবী। শুধু পুলিশের তরফ থেকে একটাই অনুরোধ করব।'

'বলুন স্যার।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'আমাদের এই ডিসকাশন আর কেউ না জানলেই ভাল হয়। একটা ইনভেস্টিগেশনরে মধ্যে রয়েছি। সকলের ফোনের ওপরই আমাদের নজর রাখতে হয়েছে।'

পূরবী আতঙ্কিত গলায় বলল, 'সেকী! আমার ফোনেও...।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'সরি, এটা ডিউটি। ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়। মনে রাখবেন, আর কারও সঙ্গে আমাদের এই আলোচনা শেয়ার না করাই ভাল। তাহলে রাখলাম।'

পূরবীর ফোন ছেড়ে রায়নার নম্বর ধরলেন বসন্ত। একই ভাবে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেলেন, 'বন উই দ্য কোম্পানির মিসেস হৈমন্তী সেনের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

‘উনি আমাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়েছেন।’

‘কী ছবি?’

‘নিজের ছবি।’

‘পোর্ট্রেট?’

‘অনেকটা তাই। এর বেশি কিছু বলা যাবে না। প্রফেশনাল এথিক্স। আমি ওঁকে কথা দিয়েছি।’

বসন্ত সাহা বললেল, ‘ছবিটা কার কাছে সেটা কি বলা যাবে?’

‘মনে হয়, মিসেস সেনের কাছেই রয়েছে। সেরকমই উনি বলেছিলেন।’

বসন্ত সাহা ফোন নামাতে নামাতে সাগ্নিকের ফোন।

‘স্যার জেরক্সের দোকানের ছেলেটির নাম শশা। শশা চিনতে পেরেছে। বলেছে এই লোকটাই সেই নম্বরে ফোন করেছে কিনা জানি না। তবে সেদিন ফোন করতে ঢুকেছিল। তার মনে থাকবার কারণ লোকটার গাড়ির নম্বরটা ছিল অদ্ভুত। ১২৩৪৫। শশা নিজের মোবাইলে একটা ছবিও তুলে রেখেছে। আমাকে দেখিয়েছে। গাড়ির মালিককে দেখা যাচ্ছে। স্যার, লোকটা সুনন্দ।’

বসন্ত সাহা বললেন, ‘চলে এসো। সাগ্নিক, মনে হচ্ছে, রহস্যের সমাধান হয়ে গিয়েছে। আসামী ধরা পড়বে।’

সাগ্নিক বলল, ‘মোটিভ?’

বসন্ত সাহা নিচু গলায় বললেন,‘আসামী নিজেই বলবে। বলেছিলাম না, এই রহস্য সমাধানের পথটা উলটো হবে। তুমি এসো। কাজ আছে।’

ইন্টারকম তুলে কন্ট্রোলরুম ধরলেন বসন্ত সাহা। চেয়ারে হেলান দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলেলেন, ‘হোটেলের নামটা লিখে নিন। আর একটা ফ্ল্যাটের অ্যাড্রেসও দিচ্ছি। প্লেন ড্রেসে গার্ড পাঠান। হোটেলের বাইরে, ভিতরে গার্ড থাকবে। হৈমন্তী সেনের রুম নম্বর জেনে করিডোরে লোক রাখুন। দেখবেন যেন বেরোতে না পারে। দিশা নামের মেয়েটিও যেন ফ্ল্যাট থেকে বেরোতে না পারে। জোর করলে থানায় নিয়ে যাবেন। দু’ জায়গাতেই লেডি পুলিশ সঙ্গে রাখবেন। আমি না বললে কাউকে অ্যারেস্ট করবেন না। দুজন নয়, শেষ পর্যন্ত আমরা একজনকে ধরব।’

ইন্টারকম ছেড়ে বসন্ত নিজের মনে বললেন, ‘আর একটু...আর একটু...।’

বলতে বলতে তিনি আবার রায়না মেয়েটিকে ফোন করলেন। পুনে চলে গেলে হত, হাতে সময় নেই। যা করবার আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে করতে হবে।

‘রায়না, আপনাকে আবার ফোন করছি বলে কি আপনি বিরক্ত হচ্ছেন?’

রায়না শান্ত গলায় বলল, ‘না, আমি অত সহজে বিরক্ত হই না। তারওপর আপনি একজন পুলিশ

অফিসার। আমার এক কাজিন পুলিশে চাকরি করেন। বুঝতে পারছি, আপনি কোনও প্রয়োজনে বারবার ফোন করছেন। তবে এথিক্সের বাইরে গিয়ে কোনও উত্তর দিতে পারব না। '

'ভেরি গুড। আচ্ছা, আপনি কি মনে করে বলতে পারবেন হৈমন্তী সেনের ছবি আঁকবার সময় তার সঙ্গে কেউ ছিল কিনা ? কোনও পুরুষমানুষ?'

রায়না একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দীর্ঘদিনের সিটিঙে যে ছবি আঁকা হয়েছে সেখানে কারও থাকা সম্ভব নয়, কোনও পুরুষমানুষের তো নয়ই।'

বসন্ত সাহা থমকে গেলেন। বললেন, 'ও। উনি তবে একাই থাকতেন?'

রায়না বলল, 'বললাম তো সেখানে আর্টিস্ট ছাড়া কারও থাকা সম্ভব নয়। উনি একটা বই নিয়ে বসে যেতেন। বইটার কভার এবং নামও মনে আছে। আমাকে সেটাও আঁকতে হয়েছে কিনা। নাইভস্ টু থাউজেন্ড নাইনটিন। কভারে একটা ছুরির ছবি। যার হাতলের কারুকাজ ডিটেলে ধরে রাখতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।'

বসন্ত সাহা ফোন চেপে ধরে উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'বইটার কী নাম বললেন?' রায়না একটু অবাক হয়ে বলল, 'নাইভস্ টু থাউজেন্ড নাইনটিন। ছুরি টুরি নিয়ে লেখা হবে। বইটা কি কোনও ইস্যু?'

বসন্ত সাহা বললেন, 'থ্যাঙ্কু, থ্যাঙ্কু ভেরি মাচ।'

বসন্ত সাহা উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখ মুখ বদলে গিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে তিনি রহস্য সমাধানের শেষ পর্বে এসে পৌছেছেন। তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। হাত বাড়িয়ে 'বিষ' বিষয়ক চটি বইটা বন্ধ করতে গিয়ে খোলা পাতায় চোখ পড়ে গেল। চমকে উঠলেন বসন্ত সাহা। এ কী পড়ছেন! দাঁড়িয়েই খোলা পাতার লাইন কটা পড়ে ফেললেন।

বইতে এক রানির গল্প বলেছেন প্রফেসর বাগচি। ৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের এই রানির নাম পাহিজাচিস্। বিষ প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। তিনি তাঁর জা স্টাটিরাকে হত্যা করেছিলেন। সেই মহিলাও একজন রানি। রাজা সাইরাসের স্ত্রী। পাহিজাচিস্ খেতে বসে তাঁর জায়ের মাংসে কড়া বিষ মিশিয়ে দেন। মেশানোর পদ্ধতিটি যেমন বুদ্ধির, তেমন অভিনব। তিনি ছুরির একদিকে বিষ লাগিয়ে নিয়েছিলেন। অন্যদিকটা ছিল পরিষ্কার। ওই ছুরি দিয়ে মাংস কাটেন পাহিজাচিস্। বিষ লাগানো দিকের মাংসটা তুলে দেন জাকে। উলটোদিকের অংশটা খান নিজে। জা নিশ্চিন্তে মাংস খান এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যান। পাহিজাচিসের কিছু হয় না। কেউ সন্দেহও করতে পারেনি। কারণ ওই একই মাংস তিনি নিজেও খেয়েছেন। একই ছুরি দিয়ে কাটা। কেউ ভাবতেও পারেনি, ছুরি এক হলেও, ছুরির দুটো দিক ছিল আলাদা। একদিকে বিষ, অন্যদিক স্বাভাবিক।

বসন্ত সাহা চেয়ারে বসে পড়েন। ভংয়কর! শিল্পী অগ্যস্ত রনোয়্যারের কথা মনে পড়ছে। তিনি বলছেন, 'আমি তো নতুন কিছু করছি না। আমার পূর্বপুরুষরা যা করছেন তার পুনরাবৃত্তি করছি।'

ইতিহাসের রানির মতোই হৈমন্তীর আনা ছুরির একদিকেও বিষ ছিল। উপহার হিসেবে দেওয়া নতুন ছুরি। বিষের শিশি লুকিয়ে আনতে হয়নি তাকে। আগে থেকেই মাখিয়ে এনেছিল। সবটা পরিকল্পনা করেই সে কেক আনবার দায়িত্ব নিয়েছিল। তারপর? কেক কে কেটেছে? ছবি কোথায়? ছন্দার পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপের কথা মনে পড়ে যায় বসন্ত সাহার। টেবিলে পড়ে থাকা মোবাইল হাতে তুলে নেন দ্রুত। হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে ভিডিও খোলেন। ছবি ভেসে ওঠে মোবাইলের স্ক্রিন জুড়ে।

'দ্য ড্রিম' লেখা কেক কাটছে হৈমন্তী। কেক টেবিলের ওপর রাখা। সবাই আগ্রহ নিয়ে ঘিরে ধরে দেখছে। হৈমন্তী হাসতে হাসতে কাটছে। কাটছে ছুরির ডগা দিয়ে। কেকের গায়ে ছুরির ব্লেড লাগে না। কাটবার পর হৈমন্তী হাত বাড়িয়ে এক একটা টুকরো এগিয়ে দিচ্ছে। হাসতে হাসতে কারও কারও মুখে পুরেও দিচ্ছে। একসময়ে ছুরিটা সে কাত করল। একদিকের ব্লেড পুরো লেগে গেল কেক। সেখান থেকে একটা টুকরো সে এগিয়ে দেয় সুনন্দকে, একটা দেয় মেহুলের মুখে। উলটো দিকের টুকরো নিজে তুলে মুখে দেয়। ব্যস্ এই পর্যন্ত। ভিডিও শেষ।

কখন যে সাগ্নিক ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে বসন্ত সাহা বুঝতেও পারেননি। তাকে সংক্ষেপে সব বলে মোবাইলটা এগিয়ে দেন।

কন্ট্রোলরুমে ফোন করে বলেন, 'একটু আগে দিশা নামের একটি মেয়ের ফ্ল্যাটে গার্ড পাঠাতে বলেছিলাম। তুলে নিন দরকারক নেই। হৈমন্তীর সেনের হোটেল ঘিরে ফেলুন। আমার আসছি।'

বসন্ত সাহা যখন হৈমন্তী সেনের হোটেলের ঘরে নক্ করেন, হৈমন্তী তখন মোবাইলে গান শুনছিল।

'ফর দ্য আদার হাফ অফ দ্য স্কাই
উওম্যান আই ক্যান হার্ডলি এক্সপ্রেস...।'

সে দরজা খুলে হেসে বলল, 'আসুন আমি অপেক্ষা করছিলাম। যখন পূরবী আর রায়নাকে ফোন করেছেন খবর পেয়েছি তখনই জানতাম আপনারা আসবেন।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'চলুন। আর দেরি করবেন না। মুকুরের ফ্রিজ থেকে কেকের একটা অংশ পাওয়া গিয়েছে। সে ফেলতে ভুলে গিয়েছিল। কিচেন থেকে ছুরিটাও মিলেছে। যদিও সেটা ধোয়া। তবে অনুকূলবাবু বলছেন, ধুলেও ফরেনসিকে বিষের কিছু চিহ্ন পাওয়া যাবে। এবার যদি বলেন, বিষের শিশিটা কোথায় রয়েছে, আমাদের সুবিধে হয়।'

হৈমন্তী বলে, 'দাঁড়ান আমি বের করে দিচ্ছি।'

থানায় যাওয়ার আধঘন্টার মধ্যে হৈমন্তী সব বলে দেয়।

শরীরের প্রয়োজনেই সুনন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক। একসময়ে মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করে সুনন্দ। মুকুরকে সরিয়ে তার সম্পত্তিও নিতে চেয়েছিল। চেয়েছিল, এই ভয়ংকর কাজটা হৈমন্তী করুক। শেষদিকে ভয় পাওয়ার ভান করে। সেটা ধরতে হৈমন্তীর সমস্যা হয়নিয ততক্ষনে মেহুলের সঙ্গে সুনন্দর প্রেমের খবর হৈমন্তীর জানা হয়ে গিয়েছে। খবর দিয়েছিল তন্ময়। তন্ময়ের সঙ্গেও আলাপ হঠাৎই। সেই ছেলেও শরীরে চমৎকার। সুনন্দর পরিকল্পনা ছিল, বউ মরলে সম্পত্তির মালিক হওয়া। তারপর খুব সম্ভবত মেহুলকে বিয়ে।

টেবিলের উলটোদিকে বসা হৈমন্তীকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিলেন বসন্ত সাহা। সেই জল খেয়ে হৈমন্তী বলল,'মিস্টার সাহা বার বার ঠকলে রাগ নয়, ক্লান্তি হয়। মনে হয়, আর ঠকব না। এই ক্লান্তি শেষ হোক। তাই সুনন্দকে বিষ মেশানো কেক খাইয়ে দিলাম। ও তো শুধু আমাকে নয়, মুকুরের মতো একটা ভাল মেয়েকেও ঠকাচ্ছিল।'

বসন্ত সাহা শান্ত ভাবে বললেন, 'আপনিও তো ঠকাতেন। পুরুষমানুষদের আপনিও তো ঠকিয়েছেন। ঠকাননি?'

'নেভার, আমি কখনও ভালবাসার কথা বলিনি। আমি শুধু শরীরক নিয়েছি। সুনন্দবেলাতেও তাই।'

বসন্ত সাহা বললেন, 'মেহুলকে মারলেন কেন? ওকে বিষ না খাওয়ালে হতো না?'

হৈমন্তী বলল, 'ওটা জেলাসি। সুনন্দ ওকে বিয়ে করতে পারে ভেবে জেলাস ফিল করলাম। এখন বুঝতে পারছি, কাজটা ভুল হয়েছে। সুনন্দকে মেরে যতটা ঠিক করেছি, মেহুলকে...। মিস্টর সাহা, যে জীবন আমি ফেস করেছি, তাতে সাইকোলজিক্যালি অসুস্থ হয়ে ওঠা কি আমার পক্ষে অসম্ভব?'

হৈমন্তী দু'হাতে তার সুন্দর মুখ ঢাকল। বসন্ত সাহার মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি উঠে পড়লেন।

(শেষ)

যেসব বই ও পত্রিকার কাছে ঋণী—

১। বিশ্বশিল্পের রূপরেখা, লেখক মৃণাল ঘোষ।

২। চিত্রকল্প কথা পত্রিকা— পিয়ের অগুস্ত র‍্যনোয়ার বিষয়ক প্রবন্ধ। লেখক অসীম রেজ।

৩। নাইভস্ টু থাউজেন্ড নাইনটিন

৪। পয়জন এন্ড পয়জনিং—দেয়ার হিস্ট্রি এন্ড রোমান্স এন্ড দেয়ার ডিটেকশন ইন ক্রাইম।—এন .কে . বাগচি

৫। কবি রবির গানের গল্প—চন্দনা ব্যানার্জি

৬। রবীন্দ্রগানের স্বরলিপিকার—পীতম সেনগুপ্ত

৭। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমদ্র—সম্পাদনা ক্ষেত্র গুপ্ত